বিশ্বনবীর সাহাবী

তালিবুল হাশেমী

বিশ্বনবীর সাহাবী

৫ম খণ্ড

তালিবুল হাশেমী

অনুবাদ ঃ আবদুল কাদের

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন-২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২১৮

১ম সংস্করণ

রবিউল আউয়াল	১৪১৭
ভাদ্র	১৪০৩
আগস্ট	১৯৯৬

বিনিময় ঃ ১০৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

BISHA NABIR SAHABI 5th Volume by Talibul Hashemy. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price: Taka 105.00 Only

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। 'বিশ্বনবীর সাহাবী'র পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হলো। নানাবিধ কারণে খণ্ডটি প্রকাশে বিলম্ব ঘটলো। এজন্যে পাঠকের কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থী।

এ খণ্ডে ৩৯জন সাহাবীর জীবনী স্থান পেয়েছে। নক্ষত্র স্বরূপ সাহাবীদের জীবন আমাদের জীবনে আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করুক, এটাই আমাদের কামনা।

অনুবাদের ক্ষেত্রে এবং মুদ্রণজনিত কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সহৃদয় পাঠকবর্গ তা অবশ্যই আমাদের গোচরীভূত করবেন। পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ তা শুধরে নেয়ার চেষ্টা করা হবে। আল্লাহ পাক আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

ঢাকা, ১২ আষাঢ়, ১৪০৩ সাল।
৯ সফর, ১৪১৭ হিজরী।
২৬ জুন, ১৯৯৬ সন।

বিনয়াবনত
আবদুল কাদের

সূচীপত্র

১. হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ	৭
২. হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস	২৮
৩. হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফুজ জুহরী	৫৭
৪. হযরত তালহাতাল খায়ের (রা)	৮২
৫. হযরত জাফর তাইয়ার (রা)	১০২
৬. হযরত উমায়ের (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস	১১৯
৭. হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রা	১২১
৮. হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা) মাহবুবে রাসূল (সা)	১২৬
৯. হযরত শামমাছ (রা) বিন ওসমান মাখযুমী	১৩৯
১০. হযরত হাশিম (রা) বিন উতবা	১৪৩
১১. হযরত আমের (রা) বিন রবিয়াতাল আনযি	১৫১
১২. হযরত সোহায়েল (রা) বিন বাইজা ফাহরী	১৫৫
১৩. হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব	১৫৭
১৪. হযরত আবু ফাকিহা ইয়াসার ইযদি (রা)	১৬৪
১৫. হযরত আবু কায়েস (রা) বিন হাবিছ সাহমী	১৬৬
১৬. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা সাহমী	১৬৮
১৭. হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ উমুব্বী	১৭৪
১৮. হযরত আখরাস আসাদী (রা)	১৮৪
১৯. হযরত মা'মার (রা) বিন আবদুল্লাহ আদভী	১৮৮
২০. হযরত আয়াশ (রা) বিন আবি রবিয়া	১৯১
২১. হযরত সালামা (রা) বিন হিশাম	১৯৩
২২. হযরত ওয়ালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ	১৯৪
২৩. হযরত ওহাব (রা) বিন কাবুস মুযনি	১৯৮
২৪. হযরত জুল বিজাদাইন (রা)	২০২
২৫. হযরত বুরাইদা (রা) বিন হুসাইব আসলামী	২০৭
২৬. হযরত নাঈম (রা) বিন মাসউদ আশজায়ী	২১৪
২৭. হযরত উরওয়া (রা) বিন মাসউদ ছাকাফী	২২৬
২৮. হযরত আমের (রা) বিন আকওয়া	২৩২
২৯. হযরত আসলাম হাবশী (রা)	২৩৪

৩০. হযরত আবু মাহযূরা (রা) জুমারী ২৩৬
৩১. হযরত হারিছ (রা) বিন হিশাম মাখযূমী ২৪০
৩২. হযরত নাওফাল (রা) বিন হারিছ হাশেমী ২৪৫
৩৩. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আরকাম যুহরী ২৪৮
৩৪. হযরত আবু মিহজান ছাকাফী (রা) ২৫০
৩৫. হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফাল মুযনি ২৫৮
৩৬. হযরত হানজালা (রা) বিন রুবাই তামিমী ২৬৫
৩৭. হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ জুহানী ২৬৯
৩৮. হযরত সায়াদুল আসওয়াদ সাহামী (রা) ২৭৫
৩৯. হযরত সূরাকা (রা) বিন জুশামু মুদলিজী ২৭৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ

অষ্টম হিজরীর কথা। মক্কা মুয়াজ্জামায় ইসলামের পতাকা পত পত করে উড়ছে। হুনাইনের যুদ্ধে বনু হাওয়াযিনের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটেছে। এ সময় সমগ্র আরব গোত্রে ইসলামের শক্তি ও জাঁকজমকের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে এবং আরবের প্রতিটি কোণ থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে বিশ্বনবীর (সা) দরবারে উপস্থিত হচ্ছেন। কেউবা আসছেন ইসলাম গ্রহণের জন্য। আবার কেউ আসছেন সন্ধি ও নিরাপত্তা চুক্তির জন্য। নবম হিজরীতে এত বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি দল এসেছিলেন যে, সেই বছরের নামই হয়ে যায়, "আমুল ওফুদ" বা প্রতিনিধি দলসমূহের বছর। সেই প্রতিনিধি দলে নাজরানবাসীর প্রতিনিধি দলও ছিল। ইসলামের ইতিহাসে এই প্রতিনিধি দলের অসাধারণ খ্যাতি রয়েছে। নাজরান মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে ইয়েমেনের পথে সপ্তম মঞ্জিলে এক প্রশস্ত জেলার নাম। সেখানে আরব বংশোদ্ভূত খৃস্টানরা বাস করতেন। তারা নাজরানে এক আজিমুশ্শান গীর্জা বানিয়ে রেখেছিলেন। আরব জগতে এটা ছিল খৃস্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় কেন্দ্র। এই গীর্জায় খৃস্টানদের দু'জন বড় ধর্মীয় নেতা থাকতেন। যাঁদের একজনের উপাধি ছিল আকিব এবং অন্যজনের ছিল সাইয়েদ। নবম হিজরীতে ৬০ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত নাজরানবাসীর একটি প্রতিনিধি দল আকিব ও সাইয়েদের নেতৃত্বে খুব শান-শওকতের সাথে মদীনা এলো। মহানবী (সা) তাঁদেরকে খুব সম্মান ও ইজ্জতের সাথে স্বাগত জানালেন এবং খুব বাগ্মিতার সঙ্গে তাঁদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা হক কবুল করার পরিবর্তে বক্র আলোচনা শুরু করে দিল। এ সময় আল্লাহ তায়ালা এই নির্দেশ নাযিল করলেন ঃ

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ قف ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ـ

"এই জ্ঞান পাওয়ার পর এখন যে কেউ এই ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করবে, হে মুহাম্মাদ, তাকে বলে দাও যে—এস, আমরা নিজেরাও আসি এবং প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পরিবার পরিজনকেও নিয়ে বাহির হই. আর আল্লাহর নিকট দোয়া করি যে, যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।" (সূরায়ে আলে-ইমরান ঃ ৬১)

এই নির্দেশ অনুযায়ী হুজুর (সা) হযরত ফাতিমাতুজ যোহরা (রা) এবং হযরত হাসান (রা) ও হযরত হোসাইনকে (রা) নিয়ে মুবাহিলা বা দোয়ার জন্য বের হলেন। এ সময় নাজরানের সরদারদের মধ্য থেকে একজন বললো, কখনো দোয়া করবে না। এজন্য দোয়া করবে না যে, যদি সত্যিই সে নবী হয়, তাহলে আমরা চিরকালের জন্য বরবাদ হয়ে যাবো। সুতরাং নাজরানবাসী হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করে বললো, আমরা আপনার আনুগত্য করছি। আপনি আমাদের নিকট থেকে যত ট্যাক্স চান নিন। আমরা চিরদিনের জন্য তা দিতে থাকবো। আপনি কোন আমানতদার (আমিন) মানুষকে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিন।

হুজুর (সা) বললেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে এমন একজনকে প্রেরণ করবো, যিনি চূড়ান্ত পর্যায়ের (প্রকৃত অর্থে) আমানতদার।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে সেখানে উপস্থিত সকল সাহাবী (রা) অত্যন্ত উৎসুকের সাথে দেখতে লাগলেন যে, কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি এই মর্যাদা লাভ করেন।

রহমতে আলম (সা) নিজের একজন জান নিছারের প্রতি স্নেহের দৃষ্টিতে তাকালেন এবং তার নাম উল্লেখ করে বললেন, "দাঁড়াও।"

দীর্ঘ অবয়ব ও ক্ষীণ শরীর বিশিষ্ট একজন সাহাবী। তাঁর চেহারায় আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছিল, নবীর (সা) ইরশাদ তামিলের জন্য কাল বিলম্ব না করে উঠে দাঁড়ালেন।

হুজুর (সা) সেই সাহাবীর (রা) প্রতি ইঙ্গিত করে নাজরানবাসীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "হাজা আমিনু হাজিহিল উম্মাতি" এ হলো এই উম্মাতের আমিন।

রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা) যাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের মুখ দিয়ে "আমিনুল উম্মাত"-এর মত মহান উপাধি প্রদান করেছিলেন—তিনি ছিলেন সাইয়েদেনা হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ।

সাইয়েদেনা হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ মহামানব (সা)-এর সেই সব জীবন উৎসর্গকারীদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা উম্মাতের স্তম্ভ

হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তিনি ছিলেন আসসাবিকুনাল আউয়ালুন, মুহাজিরিনে আউয়ালিন, আসহাবে বদর, আসহাবে আশারায়ে মুবাশশিরা এবং আসহাবিশ শাজারার অন্যতম। মোটকথা, নবীর (সা) যুগের এমন কোন বড় মর্যাদা নেই যা তিনি লাভ করেননি। তার গুণাবলী ও প্রশংসাসমূহ এবং কৃতিত্বের কথা পড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত হয়।

তাঁর আসল নাম হলো আমের। কিন্তু নিজের কুনিয়ত আবু উবায়দাই নামেই প্রসিদ্ধ হন। এমনিভাবে পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ। কিন্তু তিনি দাদার নিসবতে "ইবনুল জাররাহ" নামে মশহুর হন।

হযরত আবু উবায়দাইর (রা) লকব হলো "আমিনুল উম্মাহ।" রাসূলে আকরামের (সা) পবিত্র মুখ দিয়ে প্রদত্ত হয় এই লকব এবং "আমিন" সেই উপাধি যা কুরআনে হাকিমে বড় বড় পয়গম্বরের নামের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। "বনু ফাহারের" সঙ্গে ছিল বংশীয় সম্পর্ক। ইবনে সায়াদের বক্তব্য অনুযায়ী "বনু ফাহার" হলো কুরাইশের শেষ শাখা। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আমের (রা) বিন আবদুল্লাহ বিন জাররাহ বিন হিলাল বিন আহিব বিন জুবতাহ বিন হারিছ বিন ফাহার। ফাহারে এসে নসবনামা রাসূলে আকরামের (সা) নসবনামার সঙ্গে মিলে যায়।

মাতার নাম ছিল উমাইমা (রা) বিনতে গানাম ফাহরিয়া। তিনিও ইসলাম গ্রহণ এবং মহিলা সাহাবী হওয়ায় মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবু উবায়দাহ (রা) নবীর (সা) হিজরতের ২৩ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ওয়াকেদীর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি হিজরতের ৪০ বছর পূর্বে জন্ম নিয়েছিলেন। ইবনে মান্দাহ (র) ওয়াকেদীর বর্ণনাকে সঠিক বলে স্বীকার করেছেন এবং অধিকাংশ চরিতকার এবং ঐতিহাসিকও এই রেওয়ায়াতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

হযরত আবু উবায়দাই (রা) নবুয়তের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা লাভ করেন। সে সময় পর্যন্ত মাত্র আঙ্গুলে গোনা কয়েকজন বুজুর্গই হকের দাওয়াত কবুল করেছিলেন এবং রাসূলে আকরাম (সা) তখনও দারে আরকামে অবস্থান নেননি। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু উবায়দা (রা) সিদ্দিকে উম্মাত হযরত আবু বকরের (রা) দাওয়াত ও তাবলীগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। কালটা ছিল এমন যেন হক কবুলের অর্থই হলো আগুন নিয়ে খেলা করা। এই দাওয়াত গ্রহণকারী মাত্রই মুশরিকদের জুলুম

নির্যাতনের নিশানা হয়ে যেতেন এবং তাঁর জীবিত থাকাটা কঠিন হয়ে যেতো। হক বা সত্য গ্রহণের পর হযরত আবু উবায়দাহও (রা) ইসলামের নির্যাতিতদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন। মহানবী (সা) যখন মজলুম সাহাবীদেরকে (রা) হাবশায় হিজরতের অনুমতি দিলেন ইবনে ইসহাক (র) এবং ওয়াকেদীর (র) বক্তব্য অনুযায়ী হযরত আবু উবায়দাহও (রা) হাবশা গমনকারী মুহাজিরদের দ্বিতীয় কাফেলায় শামিল হয়ে গেলেন এবং সেখানে কয়েকবছর যাবত উদ্বাস্তুর জীবন অতিবাহিত করেন। অবশেষে হুজুরের (সা) মদীনা হিজরতের কিছুদিন পূর্বে মক্কা ফিরে যান। নবুয়াতের তের বছরে বিশ্বনবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দেন। এ সময় হযরত আবু উবায়দাহও (রা) অন্য মুহাজিরদের সঙ্গে মক্কার ভূমিকে বিদায় জানিয়ে মদীনা এসে গেলেন। ওয়াকেদী (র) বর্ণনা করেছেন যে, হিজরতের পর তিনি কিছুদিন কুবাতে হযরত কুলছুম (রা) ইবনুল হাদমের বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন।

মদীনা মুনাওয়ারায় শুভ পদার্পণের কয়েক মাস পর প্রিয় নবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে ইসহাক ও হাফেজ ইবনে হাজারের (র) মত অনুযায়ী তিনি হযরত আবু উবায়দার (রা) আনসারী ভাই বানিয়েছিলেন আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মুয়াজকে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই রেওয়ায়াতকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবু উবায়দাহ (রা) বিন জাররাহ এবং আবু তালহার (রা) মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন।

(কিতাবুল ফাজায়েল বাবে মুয়াখাতুন নবী)

বিভিন্ন কার্যকারণে এই রেওয়ায়াতকেই সহীহ বলে মনে হয়। কেননা, ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান বর্ণনাকারী অর্থাৎ হযরত আনাসের বাড়ীতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং হযরত আবু তালহা (রা) তাঁর সতালো পিতা ছিলেন।

যুদ্ধের ধারা শুরু হলে হযরত আবু উবায়দাহ (রা) হকের পথে উৎসর্গকারী সিপাহী হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করেছিলেন। তিনি প্রতিটি যুদ্ধে জানবাজী এবং ফিদাকারীর হক আদায় করেছিলেন এবং নিজের ঈমানের আবেগের নজীরবিহীন চিত্রাবলী ইতিহাসের পাতায় চিরদিনের জন্য অংকিত করে দেন।

সহীহ বুখারীতে বদরের সাহাবীদের তালিকায় হযরত আবু উবায়দাহর (রা) নাম নেই। কিন্তু ইবনে সায়াদ (র) ইবনে আবদুল বার (র), ইবনে আছির (র) এবং অন্য কতিপয় চরিতকার বিস্তারিতভাবে লিখেছেন যে, হযরত

আবু উবায়দাহ (রা) কুফর ও হকের প্রথম যুদ্ধে শুধু শরীকই ছিলেন না বরং তিনি এই যুদ্ধে নিজের পিতা আবদুল্লাহ বিন জাররাহকে স্বহস্তে হত্যা করেন। সে মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছিলো। অন্য কতিপয় সাহাবায়ে কিরামও (রা) এই যুদ্ধে হক পথে নিজেদের নিকটতম বন্ধুদেরকে হত্যা করেছিলেন। মুফাসসিররা লিখেছেন, এমনি ধরনের সাহাবায়ে কিরামের (রা) প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার এই ইরশাদ নাযিল হয়েছিল ঃ

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ رَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاءَ هُمْ اَوْاَبْنَاءَ هُمْ اَوْاِخْوَانَهُمْ اَوْعَشِيْرَتَهُمْ ط اُولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ط سوره مجادله : ٢٢

"তোমরা কখনো এমন দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধতা করেছে তারা তাদের পিতাই হোক কিংবা তাদের পুত্রই হোক বা ভাই-ই হোক অথবা হোক তাদের বংশ-পরিবারের লোক। তারা সেই লোক যাদের দিলে আল্লাহ তায়ালা ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ থেকে একটা 'রূহ' দান করে তাদেরকে শক্তিশালী করে দিয়েছেন।" সূরা মুজাদালা ঃ ৩

তৃতীয় হিজরীতে ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) তাতে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করেন এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন অটলতা প্রদর্শন করেন যে, তিনি এই যুদ্ধে বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হন। ঘটনাক্রমে একটি ভুলের কারণে যখন যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল এবং বিশ্বনবী (সা) আহত হলেন তখন হযরত আবু উবায়দাহ (রা) অস্থির হয়ে গেলেন এবং নিজের রাসূল প্রেমের বিস্ময়কর প্রমাণ পেশ করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক থেকে বর্ণিত আছে ঃ

"আমি দেখলাম যে, এক ব্যক্তি রাসূলে করিমকে (সা) একা পেয়ে পূর্বদিক থেকে একটি পাখির মত আকাশে উড়ে দ্রুত গতিতে হুজুরের (সা) দিকে এগিয়ে আসছে। আমিও তাঁকে (সা) হিফাজতের জন্য দ্রুত গতিতে অগ্রসর হলাম এবং বললাম হে আল্লাহ! কল্যাণ হোক। এমন সময় দেখলাম যে. সেই ব্যক্তি যিনি আমার আগে সেখানে পৌছেছেন তিনি হলেন আবু

উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ। তখন জনৈক কাফেরের তরবারীর আঘাতে শিরস্ত্রানের অংশ বিশেষ রাসূলের (সা) গণ্ডদেশে ঢুকে পড়েছে। আবু উবায়দা (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে সেই বস্তু নিজের দাঁত দিয়ে ধরে টান দিলেন এবং তা বাইরে বের হয়ে গেল। কিন্তু এই চেষ্টা চালাতে গিয়ে আবু উবায়দাহর (রা) সামনের দুটি দাঁত ভেঙ্গে গেল।" (তাবকাতে ইবনে সায়াদ)

ওহুদের যুদ্ধের পর হযরত আবু উবায়দা (রা) আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধেও বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং বনু কোরায়জার উৎখাতে তৎপরতার সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউছছানি মাসে মহানবী (সা) হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) ছালাবা ও আনসার গোত্র উৎখাতে নিয়োগ করেন। এসব লোক প্রায়ই মদীনার চারপাশে লুটপাট করতো। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ৪০ জন মুজাহিদসহ সেই লুটেরাদের কেন্দ্রস্থল জিকিসসার ওপর অতর্কিতে হামলা চালালেন। তারা মোকাবিলার সাহস পেলো না এবং পালিয়ে পাহাড়ে গিয়ে লুকালো। অবশ্য এক ব্যক্তি মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) তাকে মদীনা নিয়ে এলে সে ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম গ্রহণ করলো। সেই বছরই হযরত আবু উবায়দাহ (রা) বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার মহান মর্যাদা লাভ করেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে যে সকল সাহাবী স্বাক্ষী হিসেবে নিজেদের দস্তখত দিয়েছিলেন হযরত আবু উবায়দাহও (রা) তাঁদের মধ্যে শামিল ছিলেন।

সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে হযরত আবু উবায়দাহ (রা) খায়বারের যুদ্ধে মহানবীর (সা) সাথে সফরের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং যুদ্ধে নিজের তরবারীর খুব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। খায়বারের যুদ্ধের কিছুদিন পর হুজুর (সা) খবর পেলেন যে, কাজায়াহ গোত্রের লোকেরা মদীনা মুনাওয়ারার ওপর হামলার পরিকল্পনা করছে। হুজুর (সা) হযরত আমর (রা) ইবনুল আছকে তিনশ' মুজাহিদসহ তাদের নির্মূলের জন্য প্রেরণ করলেন। হযরত আমর (রা) বনু কাজায়াহর এলাকায় পৌছে "সালাসল" নামক একটি পুকুরের তীরে অবস্থান নিলেন এবং সেখান থেকে হুজুরকে (সা) পয়গাম প্রেরণ করে জানালেন যে, শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশী। এজন্য আরো সৈন্য প্রেরণ করা হোক। পয়গাম পেয়েই হুজুরে আকরাম (সা) হযরত আবু উবায়দাহর (রা) নেতৃত্বে দুশ' মুজাহিদ দিয়ে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করলেন। এই মুজাহিদদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) মত মহান মর্যাদাবান বুজুর্গও শামিল ছিলেন। যখন এই সাহায্যকারী বাহিনী হযরত আমর (রা) ইবনুল আছের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন তখন সম্মিলিত

বাহিনীর নেতৃত্বের প্রশ্ন উঠলো। মর্যাদা ও শানের দিক দিয়ে যদিও হযরত আবু উবায়দাহ (রা) সম্পূর্ণভাবে নেতৃত্বের যোগ্য ছিলেন। কিন্তু যখন হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ পীড়াপীড়ি করলেন যে, তিনিই সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন তখন হযরত আবু উবায়দাহ (রা) সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে অত্যন্ত বাহাদুরীর সঙ্গে দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। এমনকি দুশমনরা পরাজিত হলো। যখন বিজয়ীর বেশে তাঁরা মদীনা ফিরে এলেন এবং হুজুর (সা) নেতৃত্ব প্রশ্নে মতবিরোধ ও তাঁর আনুগত্যের অবস্থা শুনলেন তখন বললেন ঃ রাহেমাল্লাহু আবা উবায়েদ—আবু উবায়েদের (রা) ওপর আল্লাহর রহমত হোক। (মাদারিজুন নবুয়াত–দ্বিতীয় খণ্ড) ইতিহাসে এই ঘটনা "সারিয়্যাহ জাতিস সালাসিল" নামে খ্যাত হয়ে আছে।

অষ্টম হিজরীর রজব মাসে মহানবী (সা) হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) তিনশ' সওয়ারসহ সমুদ্রোপকূলে প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করা। ইতিহাসে এই অভিযান সারিয়্যাহ সাইফুল বাহার অথবা সারিয়্যাহ-এ-খাবত নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। সাইফুল বাহার (সমুদ্রের উপকূল) এই জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, সমুদ্রের উপকূলে মুজাহিদদেরকে অবস্থান নিতে হয়েছিল। খাবত নামকরণ এজন্য করা হয়েছে যে, এই অভিযানে রসদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে মুজাহিদদেরকে বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করে দিন গুজরান করতে হয়েছিল এবং লাঠি অথবা অন্য কিছু দিয়ে যে পাতা বৃক্ষ থেকে পারা হয় তাকে খাবত বলা হয়ে থাকে। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু উবায়দাহর (রা) অধীন বাহিনীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুকও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সহীহ বুখারীতে হযরত জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহ (রা) আনসারী এই অভিযানের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) উপকূলের দিকে একটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন এবং আবু উবায়দাহ (রা)-কে এই অভিযানের আমীর বানিয়েছিলেন। মানুষ ছিলেন তিনশ' জন। আমরা রওয়ানা দিলাম। কিছু রাস্তা অতিক্রমের পর পাথের শেষ হয়ে গেল। শুধুমাত্র খেজুরের দু'টি থলে অবশিষ্ট রলো। আবু উবায়দাহ (রা) প্রতিদিন আমাদেরকে কিছু কিছু খেজুর দিতেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত একটি একটি করে দিতে লাগলেন। ক্ষুধায় কাতর হয়ে আমরা বৃক্ষের পাতা পেরে পেরে খেলাম। এক ব্যক্তি তিনটি উট জবেহ করালেন। পুনরায় তিনটি জবেহ করালেন। তৃতীয় দিনেও তিনটি উট জবেহ করালেন। তারপর আবু উবায়দা (রা) তাঁকে নিষেধ করলেন। সমুদ্রের তীরে অবস্থানকালে একদিন টিলা বরাবর একটি বিরাট মাছ বের হলো। সেই মাছকে আম্বর বলা হয়। আমরা অর্ধেক

মাস (অথবা ১৮ দিন) তা খেলাম এবং তার তেল গায়ে মাখলাম। এমনকি আমরা বলিষ্ঠ হয়ে গেলাম। অতপর আবু উবায়দা (রা) মাছটির দু'টি পাঁজর দাঁড় করালেন এবং একটি উটের ওপর হাওদা রেখে সৈন্যদের সবচেয়ে লম্বা মানুষটিকে তাতে বসালেন। সেই ব্যক্তি উটের ওপর বসে সেই পাঁজরের নীচ দিয়ে বের হয়ে গেলেন। আমরা যখন মদীনা ফিরে এলাম এবং রাসূলের (সা) খিদমতে এই ঘটনা বর্ণনা করলাম তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য রিযিক প্রেরণ করেছিলেন। তা তোমাদের খাওয়া উচিত ছিল। তোমাদের নিকট যদি থেকে থাকে তাহলে আমাদেরকেও তা খাওয়াও। এক ব্যক্তি (কিছু গোশত) নিয়ে এলো এবং তিনি (সা) তা থেকে খেলেন।

এই রেওয়ায়াতে উট জবেহ করানেওয়ালা যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হলেন হযরত কায়েস (রা) বিন সায়াদ আনসারী। তিনি প্রকৃতিগতভাবেই দাতা লোক ছিলেন।

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে হযরত আবু উবায়দা (রা) আল-ফাতাহ যুদ্ধে প্রিয় নবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ায় মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সহীহ মুসলিমের এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী মক্কায় প্রবেশকারী বাহিনীর এক অংশের নেতৃত্ব হযরত আবু উবায়দাহর (রা) হাতে ছিল। সৈন্যের এই অংশ যিরাহ পরিধানকারী মুজাহিদদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। মক্কা বিজয়ের পর হযরত আবু উবায়দাহ (রা) হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে নিজের বাহাদুরীর নৈপুণ্য প্রদর্শন এবং জানবাজীর হক আদায় করেন।

নবম হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় হযরত আবু উবায়দাহ (রা) হুজুরের (সা) নিকট থেকে "আমিনুল উম্মাতের" আজিমুশ্বান লকব ভূষিত হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, নাজরানের প্রতিনিধি দল নবীর (সা) দরবারে দু'বার উপস্থিত হয়েছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা) দ্বিতীয় দফা নাজরানের প্রতিনিধি দল আগমনের সময় "আমিনুল উম্মাত" উপাধি পেয়েছিলেন। সহীহ মুসলিমে নাজরানবাসীর মুখে বলা হয়েছে, "আবু উবায়দাহ (রা) আমাদেরকে সুন্নাত ও ইসলামের শিক্ষা দিতেন।" এই রেওয়ায়াত থেকে পরিষ্কার হয় যে, নাজরানবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হযরত আবু উবায়দাহ (রা) তাদেরকে দ্বীনের হুকুম আহকাম তালিমও দিতেন এবং তাদের নিকট থেকে সাদকাও ওসুল করতেন। সেই বছর নাজরান হতে ফেরার পর হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) বাহরাইন যেতে হয়। এই প্রসঙ্গে সহীহ্ বুখারীতে হযরত আমর (রা) বিন আওফ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম (সা) আবু উবায়দাহকে (রা) জিযিয়া আদায়কারী হিসেবে বাহরাইন প্রেরণ করেছিলেন।

হুজুর (সা) বাহরাইনবাসীর সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছিলেন এবং আলা ইবনুল হাজরামীকে তাদের আমীর নিয়োগ করেছিলেন। আবু উবায়দাহ (রা) বাহরাইন থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে এলেন। আনসাররা তাঁর প্রত্যাবর্তনের খবর পেয়ে ফজরের নামায হুজুরের সঙ্গে পড়লেন। যখন তিনি (সা) নামায পড়া শেষ করলেন তখন আনসারদের (অস্বাভাবিক) ভীড় দেখে মুচকি হেসে দিলেন এবং বললেন, সম্ভবত তোমরা আবু উবায়দাহর (রা) আগমনের খবর পেয়েছ। তাঁরা আরজ করলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। হুজুর (সা) বললেন, সুসংবাদ হলো যে, আজ আমি তোমাদেরকে খুশী করে দেব। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের দারিদ্র ও বুভুক্ষার ভয় করি না। অবশ্যই এই ভয় আমার আছে যে, যেভাবে প্রথম জাতিসমূহের ওপর দুনিয়া প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল এবং পারস্পরিক বিরোধ ও হিংসা এবং লোভ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। এমনিভাবে তোমাদের ওপরও যদি দুনিয়া প্রশস্ত করা হয় এবং তোমরাও পারস্পরিক বিরোধে লিপ্ত হয়ে বরবাদ হয়ে না যাও।

দশম হিজরীতে হযরত আবু উবায়দাহ (রা) বিদায় হজ্জে রহমতে আলমের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদায় অভিষিক্ত হন।

একাদশ হিজরীতে মহানবী (সা) ওফাত পেলেন। হযরত আবু উবায়দাহর (রা) ওপর এ সময় শোকের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুজুরের (সা) ইন্তেকালের অব্যবহিত পরই আনসাররা সাকিফায়ে বনি সায়েদাতে একত্রিত হয়ে খিলাফতের প্রশ্ন উঠালেন। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং হযরত আবু উবায়দাহ (রা) আলোচনার জন্য আনসারদের নিকট গেলেন। আলোচনাকালে হযরত আবু উবায়দাহ (রা) আনসারদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে আনসারের দল! তোমরা সর্বপ্রথম ইসলামের মদদ ও সাহায্য করেছ। এখন তোমরাই বিভেদ ও মতপার্থক্যের ভিত্তি রেখো না।"

উভয় পক্ষ থেকে যখন বক্তৃতা শেষ হলো তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বললেন, আমি তোমাদের জন্য এই দুই ব্যক্তির [হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং হযরত আবু উবায়দাহ (রা)] মধ্য থেকে কোন একজনকে পছন্দ করি। তোমরা এই দুজনের মধ্যে থেকে কোন একজনের হাতে বাইয়াত নিয়ে নাও। কিন্তু এই দুই বুজুর্গ ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বর্তমানে খিলাফতের দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করে বসলেন এবং অগ্রসর হয়ে সর্বাগ্রে সিদ্দিকে আকবারের (রা) বাইয়াত করে নেন। তাঁদের পর সমগ্র মাজমা বাইয়াতের জন্য ভেঙ্গে পড়লো।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন লেলিহান শিখায় বিস্তার লাভ করলো। সিদ্দিকে আকবার (রা) এই ভয়াবহ ফিতনা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করলেন এবং ১০ মাসের মধ্যে তা উৎখাত করে ছাড়লেন। এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে হযরত আবু উবায়দাহ (রা) খলিফাতুর রাসূলের (সা) বাহুর ভূমিকা পালন করেছিলেন। ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা মূলোৎপাটনের কিছুদিন পর সিরিয়া ও ইরানে যুদ্ধের এক দীর্ঘ ধারা শুরু হয়ে গেল। ১৩ হিজরীর শুরুতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) সিরিয়ায় বিভিন্ন দিক থেকে সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) হেমসের দিকে, হযরত আমর (রা) বিন আছকে ফিলিস্তিনে, হযরত শুরাহ বিল (রা) হাসানাকে জর্দানের দিকে এবং হযরত ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ানকে (রা) দামেস্কের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই হেদায়াতও দিলেন যে, যুদ্ধের ময়দানে যদি তোমাদেরকে একস্থানে সমবেত হতে হয় তাহলে তোমাদের সকলের প্রধান সেনাপতি হবেন আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ। হযরত ইয়াযিদ (রা) বিন আবি সুফিয়ান ও হযরত শুরাহ বিল বিন হাসানার (রা) বাহিনী রওয়ানা হওয়ার পর হযরত আবু উবায়দাহ (রা) সাত হাজার মুজাহিদসহ মা'রাকাতার পথে হেমস রওয়ানা হলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) "ছানিয়াতুল বিদা" পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে গেলেন। যখন তিনি যাত্রা শুরু করলেন তখন সিদ্দিকে আকবার (রা) তাঁকে এই ভাষায় ওসিয়ত করলেন ঃ

"আবু উবায়দাহ (রা) ভালো কাজ করো। মুজাহিদ হয়ে থেকো। শহীদের মৃত্যু বরণ করো। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আমলনামা তোমাদের ডান হাতে দিন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের চক্ষু ঠাণ্ডা হোক। আল্লাহর কসম! আমি আশা করি যে, তোমরা সেই ব্যক্তিদের মধ্যে হবে যারা আল্লাহকে বেশী ভয় করে থাকেন। দুনিয়ার সাথে কোন সম্পর্কই তাদের নেই। তারা আখিরাতের আকাংখী। আল্লাহ তোমাদের ওপর খুব করুণা করেছেন যে, তোমরা মুসলমানদের বাহিনী নিয়ে আল্লাহর দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছো। সুতরাং যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাঁর সাথে অন্যদেরকে অংশীদার বানায় এবং মিথ্যা খোদাদেরকে পূজা করে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে।"

হযরত আবু উবায়দাহ (রা) সিরিয়া প্রবেশ করলেন। এ সময় তিনি রোমকদেরকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত পেলেন। তাদের মুকাবিলায় হযরত আবু উবায়দাহর (রা) বাহিনী আটায় লবণের সমান

ছিল। তা সত্ত্বেও হযরত আবু উবায়দা (রা) সেই স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের সাথে বুসরা এবং মাআব পদানত করে জাবিয়া পৌছলেন। সেখান থেকে হিরাক্লিয়াসের ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা খলিফার দরবারে লিখে পাঠালেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হযরত আবু উবায়দার (রা) পত্র পেতেই একদিকে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণ করলেন। অন্যদিকে ইরাকে ইরানীদের বিরুদ্ধে জিহাদ রত হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে তাঁর বাহিনী সহ ইরাক থেকে সিরিয়া পৌছার নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা) হযরত শুরাহবিল (রা) বিন হাসানা এবং হযরত আমর (রা) ইবনুল আসকে পয়গাম প্রেরণ করলেন। এই পয়গামে তাঁদেরকেও স্ব স্ব বাহিনীসহ হযরত আবু উবায়দার (রা) নিকট পৌছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু উবায়দার (রা) নিকট সাহায্যকারী বাহিনী পৌছে গেল এবং হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদও তার সঙ্গে যোগ দিলেন। তারপর তাঁরা সর্বপ্রথম আজনাদাইনের দিকে রওয়ানা হলেন। সেখানে রোমকদের একটি বিরাট বাহিনী মুসলমানদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তের হিজরীর ২৮শে জমাদিউল আউয়াল আজনাদাইনের নিকট উভয় পক্ষের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ হলো। রোমকরা প্রচণ্ডভাবে বাধা দিল। কিন্তু মুসলমানদের ঈমানী জোশের সামনে কিছুই করতে পারলো না এবং তারা যুদ্ধের ময়দানে তিন হাজার মানুষের লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। মুসলমানরা রোমকদের পিছু ধাওয়া করলো। এ সময় তারা পথিমধ্যে একটি অপ্রশস্ত গিরিপথ বা উপত্যকা পেলেন। এই গিরিপথে শুধুমাত্র একজন করে মানুষই অতিক্রম করতে পারতো। যেসব মুসলমান সেই স্থান অতিক্রম করে গেলেন, রোমকরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগলো। মুজাহিদদের (রা) মধ্যে হযরত আমর (রা) ইবনুল আছের সহোদর হযরত হিশাম (রা) ইবনুল আছও ছিলেন। তিনি সাবিকুনাল আউয়ালুন ও দুই হিজরতের সম্মানে সম্মানিত ছিলেন। তিনি যেই সেই অপ্রশস্ত গিরিপথ অতিক্রম করতে লাগলেন সেই এক রোমকের তীর এসে তাঁকে শহীদ করে ফেললো। তারপর যে মুসলমানই সেখানে পৌছতো সেই হযরত হিশামের (রা) লাশের ওপর দিয়ে ঘোড়া নিয়ে যাওয়াটা সহ্য করতে পারছিলেন না এবং সেখানেই থেমে যাচ্ছিলেন। হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ এই অবস্থা দেখে মুসলমানদেরকে উচ্চস্বরে আহবান জানিয়ে বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা! আল্লাহ তায়ালা আমার ভাইকে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন এবং তার রূহ উঠিয়ে নিয়েছেন। এখানে তো শুধু তার দেহ রয়েছে, তোমরা তার লাশের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যাও এবং গিরিপথে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হও।"

একথা বলে তিনি নিজের ঘোড়া অগ্রসর করালেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যরাও রওয়ানা দিলেন। হযরত হিশামের (রা) লাশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু মুসলমানরাও রোমক পলায়নকারীদেরকে ছিন্নভিন্ন করে ফেললো। যুদ্ধ শেষে হযরত হিশামের (রা) লাশের অংশসমূহকে বস্তায় ভরে দাফন করা হয়।

আজনাদাইনের যুদ্ধের পর হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এবং হযরত আবু উবায়দাহ (রা) দামেস্ক অবরোধ করলেন। দামেস্ক অবরোধ অব্যাহত ছিল এমন সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ওফাত পেলেন এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতের শুরুতেই একদিন হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ প্রাচীর টপকিয়ে ভেতরে ঢুকলেন এবং শহরের দরজা খুলে দিলেন। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) নিজের সৈন্যসহ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শহরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। শহরবাসী অস্ত্র সমর্পণ করলো এবং হযরত আবু উবায়দাহর (রা) সঙ্গে সন্ধি করে নিলেন। হযরত খালিদ (রা) ব্যাপারটি জানতেন না। তিনি শহরের দ্বিতীয় অংশে খৃস্টানদের সাথে লড়াই করতে করতে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। শহরের মধ্যবর্তী স্থানে হযরত খালিদ (রা) হযরত আবু উবায়দাহর সামনাসামনি হলেন। এ সময় হযরত আবু উবায়দাহ (রা) হযরত খালিদকে (রা) বললেন যে, তিনি শহরবাসীকে নিরাপত্তা দিয়ে দিয়েছেন। এজন্য সেও যেন হাত গুটিয়ে নেয়। হযরত খালিদ (রা) তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারী কোষবদ্ধ করলেন। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) হযরত খালিদের (রা) জয় করা শহরের অংশকেও সন্ধিনামার অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন এবং দামেস্কের ওপর ইসলামের পতাকা উড্ডীন করে দিলেন।

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) শাসন ক্ষমতা হাতে নিতেই (১৩ হিজরী) হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারিত করেন এবং তার স্থলে হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) সিরিয়ার প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করলেন। কিন্তু আল্লামা শিবলী নুমানী এবং অন্য কয়েকজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে, হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের অপসারণ ঘটে ১৭ হিজরীতে। উভয় পক্ষেরই বক্তব্যের সপক্ষে দলিল-প্রমাণ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের অপসারনের বছর নিয়েই নয় বরং সে যুগের অনেক প্রখ্যাত যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হওয়ায় সাল নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ রয়েছে। তা বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকদের নিজস্ব মত ও বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল। তারা কোন্ রেওয়ায়াতকে অগ্রাধিকার দেবেন তা দেখার বিষয়। মোটকথা, সিরিয়ার যুদ্ধসমূহে হযরত আবু উবায়দাহ (রা) এবং হযরত খালিদ

(রা) বিন ওয়ালিদের আসল মর্যাদা কি ছিল? বাস্তবকথা হলো, উভয় বুজুর্গই সিরিয়ার সকল যুদ্ধে পারস্পরিক সহযোগিতা করেছিলেন এবং উভয়ই নিজের বীরত্ব, জওয়ান-মরদী, চেষ্টা-তদবির ও নেতৃত্বের যোগ্যতার জন্য প্রশংসার পাত্র।

দামেস্কের পরাজয়ে রোমকরা প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত হলো এবং তারা জর্দানের শহর বাসইয়ানে একত্রিত হয়ে জবরদস্ত যুদ্ধ প্রস্তুতিতে মশগুল হলো। মুসলমানরা এই খবর পেয়ে হযরত আবু উবায়দাহর (রা) নেতৃত্বে বাসইয়ান রওয়ানা হলেন এবং তাঁরা ফাহাল নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। যুদ্ধের পূর্বে উভয় পক্ষের মধ্যে দূতদের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা হতে লাগলো। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। অবশেষে রোমকরা নিজেদের দূতকে মুসলমান বাহিনীর সেনাপতি হযরত আবু উবায়দাহর (রা) সাথে সরাসরি আলোচনার জন্য প্রেরণ করলো। রোমক দূত ইসলামী বাহিনীতে পৌঁছে সকল মুসলমানকে একই রংয়ে রঞ্জিত পেলেন। লশকরের আমীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাকে বলা হলো যে, তিনি সামনে বসে আছেন। সে সময় হযরত আবু উবায়দাহ (রা) মাটির ওপর বসে তীর উলট-পালট করে দেখছিলেন। তাঁর পোশাক এবং সাধারণ মুজাহিদের পোশাকের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। দূত বিস্মিত হয়ে হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) জিজ্ঞেস করলো, আপনিই কি সৈন্যের সরদার? তিনি বললেন, হাঁ। আপনার সৈন্যরা যদি লড়াই ছাড়া ফিরে যায় তাহলে আমরা প্রত্যেককে দুই আশরাফী করে দেব। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) দূতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং ধমক দিয়ে ফিরে গেলেন। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) তৎক্ষণাৎ সৈন্যদেরকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তৃতীয় দিন উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) সৈন্যদের মধ্যস্থানে ছিলেন এবং এক এক কাতারে গিয়ে মুসলমানদের সাহস যোগাচ্ছিলেন। পঞ্চাশ হাজার রোমকদের মুকাবিলায় মুসলমানদের সংখ্যা অর্ধেকেরও কম ছিল। কিন্তু তারা বীর দুশমনদের ওপর এমন প্রচণ্ডভাবে হামলা চালালেন যে, কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাদের কোমর ভেঙ্গে গেল। এমনিভাবে ফাহাল ও বাসইয়ান মুসলমানদের পদানত হলো। তারপর হযরত আবু উবায়দাহ (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে মারজির রুম দখল করে নিলেন এবং পুনরায় হেমসের দিকে রওয়ানা হলেন। হেমসবাসীরা কয়েকমাস দূর্গ বন্ধ করে মুকাবিলা করতে লাগলো। কিন্তু কোন স্থান থেকে যখন সাহায্য প্রাপ্তির আর আশা রলো না তখন জিযিয়া দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুসলমানদের আনুগত্য কবুল করে নিলো। হেমসের পর হামাত, শেযার, মুয়ারাতত্মুন নোমান এবং আরো কতিপয় স্থানও একের পর এক অধীনস্থ হয়ে গেল। অতপর হযরত আবু উবায়দাহ (রা)

রোমকদের একটি মজবুত গড় লাজাকিয়ার প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং কঠোরভাবে তা অবরোধ করলেন। আল্লামা বালাজুরী (র) "ফতুহুল বুলদান" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আবু উবায়দাহ (রা) লাজাকিয়া অবরোধ কালে এক অসাধারণ কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি লাজাকিয়ার আশেপাশে অনেক গোপন গর্ত খুঁড়ান এবং দৃশ্যতর অবরোধ তুলে নিয়ে হেমসে রওয়ানা হয়ে যান। লাজাকিয়াবাসী নির্ভাবনায় বা নিশ্চিন্ত হয়ে শহরের দরজা খুলে দিল। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) সেই রাতেই সৈন্যসহ ফিরে এসে গর্তসমূহে লুকিয়ে বসে গেলেন। সবুহে সাদিকের সময় তাঁরা মুহূর্তের মধ্যে গর্ত থেকে বের হয়ে শহরে ঢুকে পড়লেন। তা দেখে রোমকরা মূর্চ্ছা গেল এবং বিনা বাধায় অস্ত্র সমর্পণ করলো। লাজাকিয়া দখলের পর হযরত আবু উবায়দা (রা) হেমস ফিরে এলেন এবং ১৫ হিজরীর রজব মাস পর্যন্ত (যে মাসে ইয়ারমুকের সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ সংঘঠিত হয়) সেখানেই অবস্থান করেন।

একের পর এক রোমকদের পরাজয়ে হিরাক্লিয়াস চমকে উঠলো। যে কোন মূল্যে মুসলমানদেরকে সিরিয়া থেকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে সে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলো। বস্তুত এই লক্ষ্যে সে আরমেনিয়া, আল-জাযিরা, কাসতানতুনিয়া প্রভৃতি স্থান থেকে সৈন্য তলব করে পাঠালেন। এসব সৈন্য ইন্তাকিয়ায় একত্রিত হলো। এই বিরাট বাহিনী বড় অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিল। তারা ইন্তাকিয়া থেকে রওয়ানা হলো। এ সময় মুসলমানরা পারস্পরিক পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সিরিয়ার যে যে শহর তারা দখল করেছেন সেখান থেকে সৈন্য হটিয়ে নেবেন এবং এসব সৈন্য একস্থানে একত্রিত হবে। সাথে সাথে খিলাফতের দরবার থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠানো হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলমানরা দামেস্ক, হেমস প্রভৃতি শহর খালি করালেন এবং সেখানকার বাসিন্দাদেরকে জিযিয়ার সমগ্র অর্থ ফেরত দিলেন যা তাদের নিকট থেকে উসুল করা হয়েছিল। কেননা, তখন তাঁরা সেই সব শহরের বাসিন্দাদের হেফাজত করতে পারছিলেন না। চুক্তি পালন এবং উদারতার এমন উদাহরণ দুনিয়ার অন্য কোন জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মুসলমানদের এই নৈতিকতাই জঘন্যতম দুশমনের অন্তরও জয় করে নিয়েছিল। কথিত আছে যে, মুসলমানরা যখন রোমকদেরকে জিযিয়া ফিরিয়ে দিলেন তখন তারা কেঁদেছিল এবং দোয়া করেছিল আল্লাহ যেন তাদেরকে ফিরিয়ে আনেন।

সকল মুসলমান সৈন্য শহর থেকে বের হয়ে ইয়ারমুক নদীর তীরে একস্থানে একত্রিত হলেন। ইত্যবসরে রাজধানী থেকে সাহায্যও এসে পৌঁছলো। কিন্তু তবুও সমস্ত মুসলমানের সংখ্যা সব মিলিয়ে ৩০-৪০ হাজারের মাঝামাঝি ছিল। পক্ষান্তরে রোমক সৈন্যদের সংখ্যা প্রায় দু'লাখ ছিল।

প্রথমত উভয় পক্ষ থেকে দূত গমনাগমন করতে লাগলো। রোমকরা চেয়েছিল যে, মুসলমানরা অর্থ নিয়ে ফিরে যাক। কিন্তু মাসলমানদের লক্ষ্য অর্থ-সম্পদ লাভ ছিল না। এজন্য এতে তারা রাজী হলেন না। সুতরাং উভয়পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল। রোমকরা নির্দয়ভাবে লড়াই করলো। মুসলমানদের ওপর তারা বারবার ভয়াবহ হামলা চালালে এবং একবার তো তাদেরকে পিছু হটিয়ে দিতেই সফল হয়ে গেলো। কিন্তু মুসলমান অফিসারদের আত্মোৎসর্গের চেতনা এবং যুদ্ধ নৈপুণ্য পরিস্থিতি সামলে নিল এবং তাঁরা রোমকদের ওপর এমন গজবনাক জবাবী হামলা চালালো যে তাদের মধ্যে চরম বিশৃংখলা দেখা দিল। তাদের প্রায় ৭০ হাজার মানুষের লাশ যুদ্ধের ময়দানে পড়ে রলো। যারা জীবিত ছিল তারা পালিয়ে গেল। ইয়ারমুকের এই মহান বিজয় সিরিয়ায় ভাগ্যের ফায়সালা করে দিল। হিরাক্লিয়াস পালিয়ে কাসতানতুনিয়া চলে গেল। পুনরায় কখনো তারা সিরিয়ার দিকে মুখ করার সাহস হয়নি। ইয়ারমুকের বিজয়ের পর মুসলমানদের অগ্রযাত্রা কাননে সিরিনের দিকে চললো এবং তা পদানত করে হালব ও ইন্তাকিয়া পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলো। এসব শহরে ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার পর হযরত আবু উবায়দাহ (রা) বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছলেন। এ সময় খৃস্টানরা হিম্মত হারিয়ে বসলো এবং সন্ধির আবেদন জানালো। কিন্তু সন্ধির জন্য একটি শর্ত আরোপ করলো। শর্তটি হলো হযরত ওমরকে (রা) স্বয়ং বাইতুল মুকাদ্দাসে আসতে হবে এবং স্বহস্তে তাঁকে সন্ধিনামা পূরণ করতে হবে। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) হযরত ওমরকে (রা) চিঠি লিখলেন। চিঠিতে তিনি জানালেন যে, বিনা রক্তপাতে যদি বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে হয় তাহলে আপনাকে এখানে আসতে হবে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু উবায়দাহর (রা) পত্র পেয়ে কয়েকজন মুহাজির ও আনসারসহ বাইতুল মুকাদ্দাস তাশরীফ আনলেন। জাবিয়া নামক স্থানে হযরত আবু উবায়দাহ (রা), হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ, হযরত ইয়াযিদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য অফিসার আমীরুল মু'মিনীনকে ইসতিকবাল করলেন। খৃস্টানদের প্রতিনিধিও সেখানে পৌঁছলো এবং সন্ধিনামা লিখার আবেদন জানালো। চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ হলো এবং তাতে উভয় পক্ষের স্বাক্ষর হয়ে গেল। এ সময় হযরত ওমর (রা) জাবিয়া থেকে রওয়ানা হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছলেন এবং শহরে প্রবশে করে সেখানে নামায পড়লেন। যেখানে বর্তমানে মসজিদে ওমর (রা) অবস্থিত। বাইতুল মুকাদ্দাস অবস্থান কালে একদিন হযরত ওমর (রা) হযরত বিলাল হাবশীর (রা) নিকট আযানের ফরমায়েশ দিলেন। হযরত বিলাল (রা) বললেন, আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, রাসূলের (সা) ইন্তেকালের পর কখনো আযান দিব না। কিন্তু আজ আপনার নির্দেশ পালন করছি। একথা বলেই তিনি আযান দেয়া

শুরু করলেন। এ সময় সাহাবায়ে কেরামের (রা) রাসূলের (সা) মুবারাক যুগ স্মরণে এসে গেলো এবং তারা ভাবাবেশে পড়ে গেলেন। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) এবং হযরত মুয়াজ (রা) বিন জাবাল কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং হযরত ওমরের (রা) হিচকী শুরু হয়ে গেল। বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পর হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) সমগ্র সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগ করলেন। তিনি সেনাপতি ও সিরিয়ার গভর্নর উভয় পদেই অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করেছিলেন এবং লোকদের ওপর নিজের সামরিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতার সিলমোহর অংকিত করে দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, হযরত আবু উবায়দাহর (রা) নির্দেশে সিরিয়ার কয়েকটি শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেখানে সাহাবীবৃন্দ (রা) লোকদেরকে কুরআন হাকিম শিক্ষা দিতেন এবং ফিকাহর মাসয়ালা বর্ণনা করতেন। একবার হিজাজে এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ পড়লো যে, হযরত ওমর ফারুককে (রা) নিজের সকল গভর্নরের নিকট থেকে খাদ্য তলব করতে হলো। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) খবর পেয়ে খাদ্য বোঝাই চার হাজার উট মদীনা মুনাওয়ারা প্রেরণ করলেন (অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি স্বয়ং এই উট নিয়ে রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছিলেন।)।

সতের হিজরীর শেষের দিকে রোমকরা সাজ-সরঞ্জামে সুসজ্জিত হয়ে হেমসের ওপর হামলা করে বসলো। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) এদিক-ওদিক থেকে সৈন্য একত্রিত করে রোমকদের মুকাবিলা করলেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত অথচ রক্তাক্ত যুদ্ধের পর তাদেরকে পরাজিত করে ভাগিয়ে দিলেন। হযরত আবু উবায়দাহর (রা) জীবনে এইটাই ছিল সংঘটিত সর্বশেষ যুদ্ধ। তারপর রোমকরা আর কখনো মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাহস পায়নি।

১৮ হিজরীতে সিরিয়া ও ইরাকে মহামারী আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। ইসলামের ইতিহাসে এই মহামারী “তাউনে আমওয়াস” নামে খ্যাত। এই মহামারীতে মুসলমানদের প্রচুর ক্ষতি হয় এবং তাদের হাজার হাজার এতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। হযরত ওমর ফারুক (রা) এই মহামারীর খবর পেয়ে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং তা থেকে পরিত্রাণের পদ্ধতি খুঁজে বের করার জন্য স্বয়ং সিরিয়া তাশরীফ নিলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা) এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য অফিসার সুরগ নামক স্থানে আমীরুল মু'মিনীনের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। হযরত ওমর (রা) এসব ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাদের অধিকাংশই সেই স্থান (আমওয়ান) থেকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা) সেই মতের বিরোধিতা করলেন। সুতরাং হযরত ওমর (রা) যখন ঘোষণা করালেন যে, আগামীকাল

সব সৈন্য আমার সঙ্গে এখান থেকে চলে যাবে তখন হযরত আবু উবায়দাহ (রা) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং তিনি হযরত ওমরকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে ওমর! আপনি কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন ?"

হযরত ওমর (রা) জবাব দিলেন ঃ

"আবু ওবায়দাহ (রা)! হায়, তোমার ছাড়া অন্য কারোর মুখ দিয়ে যদি একথা বের হতো। আমি তাকদিরে ইলাহী থেকে তাকদিরে ইলাহীর দিকেই যাচ্ছি। তুমি নিজেই বলো, তুমি যদি কিছু উটসহ এমন একটি উপত্যকা অতিক্রম কর। যে উপত্যকার এক দিক হলো বিরাণ ও বন্ধ্যা। অন্যদিক হলো শস্য শ্যামল। এই অবস্থায় শস্য শ্যামল অংশে উট চরানো কি তাকদিরে ইলাহী অনুযায়ী হবে না ?

এ সত্ত্বেও হযরত আবু উবায়দাহ (রা) নিজের মতের ওপর কায়েম রইলেন। হযরত ওমর (রা) মদীনা ফিরে গিয়ে হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) পত্র লিখলেন। এই পত্রে তাঁকে মদীনায় আসার কথা বলা হয়েছিল। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) বুঝলেন যে, আমীরুল মু'মিনীন তাঁকে মহামারী উপদ্রুত অঞ্চল থেকে বের করে নিতে চান। তিনি জবাবে লিখে পাঠালেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন, আপনি আমাকে যে উদ্দেশ্যে মদীনা ডেকেছেন তা আমি বুঝে ফেলেছি। আমি মুসলমান সৈন্যবাহিনীতে রয়েছি এবং আমার অন্তর তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। এজন্য আমাকে এখানেই থাকতে দিন।"

হযরত ওমর (রা) এই পত্র পাঠ করে কেঁদে দিলেন এবং হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) আরো একটি পত্র লিখে পাঠালেন। তাতে তিনি লিখলেন যে, বর্তমানে সৈন্যরা যেখানে রয়েছে সেই স্থানটি নীচু এবং স্যাঁতসেতে। এজন্য সেনাবাহিনীসহ কোন উঁচুস্থানে স্থানান্তর হয়ে যান।

হযরত আবু উবায়দাহ (রা) তাঁর নির্দেশ পালন করলেন এবং সেনাবাহিনী নিয়ে জাবিয়া স্থানান্তর হয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছতেই তিনি রোগে আক্রান্ত হলেন। অবস্থা যখন সঙ্গীন হয়ে উঠলো তখন তিনি হযরত মুয়াজ (রা) বিন জাবাল আনসারীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানালেন এবং লোকদেরকে আল্লাহর আনুগত্য ও ঐক্যবদ্ধ থাকার ওসিয়ত করে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বছর। হযরত মুয়াজ (রা) বিন জাবাল কাফন দাফনের ব্যবস্থা করলেন এবং মুসলমানদের সামনে এক দরদপূর্ণ ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা ! তোমরা আজ এমন এক মুসলমান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুসিবতে নিপতিত হয়েছ যার উদাহরণ আমি আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে কাউকে দেখিনি। তিনি সবার চেয়ে বেশী ক্ষমাশীল ছিলেন। তিনি সোরগোল থেকে পবিত্র ছিলেন। মুসলমানদের সবচেয়ে বেশী কল্যাণকামী ছিলেন এবং তাদের প্রতি সবার চেয়ে বেশী স্নেহশীল ছিলেন। এজন্য তোমরা সকলেই তাঁর জন্য রহমত এবং মাগফিরাতের দোয়া কর। আল্লাহর কসম, এখন তাঁর মত কোন ব্যক্তি তোমাদের সরদার হবে না।"

অতপর হযরত মুয়াজ (রা) জানাযার নামায পড়ালেন। হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ এবং হযরত জাহ্হাক (রা) বিন কায়েস কবরে নামলেন ও ইসলামের সেই সূর্যকে দাফন করে দিলেন।

হযরত আবু উবায়দাহর (রা) দাফনস্থল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাহ" গ্রন্থের একস্থানে তাঁর কবর ফাহলে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন এবং অন্য একস্থানে বাসইয়ানে তাঁর দাফনস্থলের কথা বলেছেন। ইবনে আছির (রা) "উসুদুল গাব্বাহ"তে তাঁর দাফনস্থল" আমওয়াস বলে বর্ণনা করেছেন। আমওয়াস রামলা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে চার ফারসাখ দূরে অবস্থিত। কিন্তু তিনি 'বাসইয়ান' বর্ণনা সম্বলিত রেওয়ায়াতকে বাতিল করেননি। হযরত আবু উবায়দার (রা) পারিবারিক জীবনের অবস্থা সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি শুধুমাত্র একটি বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীর নাম ছিল হিন্দ (রা) বিন জাবের। তাঁর গর্ভে দু'টি পুত্র ইয়াযিদ এবং উমায়ের জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সন্তান ছাড়া মারা যান।

অন্য এক রেওয়ায়াতে তাঁর দুই স্ত্রী থাকার উল্লেখও এসেছে। তবুও তাঁর বংশধারা আর সামনে এগোয়নি বলে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীসও পুস্তকাদিতে পাওয়া যায়। এসব হাদীসের রাবীদের মধ্যে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা), হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) এবং হযরত সুমরা (রা) বিন জুনদুবের মত জালিলুল কদর সাহাবী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর দিক থেকে হযরত আবু উবায়দাহ (রা) অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা, হক পথে ত্যাগ, রাসূল প্রেম, জিহাদের প্রতি শওক, পৌরষত্ব, যুহুদ বা ভক্তি, নৈতিকতা, ধৈর্য, স্নেহপরায়ণতা, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সবচেয়ে প্রোজ্জল। তাঁর এই গুণাবলীর কারণেই রাসূলের (সা)

নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি শুধুমাত্র রাসূলের যুগের সকল মর্যাদাই লাভ করেননি। বরং "আমীনুল উম্মাতের" মত একক উপাধিও তিনি লাভ করেছিলেন। তিনি এত সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, সকল সাহাবীই তাঁকে আন্তরিকভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। তিনি যখন মুজাহিদদেরকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) আরবের মশহুর শাহ সওয়ার বা অশ্বারোহী কায়েস বিন মাকশুহকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

"আমি তোমাকে আবু উবায়দাহ (রা) আল-আমীনের নেতৃত্বে প্রেরণ করছি। তিনি এমন মানুষ যে, তাঁর সঙ্গে যদি কেউ বাড়াবাড়িও করে তাহলে তিনি তাকে বরদাশত করে নেন। কেউ তার সাথে খারাপ ব্যবহার করলে ক্ষমা করে দেন। কেউ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তিনি তার সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করেন। তিনি মুসলমানদের ওপর খুব স্নেহপরায়ণ এবং কাফেরদের ওপর খুব কঠোর। এজন্য তোমরা কোন ব্যাপারে তাঁর আনুগত্যহীনতা এবং বিরোধিতা করো না। তিনি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেবেন তা কল্যাণের জন্য দেবেন।"

তাবকাতে ইবনে সায়াদে আছে, একবার হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু উবায়দাহ (রা) এবং হযরত মুয়াজ (রা) বিন জাবালের খিদমতে চারশ' দিনার ও চারহাজার দিরহাম প্রেরণ করলেন। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) নিজের অংশের সকল অর্থ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং হযরত মুয়াজও কতিপয় দিরহাম ও দিনার ছাড়া সবই মুসতাহিকদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন—স্ত্রীর বলার কারণে পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের জন্য তিনি কতিপয় দিনার ও দিরহাম রেখে দিয়েছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) যখন ব্যাপারটি জানতে পেলেন তখন সতস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে এই বাক্য উচ্চারিত হলো ঃ "আলহামদুলিল্লাহ, মুসলমানদের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছেন, যাঁদের দৃষ্টিতে স্বর্ণ ও রোপ্যের কোন তাৎপর্যই নেই।"

হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন এবং তিনি তাঁকে ভাই বলে ডাকতেন। ১৭ হিজরীতে আমীরুল মু'মিনীন বাইতুল মুকাদ্দাস তাশরীফ নিলেন। এ সময় তাঁর ইসতিকবালের জন্য সৈন্যদের নেতৃবৃন্দ প্রচণ্ড ভীড় করলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাদের মধ্যে হযরত আবু উবায়দাহকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ভাই কোথায়? লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, আমীরুল মু'মিনীন, আপনি কার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন? তিনি বললেন, আবু উবায়দাহর (রা) সম্পর্কে। ইত্যবসরে হযরত আবু উবায়দাহ (রা) নিজের উটনীর ওপর সওয়ার হয়ে এসে পৌছলেন। অন্য সাহাবীদের মধ্যে অধিকাংশই বিজয়সমূহের পর নিজেদের জীবন যাত্রার

মান পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আবু উবায়দার (রা) দেহের ওপর সেই সাদাসিধে এবং সাধারণ পোশাকই ছিল যা হযরত ওমর (রা) মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তাঁর গায়ে দেখেছিলেন। আমার ভাই, আমার ভাই বলে তিনি, তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অতপর কুশলাদি জিজ্ঞেসের জন্য তাঁর অবস্থান স্থলে তাশরীফ নিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। কারণ, তরবারী, ঢাল এবং উটের হাওদা ছাড়া সেখানে আর কোন ধরনের আসবাবপত্র ছিলো না। হযরত ওমর ফারুকের (রা) চোখ বুঁজে এলো এবং তিনি বললেন, "আবু উবায়দাহ (রা)! হায়, তুমি যদি আবশ্যকীয় সামান ঘরে রাখতে।" তিনি মুখাপেক্ষীহীনভাবে জবাব দিলেন ঃ "আমীরুল মু'মিনীন! একজন মুজাহিদের জন্য এই সামানই যথেষ্ট।"

বাইতুল মুকাদ্দাস অবস্থানকালে একদিন হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু উবায়দাহকে (রা) হাসি-খুশীভাবে এবং খোশ মেযাজের সঙ্গে বললেন, "ভাই, অন্যেরাতো আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু তুমি আমাকে দাওয়াত দাওনি। তুমিও আমাকে আজ দাওয়াত করো না।"

হযরত আবু উবায়দাহ (রা) আরজ করলেন, "আমীরুল মু'মিনীন, আমি এই ধারণায় চুপ ছিলাম যে হয়ত আপনি আমার দাওয়াত পসন্দ করবেন না। নচেৎ আমি নিজের গরীবখানায় আপনার জন্য সবসময় তাকিয়ে থাকবো।"

হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর অবস্থান স্থলে তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত আবু উবায়দাহ (রা) কয়েক টুকরো শুকনো রুটি আমীরুল মু'মিনীনের সামনে এনে দিলেন এবং আরজ করলেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন, আমি তো এই খাই। দু'বেলাই এই শুকনো রুটি পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিই।"

হযরত ওমর ফারুক (রা) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, "সিরিয়া এসে সবাই বদলে গেছে। কিন্তু আবু উবায়দাহ (রা) একমাত্র তুমিই পূর্বের অবস্থায় রয়েছ।"

অন্য আরেকস্থানে হযরত ওমর (রা) তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "কারোর মুখের ওপর প্রশংসা করাটা প্রশংসিত ব্যক্তির গর্দানে ছুরি চালানোর নামান্তর। কিন্তু আবু উবায়দা! আমি এটা না বলে পারছি না যে, তুমি ছাড়া আমাদের প্রত্যেকেই নিজেকে কিছুনা কিছু পরিবর্তন করে নিয়েছে।"

হযরত ওমর ফারুকের (রা) ওফাতের পূর্বে সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের পরামর্শ দিলেন। এ সময় তিনি বললেন; হায়! আবু

উবায়দাহ (রা) জীবিত থাকলে খিলাফতের জন্য আমি তাঁর নাম প্রস্তাব করতাম। কিয়ামতের দিন আমাকে তার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে আমি বলবো, হে আল্লাহ! আমি তোমার নবীকে (সা) তার ব্যাপারে একথা বলতে শুনেছি যে, "সে [আবু উবায়দাহ (রা)] এই উম্মাতের আমিন।"

সহীহ মুসলিমের এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত ওমর ফারুকের (রা) নিকট হযরত আবু উবায়দাহর (রা) এই মর্যাদা ছিল যে, তিনি তার বিরোধিতা করাকে মাকরুহ মনে করতেন।

সিরিয়ার শক্তিধর গর্ভনর এবং প্রধান সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও হযরত আবু উবায়দাহ (রা) এত বিনয়ী ছিলেন যে, তিনি কখনো মূল্যবান বা স্বতন্ত্র ধরনের কোন পোশাক পরিধান করেননি এবং কোন উঁচুস্থানে বৈঠকখানা বানাননি। সাধারণ পোশাকে সিপাহীদের মধ্যে মাটির বিছানায় বসে পড়তেন। রোমকদের দূত আসতো। জিজ্ঞেস করা ছাড়া সে জানতে পারতো না যে, মুসলমানদের আমীর কে। মোটকথা, তিনি বিনয় ও সাম্যের বিস্ময়কর উদাহরণ কায়েম করেছিলেন।

একবার এক মুসলমান সিপাহী দুশমনের একজন সিপাহীকে আশ্রয় দিল হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এবং হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ এটা মানতে আপত্তি জানালেন। তাঁরা বললেন, এই আশ্রয় একজন সিপাহী দিয়েছে। হযরত আবু উবায়দা (রা) একথা জানতে পেরে বললেন, আমি এই মুসলমান মুজাহিদ প্রদত্ত আশ্রয়কে বাতিল করতে পারি না। কেননা আমি রাসূল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি যে, মুসলমানদের প্রত্যেকেই সকলের পক্ষ থেকে আশ্রয় দিতে পারে।

এই বিনয় ও নম্রতা ছাড়াও তিনি নসিহত, তালকিন এবং হক কথন থেকে কখনো বিরত থাকতেন না। হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার খবর পেয়ে তিনি সিরিয়া থেকে তাকে এক প্রভাবপূর্ণ পত্র লিখলেন। যাতে তিনি আখিরাতের দিনের ভয় দেখিয়েছিলেন এবং আদল ও ইনসাফের তালকিন দিয়ে ছিলেন।

সত্যকথা হলো যে, হযরত আবু উবায়দাহর (রা) জীবন একটি আদর্শ জীবন ছিল। তার যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা হোক না কেন তা ছিল আলোকোজ্জ্বল। তাঁর জীবন মুসলিম উম্মাহকে মনযিলে মাকসুদ নির্ধারণে পথ দেখিয়ে থাকে।

হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস

করুণার আধার মহানবী (সা) হিজরত করে মদীনায় শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় মুসলমানরা বিশেষ করে সেই সব মুহাজির যাঁরা মক্কায় তেরটি বছর যাবত কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনের যাঁতায় নিষ্পেষিত হয়েছিলেন, কিছুটা শান্তির নিঃশ্বাস নিতে পারলেন। কিন্তু মদীনার ইহুদী এবং মক্কার মুশরিকরা মদীনায় মুসলমানরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে থাকুক তা কোনক্রমেই সহ্য করতে পারলো না। তাঁরা হকপন্থীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে দিল। মক্কায় কুরাইশরা অন্তরের জ্বালা মিটানোর জন্য মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাইকে একটি উত্তেজনাপূর্ণ চিঠি লিখলো। এই চিঠিতে তারা মুনাফিক সরদারকে হুমকি দিল যে, সে তাদের মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে। আশ্রিতকে হত্যা করে ফেলতে হবে অথবা মদীনা থেকে বের করে দিতে হবে। তা যদি না করে তাহলে তারা মদীনায় হামলা করে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে। আবদুল্লাহর যদি সাহস থাকতো তাহলে সে অবশ্যই মক্কায় কুরাইশদের কথামতো কাজ করতো। কিন্তু যখন তাকে এ ধরনের তৎপরতার পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করা হলো তখন সে চুপ মেরে গেল। সময়টি ছিল খুবই ভীতিপ্রদ। ইসলামের দুশমনরা মদীনার ওপর হামলার পরিকল্পনা আটছিলো। এজন্য সদা সতর্ক থাকার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম (রা) একটি নিয়ম করেছিলেন। তাঁরা রাতেও অস্ত্র বেঁধে শুতেন এবং পালা করে জেগে জেগে পাহারা দিতেন। নবীর (সা) আবাস গৃহকে তাঁরা কখনো অরক্ষিত রাখতেন না। রাত হোক অথবা দিন হোক কোন না কোন সাহাবী (রা) অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নবীর (সা) আবাসগৃহ অবশ্যই পাহারা দিতেন।

সেই সময়েরই একটি ঘটনা। এক রাতে হুজুরের (সা) ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘটনাক্রমে সে সময় কোন ব্যক্তি পাহারায় ছিলেন না। হুজুর (সা) বললেন ঃ "হায়! কোন নেক ব্যক্তি যদি আজ পাহারায় থাকতো।" ইতিমধ্যে অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা গেল। হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কে ? জবাব এলো, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি সায়াদ। জিজ্ঞেস করলেন, কি জন্য এসেছ। আরজ করলেন, আমার অন্তরে হুজুরের (সা) ব্যাপারে ভয় সৃষ্টি হলো। এজন্য পাহারা দিতে এসেছি।

প্রিয়নবী (সা) এই জবাব শুনে খুশী হয়ে গেলেন। হযরত সায়াদের (রা) জন্য দোয়া করলেন এবং পুনরায় আরাম করতে গেলেন—এই সায়াদ (রা)

যাঁকে রাসূলে আকরাম (সা) "রাজুলে সালেহ" বা নেক ব্যক্তির মহান লকব প্রদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন আবি ওয়াক্কাস মালিক বিন ওয়াহিবের পুত্র এবং কুরাইশের এক সম্মানিত শাখা বনু যাহরার নয়নমনি।

সাইয়েদেনা হযরত আবু ইসহাক সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস আসহাবে আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ'র অন্যতম ছিলেন এবং ইসলামের ইতিহাসের মহান ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস মালিক বিন ওয়াহিব বিন আবদি মান্নাফ বিন যাহরাহ বিন কিলাব বিন মুররাহ।

পঞ্চম পুরুষে কিলাব বিন মুররাহ'র ওপর তাঁর নসবের সিলসিলা রাসূলে আকরামের (সা) নসবনামার সাথে মিলে যায়। হুজুরের (সা) মাতা হযরত আমেনাও বনু যাহরাহ গোত্রভুক্ত ছিলেন এবং হযরত সায়াদের (রা) পিতা আবু ওয়াক্কাস মালিকের চাচাতো বোন ছিলেন। এই দিক থেকে আবু ওয়াক্কাস মালিক সম্পর্কে হুজুরের (সা) মামা হতেন এবং হযরত সায়াদ (রা) মামাতো ভাই—হুজুর (সা) কখনো কখনো ভালোবাসা ও স্নেহের বশবর্তী হয়ে (নানার দিককার সম্পর্কের কারণে) হযরত সায়াদকেও (রা) মামা বলে ডাকতেন।

হযরত সায়াদের (রা) মাতার নাম ছিল হাসনা বিনতে সুফিয়ান বিন উমাইয়া এবং তিনি বনু উমাইয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

নবীর (সা) হিজরতের প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে হযরত সায়াদ (রা) মক্কা মুয়াজ্জমায় জন্মগ্রহণ করেন। সারওয়ারে আলমের (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির সময় হযরত সায়াদ (রা) ছিলেন পূর্ণ যুবক এবং সে সময় তাঁর বয়স ছিল ১৭ কিংবা ১৯ বছর। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে সুন্দর স্বভাব ও প্রকৃতিদান করেছিলেন। যেই তাঁর কানে তাওহীদের দাওয়াত এলো, তক্ষুণি কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাতে সাড়া দিলেন এবং "সাবিকুনাল আউয়ালুনের" পবিত্র দলে শামিল হয়ে গেলেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণকারী বালেগ পুরুষদের মধ্যে তিনি তৃতীয় মুসলমান ছিলেন এবং অন্য কতিপয় রেওয়ায়াত অনুসারে তাঁর পূর্বে ৬-৭ জন বুজর্গ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যাহোক তিনি পবিত্র সেই কতিপয় নফসের অন্তর্ভুক্ত যারা দাওয়াতে হকের প্রথম সাত দিনের মধ্যে তাওহীদের ঝাণ্ডা তুলে ধরার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

হযরত সায়াদের (রা) মাতা হামনার নিজের বাপ-দাদার ধর্মের প্রতি গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি সেই ধর্মের প্রতি দিওয়ানা ছিলেন। তিনি যখন পুত্রের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনলেন তখন এতো দুঃখিত হলেন যে, খানা-

পিনা, কথা বলা, চলা-ফেরা সবই ত্যাগ করলেন। হযরত সায়াদ (রা) মাকে খুব গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং নিজের মাকে বিষাদপূর্ণ দেখাটা তাঁর জন্য একটা বড় ধরনের পরীক্ষার ব্যাপার ছিল। কিন্তু তিনি সেই পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হন। মা তিন দিন পর্যন্ত ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর রলেন। তাঁর একটিই বায়না ছিল যে, এই নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করো। কিন্তু সায়াদেরও (রা) একই জবাব ছিল ঃ

"মা, তুমি আমার সীমাহীন প্রিয়! কিন্তু তোমার দেহে যদি হাজার জীবনও থাকে এবং এক এক করে প্রতিটি জীবন বের হয়ে যায় তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করবো না।"

আল্লাহর দরবারে হযরত সায়াদের (রা) অটলতা ও দৃঢ়তা এমনভাবে গৃহীত হলো যে, সাধারণ মুসলমানের জন্য আল্লাহর এই ফরমান জারী হয়ে গেল ঃ

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ لا فَلَا تُطِعْهُمَا

"কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কোন (মাবুদকে) শরীক বানানোর জন্য—যাকে তুমি (আমার শরীক বলে) জান না—তোমার ওপর চাপ দেয়, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না।" (লোকমান ঃ ১৫)

ইসলাম গ্রহণের পর মায়ের অসন্তুষ্টি ছাড়া মুশরিকদের হাতের আরো অনেক কঠিন মুসিবত হযরত সায়াদকে (রা) সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি কাফেরদের গালি খেয়েছেন, অপবাদ সয়েছেন এবং দৈহিক শাস্তিও বরদাশত করেছেন। কিন্তু সামান্যতম পদস্খলনও হয়নি।

দাওয়াতে হকের শুরুতে সাহাবায়ে কিরাম (রা) কাফেরদের জ্বালাতন বা অপকর্ম থেকে বাঁচার জন্য মক্কার নিকটে পাহাড়ের সুনসান গিরিপথে লুকিয়ে এক আল্লাহর ইবাদত করতেন। হযরত সায়াদও (রা) এসব পবিত্র নফসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একদিন তিনি অন্য কতিপয় সাহাবীর সঙ্গে এক বিরাণ গিরিপথে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় কতিপয় মুশরিক সেখানে এসে পড়লো। তারা প্রথমত চীৎকার করলো এবং পরে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো। হযরত সায়াদের (রা) তখন ভরা যৌবন। তিনি আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। পাশেই উটের একটি হাড় পড়েছিল। তা উঠিয়ে মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করে বসলেন। একজন মুশরিকের মাথা ফেটে গেল এবং রক্ত বইতে লাগলো। তখন সেই দুষ্কৃতকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়াটাই

শ্রেয় মনে করলো। আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস প্রথম ব্যক্তি যিনি হকের সমর্থনে রক্তাক্ত কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন।

হিজরতের পূর্বে হযরত সায়াদের (রা) জীবনের সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল অধ্যায় সেই তিন বছর যে তিন বছর তিনি প্রিয় নবীর (সা) সাহচর্যে শে'বে আবি তালিবে অবরুদ্ধ ছিলেন। শে'বে আবি তালিবের অবরোধ যদিও বনি হাশিম ও বনু মুত্তালিবের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু হযরত সায়াদ (রা) হাশেমী ও মুত্তালেবী না হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) খাতিরে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে সমর্থন করেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে তিন বছর ভয়াবহ মুসিবত বরদাশত করেছিলেন।

সে যুগে অসহায় অবরুদ্ধরা কোন কোন সময় গাছের এবং জঙ্গলের পাতা পেড়ে পেড়ে উদর পূরণ করতেন। হযরত সায়াদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাতে তারা শুকনো চামড়ার একটি টুকরো কোথাও থেকে পেয়ে গেলেন। তারা তা পানি দিয়ে ধুলেন। অতপর আগুনের ওপর ভুনলেন। গুলিয়ে পানিতে মিশালেন এবং ছাতুর মত তা পান করে পেটের আগুন দূর করলেন।

নবুয়ত প্রাপ্তির একাদশ বছরে আল্লাহ তায়ালা ইয়াছরাববাসীকে ইসলামের প্রতি ঝুঁকিয়ে দিলেন। সুতরাং সে বছর ৬জন সুন্দর স্বভাবের খাজরাজী ইসলাম গ্রহণ করে ইয়াছরাব ফিরে গেলেন। পরের বছর ইয়াছরাব থেকে ১২ ব্যক্তি হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা লাভ করলেন। তার পরের বছর ৭৫ জন হকপন্থী ইয়াছরাব থেকে মক্কা পৌছে রহমতে আলম (সা)-এর পবিত্র হাতে এই প্রতিশ্রুতিসহ বাইয়াত করলেন যে, তিনি ইয়াছরাব গমন করলে তারা নিজেদের জীবন, সম্পদ এবং সন্তান দিয়ে তাকে হিফাজত করবেন। এই বাইয়াতকে "বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাহ" বলা হয়ে থাকে। তারপর হুজুর (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) ইয়াছরাবে হিজরতের অনুমতি দিলেন। বস্তুত অধিকাংশ সাহাবী (রা) মক্কাকে বিদায় জানিয়ে ইয়াছরাব চলে গেলেন। এই মুহাজিরদের মধ্যে হযরত সায়াদ (রা) এবং তাঁর যুবক ভাই উমায়েরও (রা) শামিল ছিলেন। ইয়াছরাব পৌছে হযরত সায়াদ (রা) এবং উমায়ের (রা) নিজের বড় ভাই উতবা (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের গৃহে অবস্থান শুরু করলেন। উতবা বুয়াছের যুদ্ধের পূর্বে মক্কায় এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন এবং কিসাসের ভয়ে পালিয়ে ইয়াছরাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন। উতবা যদিও মুশরিক ছিলেন তবুও তিনি অত্যন্ত আনন্দচিত্তে নিজের দুই সহোদরকে স্বগৃহে রেখেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত উতবা দীর্ঘ দিন যাবৎ কুফর ও

শিরকের অন্ধকারে পথভ্রষ্ট অবস্থায় ঘুরপাক খেতে লাগলেন। কিন্তু ইসলামের প্রতি তার শক্রতায় ছোট ভাইদ্বয় সামান্য পরিমাণও প্রভাবিত হলেন না এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক বজায় রলো। হযরত সায়াদের (রা) হিজরতের কিছুদিন পর মহানবীও (সা) ইয়াছরাবে শুভ পদার্পণ করলেন এবং পুরনো শহর ইয়াছরাব থেকে "মদীনাতুন্নবী" হয়ে গেল।

হিজরতের পর মুসলমানরা একটু শান্তি পেলেন এবং তারা কাফেরদের জুলুম নির্যাতনের হাত থেকে মাহফুজ হয়ে গেলেন। তা সত্ত্বেও মক্কায় মুশরিকদের হামলার ভয় সবসময়ই ছিল। এই ভীতির কারণে সাহাবায়ে কিরাম (রা) সবসময়ই সশস্ত্র থাকতেন এবং নবীর (সা) আবাসস্থলে নিয়ামত পাহারা দিতেন। সেই সময়ই হযরত সায়াদেরও (রা) কোন কোন সময় পাহারা দানের সৌভাগ্য হয়েছিল। মদীনার ওপর হামলার তদারক এবং মক্কার মুশরিকদের গতিবিধির প্রতি নজর রাখার জন্য হুজুর (সা) সাহাবাদের (রা) ছোট ছোট সশস্ত্র দলকে মাঝে মধ্যে মক্কার দিকে প্রেরণ করতেন। এসব অভিযানকে সারিয়্যাহ বলা হয়ে থাকে। বদরের যুদ্ধের পূর্বে যেসব সারায়া সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে সারিয়্যাহ উবায়দা (রা) বিন হারিছ, সারিয়্যাহ হামযা (রা) এবং সারিয়্যাহ আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশে হযরত সায়াদ (রা) একজন সাধারণ মুজাহিদ হিসাবে অংশ নিয়েছিলেন এবং এক সারিয়্যাহতে আটজন মুজাহিদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই অভিযানকে তাঁর নামানুসারে" "সাবিয়্যাহ সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস" বলা হয়। তাতে হযরত সায়াদ (রা) নিজের আটজন সঙ্গীসহ কুরাইশের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য খারার নামক স্থান পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু মুশরিকদের সাথে সংঘর্ষ বাধেনি।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, সারিয়্যাহ উবায়দা (রা) বিন হারিছে যদিও রক্তারক্তির ঘটনা ঘটিনি। কিন্তু হযরত সায়াদ (রা) কুরাইশদের দিকে একটি তীর চালিয়েই দিয়েছিলেন। সহীহ বুখারীতে স্বয়ং হযরত সায়াদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমিই প্রথম আরব যে আল্লাহর পথে তীর চালিয়েছিল।

সেই যুগে কতিপয় অভিযানে হযরত সায়াদ (রা) স্বয়ং বিশ্বনবীর (সা) সঙ্গী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন এটা ছিল খুব অভাবের যুগ। সহীহ বুখারীতে হযরত সায়াদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূলের (সা) সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করতাম এবং আমাদের নিকট গাছের পাতা ছাড়া খাওয়ার কোন জিনিসই থাকতো না। এমনকি আমাদের মল উট ও বকরীর লাদির মত হতো। তাতে কোন পিত্ত থাকতো না।

তাবারী বাওয়াতার (বাওয়াত) যুদ্ধে হযরত সায়াদের (রা) অংশগ্রহণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই যুদ্ধ দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়। তাতে দুইশ' সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুজুরের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসও শামিল ছিলেন এবং হুজুর (সা) তাকে সৈন্যের সাদা ঝান্ডা প্রদান করেছিলেন। এই পবিত্র বাহিনী কুরাইশের একটি বড় কাফেলার সাথে যুদ্ধের জন্য বাওয়াত নামক স্থান পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু কুরাইশের কাফেলা (যাতে দু'শ' মানুষ এবং আড়াই হাজার উট ছিল) কেমন করে যেন বেঁচে গেল।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে বদরের ময়দানে হক ও কুফুরের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় হযরত সায়াদ (রা) অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। যুদ্ধের সময় তাঁর মুকাবিলা কুরাইশের নামকরা বাহাদুর সাঈদ বিন আছের সঙ্গে হয়ে গেল। তিনি মুহূর্তের মধ্যে সাঈদকে জাহান্নামে প্রেরণ করলেন এবং তার মশহুর তরবারী জুলকাতিফার ওপর কবজা করে নিলেন। এই তরবারী নিয়ে তিনি রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। সে সময় পর্যন্ত গণিমাতের মালের ব্যাপারে কোন হুকুম নাযিল হয়নি। এজন্য হুজুর (সা) হযরত সায়াদকে (রা) নির্দেশ দেন যে, এই তরবারী যেখান থেকে এনেছো সেখানেই রেখে দাও। হযরত সায়াদ (রা) তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করলেন। কিন্তু এই তরবারী না পাওয়ার জন্য তার খুব দুঃখ হলো। তিনি তখন সামান্য দূরেই গিয়েছিলেন। এমন সময় সূরায়ে আনফাল নাযিল হলো। যাতে এই নির্দেশ ছিল ঃ

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّبًا

"অতএব তোমরা যা কিছু ধন-মাল লাভ করেছ তা খাও, তা হালাল এবং পাক।"(আনফাল ঃ ৬৯)

হুজুর (সা) হযরত সায়াদকে (রা) ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে, যাও এবং নিজের তরবারী নিয়ে নাও।

বদরের যুদ্ধে হযরত সায়াদের (রা) যুবক ভাই উমায়েরকে (রা) আল্লাহ পাক শাহাদাতের মর্যাদায় আসীন করেছিলেন। হযরত সায়াদ (রা) বলেন যে, যুদ্ধের আগে আমি উমায়েরকে (রা) দেখলাম যে এদিক ওদিক লুকিয়ে ছুপিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কি ব্যাপার উমায়ের ? সে বললো ভাইজান। আমার বয়স কম। ভয় পাচ্ছি যে রাসূলে আকরাম (সা) আবার আমাকে যুদ্ধ করতে না দেন। অথচ আল্লাহর পথে লড়াই করার আমার

আন্তরিক ইচ্ছা। আল্লাহ আমার ভাগ্যে শাহাদাতের মার্যাদা লিখে রাখতে পারেন। উমায়েরের (রা) আশংকা সঠিক বলে প্রামাণিত হলো। হুজুর (সা) তাঁর বয়স কম হওয়ার কারণে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। উমায়ের (রা) কাঁদতে লাগলেন। হুজুর (সা) তাঁর উৎসাহ এবং কাঁদার কথা জানতে পেয়ে তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়ে দিলেন। হযরত সায়াদ (রা) বলেন যে, উমায়েরের ছোট হওয়া এবং তরবারী বড় হওয়ার কারণে, আমি তার চামড়ার টুকরায় গিড়া দিতাম যাতে উচু হয়ে যায়। উমায়ের (রা) বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেন এবং দুশমনের নামকরা পাহলোয়ান আমর বিন আবদি দাদের হাতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। হযরত সায়াদ (রা) উমায়েরকে (রা) খুব ভালোবাসতেন। তাঁর শাহাদাত তার জন্য ছিল খুবই কষ্টের। কিন্তু তিনি "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন" পাঠ করে চুপ মেরে গেলেন। যুদ্ধে মুশরিকদের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো। তাদের ৭০ ব্যক্তি নিহত হলো এবং মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো ৭০ জন। তাদের মধ্যে তিন জনকে (হারিছ বিন দাহরা, সালেম বিন শামমাতা এবং ফাকিহা) একা সায়াদই (রা) কয়েদ করেছিলেন।

ওহোদের যুদ্ধে (তৃতীয় হিজরী) যখন ঘটনাক্রমে একটি ভুলের কারণে লড়াইয়ের মোড় ঘুরে গেল এবং মুসলমানরা বিশৃংখল হয়ে পড়লো তখন হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেই কতিপয় সাহাবীর (রা) মধ্যে ছিলেন যারা রাসূলকে (সা) রক্ষা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন পারদর্শী তীরন্দাজ। কাফেররা বার বার হুজুরের (সা) ওপর হামলা করতো। আর সায়াদ (রা) নিজের তীর দিয়ে তাদের মুখ ফিরিয়ে দিতেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, এই নাযুক সময়ে হযরত সায়াদ (রা) হুজুরের (সা) পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। হুজুর (সা) নিজের তুনীর থেকে তীর বের করে করে তাঁকে দিতেন এবং বলতেন ঃ

يَاسَعَدَ ارِمْ فِدَاكَ اَبِى اُمِّى

"হে সায়াদ! তীর চালাও আমার মাতা পিতা তোমার ওপর ফিদা হোক।"

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি সায়াদ (রা) ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে এমন ধরনের বাক্য রাসূলের (সা) পবিত্র যবান দিয়ে আর শুনিনি।

আল্লামা ইবনে আছির (রা) বর্ণনা করেছেন, ওহোদের যুদ্ধের দিন হযরত সায়াদ (রা) এক হাজার তীর চালিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় আবু সাঈদ বিন

আবিতালহা (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী তালহা বিন আবি তালহা) নামক একজন মুশরিক মুসলমানদের ওপর খুব জোরেশোরে হামলা করছিল। হযরত সায়াদ (রা) তাক করে তার হলকে এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করলেন যে তার জিহ্বা কুকুরের মত বেরিয়ে এলো এবং তড়পাতে তড়পাতে ঠান্ডা হয়ে গেল। অন্য আরেক জন মুশরিকও নিজের তীব্র হামলায় মুসলমানদের ওপর মুসিবত আপতিত করে রেখেছিল। হুজুর (সা) হযরত সায়াদকে (রা) নির্দিশে দিলেন যে তাকেও তোমার তীরের নিশানা বানাও। ঘটনাক্রমে সে সময়ে তুনিরে কোন তীর ছিল না। তবু৬ হযরত সায়াদ (রা) ফলা ছাড়া একটি তীর উঠিয়ে এমন নিপুণতার সঙ্গে সেই মুশরিকের কপালের ওপর মারলেন যে সে অজ্ঞান হয়ে পেছনে পড়ে গেল এবং উলঙ্গ হয়ে গেল। হুজুর (সা) হযরত সায়াদের (রা) নিপুণ তিরন্দাজী এবং সেই মুশরিকের অজ্ঞান হয়ে যাওয়াতে স্বতস্ফূর্ত ভাবে হেসে দিলেন। (কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই ঘটনা খন্দকের যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল)।

আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) বর্নণা করেছেন যে, ওহোদের যুদ্ধের একদিন পূর্বে হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্‌কাস এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ একস্থানে একত্রিত হলেন হযরত সায়াদ (রা) দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ ! আগামীকাল যে দুশমন আমার মুকাবিলায় আসবে সে যেন বিরাট বীর এবং ক্রোধান্বিত হয় এবং আমাকে এত শক্তি দিও যেন আমি তোমার রাস্তায় তাকে হত্যা করতে পারি।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ আমিন বললেন। অতপর তিনি এই দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ, আগামীকাল আমার মুকাবিলা এমন দুশমনের সঙ্গে যেন হয় যে খুব যুদ্ধবাজ ও ক্রোধান্বিত হবে। তার হাতে যেন আমার শাহাদাত নসিব হয় এবং সে যেন আমার নাক কান কেটে ফেলে। আমি যখন তোমার সাথে মিলিত হবো এবং তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে হে আবদুল্লাহ্ তোমার নাক কান কেন কাটা হয়েছে। তখন আমি বলবো যে, হে আল্লাহ, তোমার জন্য এবং তোমার রাসূলের (সা) জন্য।"

হযরত সায়াদও (রা) তাঁর দোয়ার সাথে আমীন বললেন। উভয়ের দোয়াই সত্য অন্তরে বের হয়েছিল। এজন্য তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে গেল। যুদ্ধে হযরত সায়াদ (রা) একজন নামকরা মুশরিককে হত্যা করলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ ইবনে আখনাস ছাকাফীর হাতে শাহাদাতের

পেয়ালা পান করলেন। মুশরিকরা তাঁর লাশ বিকৃত করলো এবং কান, নাক, ঠোঁট কেটে মালা বানালো। লড়াইয়ের পর হযরত সায়াদ (রা) সেই লাশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ঃ

"আল্লাহর কসম ! আবদুল্লাহর দোয়া আমার দোয়া থেকে উত্তম ছিল।"

এটা তার হৃদয়ের উত্তাপের বহিঃপ্রকাশ ছিল। আবদুল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন। অথচ তিনি তা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।

ওহোদের যুদ্ধে হযরত সায়াদের (রা) বড়ভাই উতবা মুশরিকদের পক্ষ নিল এবং অত্যন্ত উৎসাহের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করলো। একবার উতবা হুজুরের (সা) ওপর একটি পাথর নিক্ষেপ করলো। তাতে তাঁর (সা) পবিত্র চেহারা জখম হয়ে গেল। উতবার এই তৎপরতা হযরত সায়াদের (রা) আজীবন স্মরণ ছিল। তিনি বলতেন,"আল্লাহর কসম ! আমি উতবার রক্তের চেয়ে বেশী অন্য কারোর রক্ত পিপাসু ছিলাম না।"

বদর এবং ওহোদের পর হযরত সায়াদ (রা) খন্দক খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েব ও তাবুকেও রহমতে আলমের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধে তরবারীর কুশলতা দেখিয়েছিলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানকারী সেই ১৪শ'সাহাবীর (রা) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন, আল্লাহ পাক যাদেরকে আসহাবুশ শাজারা উপাধিতে ভূষিত করেন এবং স্পষ্ট ভাষায় জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

দশম হিজরীতে প্রিয় নবী (সা) বিদায়হজ্জের জন্য মক্কা মুয়াজ্জামা তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত সায়াদও (রা) হুজুরের সফরসঙ্গী ছিলেন। মক্কা পৌঁছে হযরত সায়াদ (রা) গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হুজুর (সা) তাঁর কঠিন অসুস্থতার কথা জানতে পেয়ে, সেবা শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ নিলেন। হযরত সায়াদ (রা) জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন "হে আল্লাহর রাসূল ! আমি বিত্তবান মানুষ এবং এক কন্যা ছাড়া অন্য কোন ওয়ারিশ নেই। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি দু'তৃতীয়াংশ সম্পদ সাদকা করে দেই এবং এক-তৃতীয়াংশ কন্যার জন্য রেখে দেই" তিনি বললেন, "না।" আরজ করলেন " দু'-তৃতীয়াংশ না হোক, অর্ধেকই দান করি।" হুজুর (সা) পুনরায় নেতিবাচক জবাব দিলেন। হযরত সায়াদ (রা) বলেন, অতপর তিনভাগের একভাগ সাদকা করার অনুমতি দিলেন। হুজুর (সা) বললেন, এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশী।

তুমি যদি তোমার ওয়ারিশদেরকে বিত্তবান রেখে যাও তাহলে তা ফকীর ও লোকদের নিকট হাত পাতার চেয়ে অনেক উত্তম হবে।

তারপর হযরত সায়াদ (রা) রোরুদ্যমান হয়ে আরজ করলেন, " হে আল্লাহর রাসূল ! আমি মক্কায় মারা যাচ্ছি। অথচ আমি হক পথে এই যমীনকে চিরকালের জন্য বিদায় জানিয়েছি। হুজুর (সা) তাঁকে ভরসা দিলেন এবং তাঁর চেহারা, কপাল ও পেটের ওপর পবিত্র হাত ঘুরিয়ে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ ! সায়াদকে (রা) সুস্থ করে দাও এবং তার হিজরত পূর্ণ করে দাও।"

মহানবীর (সা) দোয়া হযরত সায়াদের (রা) জন্য আবেহায়াত হিসাবে প্রমাণিত হলো এবং তাঁর শরীর তখন থেকেই সুস্থ হওয়া শুরু হলো। এমনকি তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে মদীনা ফিরে গেলেন। হযরত সায়াদ (রা) বলতেন যে, আমি রাসূলের (সা) পবিত্র হাতের শীতলতা আজ পর্যন্তও হৃদয়ে অনুভব করি।

একটি রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সায়াদের (রা) চিকিৎসার জন্য হুজুর (সা) প্রখ্যাত চিকিৎসক হারিছ বিন কালদাহকে ডেকে পাঠালেন। তিনি হযরত সায়াদের (রা) জন্য খেজুর ও তিসির আটার হারিরা ওষুধ হিসাবে দিলেন। বস্তুত তিনি তা ব্যবহার করেই সুস্থ হয়ে গেলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুজুর (সা) হযরত সায়াদের (রা) শুশ্রূষার সময় তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন; "হে সায়াদ, সম্ভবত আল্লাহ তোমাকে (মৃত্যু শয্যা থেকে) উঠাবেন এবং তোমার থেকে কিছু মানুষ উপকৃত হবে ও কিছু মানুষের ক্ষতি হবে।"

হুজুরের (সা) এই সুসংবাদ হযরত সায়াদের (রা) ব্যাপারে এমনভাবে পূরণ হলো যে, তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন এবং কয়েক বছর পর তাঁর নেতৃত্বে ইসলামের মুজাহিদরা অগ্নি উপাসক ইরানের শক্তি ছিন্নভিন্ন করে ফেললো।

একাদশ হিজরীতে মহানবী (সা) ওফাত পেলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন। এ সময় হযরত সায়াদ (রা) বিন আবিওয়াক্কাস নির্দ্বিধায় তাঁর বাইয়াত করেন। হযরত আবু বকর (রা) হযরত সায়াদের (রা) গুণাবলী ও যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতেন ও প্রশংসা করতেন। তিনি হযরত সায়াদকে (রা) বনু হাওয়াযিনের প্রশাসক নিয়োগ করেন।

তের হিজরীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) ওফাতের পর হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। এ সময় তিনিও হযরত সায়াদকে (রা) উক্তপদে বহাল রাখলেন। কিন্তু সর্বশক্তিমান তাঁকে দিয়ে

তা থেকেও কোন মহান কাজ নেওয়ার চিন্তা করে রেখেছিলেন। সিদ্দিকে আকবারের (রা) খিলাফতকালে ইরানের যবরদস্ত অগ্নি উপাসক শাসকের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই সংঘর্ষের প্রথম যুগ হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) ওফাতে শেষ হয়েছিল। এটা ছিল প্রায় এক বছরের মত। এ সময় আরব ও ইরানের সীমান্তে বসবাসরত বনু শাইবানের সরদার মুছান্না (রা) বিন হারিছা এবং হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ ইরানীদেরকে মারাত্মকভাবে পরাজিত করেন। কিন্তু তের হিজরীতে হযরত খালিদ (রা) যখন সিরিয়ায় ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব দানে আরবের ইরাক থেকে বিদায় হলেন তখন ইরানবাসী মুসলমানদেরকে উৎখাতের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলেন এবং এই লক্ষ্যে খুব জোরেশোরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। হযরত মুছান্না (রা) মদীনা পৌঁছে হযরত আবু বকর সিদ্দিককে (রা) এই অবস্থার খবর দিলেন। এই খবর পেয়ে তিনি মুসলমানদের নিরাপত্তার ব্যাপারে খুব সন্দিহান হয়ে পড়লেন। এ সময় তিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন বরং জীবনের শেষ পর্যায়ে অতিক্রম করছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি হযরত ওমর ফারুককে (রা) ওসিয়াত করলেন যে, "হে ওমর ! আমার জীবনের এখন শেষ অবস্থা আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিত থাকবো এই আশাও আমার নেই। আমার মৃত্যুর পর আগামীকালই তুমি মুছান্নাকে সাহায্য দিয়ে ইরাক রওয়ানা করে দেবে।" এই ওসিয়াতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) পরপারে যাত্রা করলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব হাতে নিয়েই হযরত মুছান্নাকে (রা) সাহায্যের জন্য হযরত আবু উবায়েদ (র) ছাকাফির নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্যের একটি দল প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে কতিপয় আরব গোত্র জিহাদে অংশগ্রহণের মর্যাদা লাভের জন্য তাদের সঙ্গে শামিল হয়ে গেলেন। এমনিভাবে আবু উবায়েদের (রা) সৈন্যের সংখ্যা কয়েক হাজারে পৌঁছে গেল। হযরত আবু উবায়েদ (র) ইরানীদেরকে নামরিক, কাসকর এবং আরো কতিপয় যুদ্ধে পরাজিত করে আরবে ইরাকের বিরাট একটা অংশ দখল করে নিলেন। এই পরাজয়ের খবর শুনে ইরানী উজিরে আজম রোস্তম বিন ফরখযাদ খুব অসন্তুষ্ট হলো এবং সে একজন বিশ্ব পর্যবেক্ষক সেনা অফিসার বাহমন জাদরিয়াকে বিরাট সৈন্য বাহিনী দিয়ে মুসলমানদেরকে মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করলো। এই সৈন্য বাহিনী ফোরাতের তীরে "কাসসে নাতিফ" নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। ওদিকে হযরত আবু উবায়েদ (রা) ফোরাতের অপর পারে মারোহা নামক স্থানে অবস্থান নিলেন। বাহমান জাদবিয়া তাঁকে পয়গাম প্রেরণ করে বললেন, তোমরা নদী অতিক্রম করে এপার আসবে, না আমরা যাবো। দুর্ভাগ্যবশত আবু উবায়েদের (রা) জানা ছিল না যে অপর পারে ময়দান খুব

অপ্রশস্ত এবং মুসলমানদের জন্য সেখানে কাতার বন্দী হওয়া কঠিন ব্যাপার। তিনি বীরত্বের আবেগে নিজের বাহিনীসহ নদী অতিক্রম করে ওপারে গিয়ে পৌঁছলেন। যুদ্ধ শুরু হলো। ইরানী বাহিনীর তিনশ' যোদ্ধা হাতি একদম কিয়ামতের অবস্থা করে ছাড়লো। বীরত্বের সাথে লড়াই করা সত্ত্বেও মুসলমানদের পা অসংলগ্ন হয়ে পড়লো। এই বিশৃংখল অবস্থায় কেউ নদীর পুল ভেঙ্গে দিল। ফল এই হলো যে. মুসলমানদের একটি বিরাট সংখ্যা নদীতে ডুবে গেল এবং অনেক সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে গেলেন। তাদের মধ্যে হযরত উবায়েদও (রা) শামিল ছিলেন। এই দুঃখজনক ঘটনা ইতিহাসে "জাসারের যুদ্ধ" অর্থাৎ "পুলের যুদ্ধ" নামে খ্যাত হয়ে আছে। হযরত মুছান্না (রা) বিন হারিছা শাইবানী খুব তাড়াতাড়ী জাসারের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে নিলেন এবং পরের বছর (চৌদ্দ হিজরীর রমযান মাসে) বোয়েব নামক স্থানে ইরানীদেরকে শিক্ষণীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে এক লাখেরও বেশী ইরানী যুদ্ধের ময়দানে মারা যায়। বোয়েবের যুদ্ধ মুসলমানদের নিকট জাসারের যুদ্ধের পূর্ণ জবাব ছিল। এই যুদ্ধে ইরানী অগ্নী উপাসকদের মর্যাদাবোধ সম্পূর্ণরূপে পদদলিত হলো। ইরানীরা রাণী পুরান দখতকে অপসারণ করে একজন নওজোয়ান শাহজাদা ইয়াযদগিরদকে সিংহাসনে বসালো এবং সাধারণ ও অসাধারণ সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালো। যেসব এলাকা মুসলমানরা দখল করে নিয়েছিলেন, সেসব এলাকাতেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো এবং চারদিক থেকে মুসলমানরা ভীতিপ্রদ অবস্থায় এসে দাঁড়ালো। হযরত ওমর (রা) এই পরিস্থিতির খবর পেয়ে মুছান্নাকে (রা) সমগ্র সৈন্য একত্রিত করে আরব সীমান্তে চলে যাওয়ার নির্দেশ সম্বলিত পত্র দিলেন।

সুতরাং হযরত মুছান্না (রা) নিজের সৈন্যদেরকে একত্রিত করে যুকার নামক স্থানে অবস্থান নিলেন। ওদিকে হযরত ওমর (রা) সমগ্র আরবে ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে লোকেরা যেন জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে। কিছু দিনের মধ্যেই চার দিক থেকে জিহাদের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত মানুষের ঢল মদীনায় এসে পৌঁছলো। হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসও বুন হাওয়াযিনের তিন হাজার মুজাহিদ রওয়ানা করলেন। আল্লামা শিবলী নু'মানীর বক্তব্য অনুযায়ী হযরত সায়াদের (রা) সৈন্যদের প্রত্যেকেই তরবারী ও ঝান্ডার মালিক ছিলেন (আল-ফারুক)। সেই বাহিনীকে দেখে হযরত ওমর (রা) খুব খুশী হলেন এবং তাদের সাথে ইরানীদের মুকাবিলায় বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু সাহাবীরা (রা) তাতে বাধা দিলেন এবং বললেন যে, মদীনা অবস্থানই তাঁর জন্য যথোপযুক্ত হবে। অতপর প্রশ্ন দাঁড়ালো যে এই বিরাট অভিযানের নেতৃত্ব

কাকে দেয়া যাবে। সকল নেতৃস্থানীয় সাহাবী (রা) এ ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে খুব তৎপরতার সাথে পরামর্শ শুরু করলেন। এ সময় একাকি হযরত আবদুর রহমান (রা) ইবনুল আওফ বলে উঠলেন, "পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি।"

হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "সে কে?" হযরত আবদুর রহমান (রা) জবাব দিলেন, "সায়াদ ইবনুল মালিক (আবি ওয়াক্কাস)।"

সকলেই তাঁর সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করলেন। হযরত ওমর (রা) তৎক্ষণাৎ পত্র লিখে হযরত সায়াদকে (রা) নজদ থেকে ডেকে পাঠালেন। কয়েকদিন পর মদীনা পৌঁছলে হযরত ওমর (রা) ইরান গমনকারী সৈন্যদের নেতৃত্ব তার নিকট সোপর্দ করলেন এবং ইমারাতের ঝান্ডা তাঁর হাতে দিতে দিতে নসিহত করলেন যে, হে সায়াদ! সকল অবস্থাতেই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) নির্দেশাবলীর ওপর আমল করবে। এছাড়া তিনি আরও অনেক অমূল্য হেদায়াত হযরত সায়াদকে (রা) প্রদান করলেন। ভবিষ্যতে এসব হেদায়াত তাঁর অনেক কাজে এসেছিল।

হযরত সায়াদ (রা) চার হাজার জানবাজকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন এবং ১৮ মনযিল অতিক্রমের পর ছা'লাবা নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। এখানেই হযরত ওমরের (রা) প্রেরিত আরো সৈন্যদল এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। এমনিভাবে তাঁর সৈন্যর সংখ্যা ২২ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সে সময় হযরত মুছান্না (রা) আট হাজার সৈন্যসহ জুকারে হযরত সায়াদের (রা) আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। হযরত সায়াদ (রা) তখনো ছালাবা ত্যাগ করেননি এমন সময় হযরত মুছান্না (রা) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে যাত্রা করলেন। জাসারের যুদ্ধে তিনি যে আঘাত পেয়েছিলেন তার সেলাই খুলে গেল এবং কোন চিকিৎসাতেই তা আর ভালো হলো না। ক্ষতের এই অবস্থাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে গেল। হযরত সায়াদ (রা) ছা'লাবা থেকে রওয়ানা দিয়ে শারাফ পৌঁছলেন। এসময় হযরত মুছান্নার (রা) আট হাজার সৈন্যও তাঁর সঙ্গে এসে একত্রিত হলো। মুছান্নার (রা) সহোদর মা'নাও (রা) বিধবা ভাবীসহ সেই বাহিনীতে ছিলেন। হযরত সায়াদ (রা) মুছান্নার (রা) ইন্তেকালের খবর শুনে খুব দুঃখীত হলেন। তিনি অন্তর জয়ের জন্য মুছান্নার (রা) বিধবা স্ত্রী সালমাকে (রা) নিকাহ করলেন এবং মা'নাকে (রা) মুছান্নার (রা) শিশুদেরকে ভালোভাবে লালন-পালন করার নির্দেশ দিলেন। শারাফে হযরত সায়াদ (রা) সৈন্যদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করলেন। এ সময় প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। শারাফ থেকে রওয়ানা হয়ে হযরত সায়াদ (রা) আজিব পৌঁছলেন। এটা ছিল ইরানীদের

একটি সীমান্ত চৌকি। এই চৌকির রক্ষক ইরানী সিপাহীরা মুসলমানদের আগমনের খবর শুনে কোন মুকাবিলা ছাড়াই ভেগে গেল। আজিবে কিছুদিন অবস্থানের পর হযরত সায়াদ (রা) কাদেশিয়াতে তাঁবু ফেললেন। স্থানটি ছিল শষ্য শ্যামলিমায়পূর্ণ এবং হযরত ওমর (রা) হযরত সায়াদকে (রা) সেখানেই তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এই হেদায়াতও দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন কতিপয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোককে দূত বানিয়ে ইরানের বাদশাহর নিকট প্রেরণ করেন। তাঁরা তাকে জিযিয়া প্রদান অথবা ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেবেন। সুতরাং হযরত সায়াদ (রা) হযরত নু'মান (রা) বিন মুকরিনের নেতৃত্বে চৌদ্দ ব্যক্তির একটি প্রতিনিধিদল মাদায়েন প্রেরণ করলেন। এই প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যই, ব্যক্তিত্ব বীরত্ব ও বক্তৃতা এবং আলোচনায় ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। তারা আরবের সাদাসিধে প্রথাগত পোশাক পরিধান করে ঘোড়ার খালি পিঠে চড়ে মাদায়েন পৌছলেন। এ সময়ে ইরানীরা তাঁদেরকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল যে তাঁরা কি করে তাঁদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন। ইয়াযদগিরদ ইসলামী প্রতিনিধি দলের আগমনের খবর পেয়ে খুব শান-শওকাতের সাথে দরবার সাজালো এবং আরব দূতদেরকে ডেকে পাঠালো। তারা দরবারে পৌছে ইয়াযদগিরদের সঙ্গে অত্যন্ত নির্ভিকভাবে আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদানের দাওয়াত দিলেন। তাতে ইয়াযদগিরদ অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং চেঁচিয়ে বললো ঃ

"তোমরা ভুখা-নাঙ্গা মানুষেরা আমাদের দেশকে লুটে নিতে চাও। আমি তোমাদের জন্য তোমাদের উটের ওপর খাদ্য শস্য ও শুকনো খেজুর এনে দিতে পারি এবং আরবে এমন শাসক নিয়োগ করতে পারি যে, সে তোমাদের আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করবে। এছাড়া যদি তোমরা অন্য কিছু চাও তাহলে জিল্লত ও ব্যর্থতার মৃত্যু ব্যতিত কিছু পাবে না।"

তার জবাবে প্রতিনিধি দলের সদস্য হযরত কায়েস (রা) বিন যারারাহ সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন ঃ

"হে বাদশাহ! আমরা সকলেই মর্যাদাবান আরব। তোমার এই অবজ্ঞা ও ঘৃণাসূচক কথা জবাব দানের যোগ্য নয়। তবুও শুনে নাও, আমরা সত্যি আল্লাহর সবচেয়ে খারাপ সৃষ্টি ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ আমাদের ওপর তার রহমত বর্ষণ করেছেন এবং আমাদের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। এই পয়গম্বর (সা) আমাদেরকে হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করেছেন। তুমিও যদি এই হেদায়াত কবুল কর তাহলে আমাদের ভাই হয়ে যাবে। নচেৎ জিযিয়া অথবা তরবারী এই দু'য়ের একটি তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।

এতক্ষণে ইয়াযদগিরদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে ধূলি মিশ্রিত মাটি আনিয়ে মুসলমানদের সামনে নিক্ষেপ করলো এবং তিক্ত কণ্ঠে বললো, "তোমরা এই মাটি পাবে, এই মাটি। এই মাটি উঠাও এবং এখান থেকে বের হয়ে যাও।"

হযরত আছেম (রা) ইবনুল আমর নিজের চাদরে মাটি রাখলেন এবং প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যের সাথে হাসিখুশীভাবে হযরত সায়াদের (রা) খিদমতে ফিরে এলেন তারা হযরত সায়াদকে (রা) মোবারকবাদ দিলেন। তাঁরা বললেন, হে আমীর! শত্রু স্বয়ং তার মাটি আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। আমরা এখন ইনশাল্লাহ অবশ্যই ইরানভূমি দখল করবো।"

ওদিকে এই প্রতিনিধি দল আগমনের পূর্বেই ইয়াযদগিরদের সেনাপতি রোস্তম এক বিরাট বাহিনীসহ সাবাত পৌঁছেছিলেন। প্রতিনিধিদল মাদায়েন যেতেই ইয়াযদগিরদ রোস্তমকে সাবাত থেকে কাদেসিয়া পৌঁছে মুসলমানদেরকে পিষে ফেলার নির্দেশ দিল। এই নির্দেশ পেতেই রোস্তম এক লাখ আশি হাজার সৈন্য এবং তিনশ' যোদ্ধা হাতীসহ সাবাত থেকে কাদেসিয়ার দিকে খুব শান শওকতের সাথে রওয়ানা দিল। তার প্রতিটি সৈন্য, যিরাহ পরিধান করে ছিল। যোদ্ধা হাতীদের পদভারে মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। স্বয়ং রোস্তমের সিংহাসন ছিল সোনার। এই সিংহাসন সোনার ছাতা দিয়ে ছায়া দেয়া হতো। মোটকথা, খুব শানশওকতের সাথে রোস্তম কাদেসিয়ার সামনে আতিক নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। সে ছিল একজন অভিজ্ঞ জেনারেল এবং মুসলমানদের জিহাদের উদ্দীপনা সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। এজন্য সে নিজের বিরাট সামরিক শক্তি সত্ত্বেও যুদ্ধ পাশ কাটাতে চেয়েছিল। সুতরাং সন্ধির, আলোচনার জন্য সে হযরত সায়াদকে (রা) তাঁর কোন আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রেরণের পয়গাম প্রেরণ করলো। হযরত সায়াদ (রা) তার ইচ্ছায় তিন অথবা চারটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু সন্ধি হলো না। মুসলমান দূতদের পরিষ্কার ও স্পষ্ট কথায় রোস্তমকে উত্তেজিত করে তুললো এবং শেষ প্রতিনিধি দলকে সে এই ঘোষণা দিয়ে বিদায় দিল যে, আগামীকাল আমরা মুসলমানদেরকে দলিত মথিত করে ছাড়বো।

পরবর্তী দিন রোস্তম অত্যন্ত শানশওকতের সাথে ফোরাত নদী থেকে তীরে নেমে মুসলমানদের সামনে ব্যূহ রচনা করলো। সে সময় দুইলাখ যোদ্ধা তার পতাকাতলে সমবেত ছিল। পক্ষান্তরে ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা ছিল তিরিশ হাজারের মত। কিন্তু মুসলমানদের জিহাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার

অবস্থাটা এমনছিল যে, তারা যেন এই ব্যূহ থেকে বের হয়ে পড়ে আর কি। দুর্ভাগ্যবশত এই নাযুক অবস্থায় হযরত সায়াদ (রা) কোন রোগের কারণে যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত হতে অক্ষম বা মাজুর হয়ে পড়লেন। রোগটি কি ছিল ? কেউ লিখেছেন যে, তিনি সায়াটিকায় আক্রান্ত হয়ে ছিলেন। আবার কেউ লিখেছেন যে, তাঁর রানে ফোঁড়া বের হয়ে ছিল। এজন্য ঘোড়ার ওপর সওয়ার হতে পারতেন না এবং পায়ে হেঁটে চলাও ছিল মুশকিল। এই অক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি নিজের বাহিনীকে স্বয়ং পরিচালনার সংকল্প ঘোষণা করলেন। যুদ্ধের ময়দানের নিকটই প্রাচীনকালের একটি মহল ছিল। তিনি এই মহলের দ্বিতীয় তলায় বালিশের সাহায্যে এমনভাবে বসলেন যে, যাতে সমগ্র যুদ্ধের ময়দান দৃষ্টির সামনে থাকে। তারপর তিনি খালিদ (রা) ইবনুল আরফাতা নামক একজন সামরিক অফিসারকে নিজের নিকট ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "খালিদ, তুমি আমার অবস্থা প্রত্যক্ষ করছো। খুব কষ্টে নড়তে পারি। শত্রু মাথার ওপর এসে পড়েছে। এখন যুদ্ধ পাশ কাটানো কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। যুদ্ধের ময়দানে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। কিছু সময় পরপর আমি কাগজের টুকরোয় হেদায়াতসমূহ লিখে তোমার নিকট প্রেরণ করতে থাকবো। সেই হেদায়াত অনুযায়ী সৈন্যদের দিয়ে যুদ্ধ করাবে।" সেই সাথে তিনি সৈন্যদের ঝান্ডাবাহীদেরকে পয়গাম প্রেরণ করলেন, "আমি এই রোগের কারণে কার্যত যুদ্ধে অংশ নিতে পারছি না। খালিদ (রা) ইবনুল আরফাতাকে আমি আমার নায়েব নিয়োগ করেছি। তার নির্দেশকে আমার নির্দেশ মনে করো এবং তার আনুগত্য করো।" হযরত সায়াদের (রা) হুকুম মুজাহিদদেরকে শোনানো হলো। এই হুকুমের সামনে সকলেই মাথা নত করে দিলেন।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে একদিকে রোস্তম ও অন্যান্য ইরানী আমীররা নিজেদের বাহিনীকে জাতীয়তার আবেগে উদ্বুদ্ধ করছিলো। অন্যদিকে আরবের মশহুর কবি ও বক্তারা ইসলামী বাহিনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং নিজেদের যুদ্ধ গাথা দিয়ে মুজাহিদদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। সাথে সাথে কারীরা সুললিত কণ্ঠে সূরায়ে আনফাল তিলাওয়াত শুরু করেছিলেন। তার প্রভাবে লোকজন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল এবং প্রত্যেক মুসলমানই শাহাদাতের আকাংখায় অস্থির হয়ে পড়লেন।

ইরানীরা সর্বপ্রথম নিজেদের যোদ্ধা হাতীদেরকে মুসলমানদের দিকে ঠেলে দিল। হাতীদের ভয়াবহ হামলা বাজিলা গোত্রের জানবাজরা রুখে দেয়ার জন্য এগিয়ে গেলেন। অনেক বাজালী মুজাহিদ জীবন দিয়ে দিলেন। কিন্তু হামলা রুখতে পারলেন না। হযরত সায়াদ (রা) এই পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে বনু বাজিলার সাহায্যের জন্য বনু আসাদকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। বনু

আসাদ বীরত্বের সাথে হাতীদের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু বন্য হাতীরা তাঁদেরকেও পিছনে হটিয়ে দিল। অতপর হযরত সায়াদ (রা) বর্শা ও তীর নিক্ষেপে সীমাহীন নিপুণ বনু তামিমকে পয়গাম প্রেরণ করে বললেন, হে বনি তামিম, আজ তোমাদের নিপুণতা প্রদর্শনের সময়। সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ভাইদেরকে সাহায্য কর। বনু তামিম নারায়ে তাকবির ধ্বনি দিয়ে এমন তীব্রভাবে হামলা করলেন যে, হাতীদের মুখ ফিরে গেল এবং তাদের ওপর সওয়ারদেরকে বর্শা ও তীর দিয়ে নীচে ফেলে দিল। এরপর উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রচন্ড হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মশহুর মরছিয়া বর্ণনাকারী মহিলা সাহাবী হযরত খানসাও (রা) নিজের চারপুত্রসহ জিহাদে অংশ নেয়ার জন্য কাদেসিয়া এসেছিলেন। যুদ্ধের ময়দান যখন চরমভাবে উত্তপ্ত তখন তিনি পুত্রদেরকে নির্দেশ দিলেন, "হে আমার পুত্ররা, যাও এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত হক পথে লড়াই কর।" মা'র নির্দেশ শুনতেই চার সহোদর ঘোড়ার বাগ উঠিয়ে নিলেন। যুদ্ধ গাথা পড়তে পড়তে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে একের পর এক শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত খানসা (রা) তাদের শাহাদাতের খবর শুনে বললেন ঃ "আল্লাহর শুকর যে, আমার পুত্ররা যুদ্ধের ময়দানে পিঠ প্রদর্শন করেনি এবং আল্লাহ তাদের শাহাদাতের মর্যাদা আমাকে দান করেছেন। সেই দয়াময় সত্ত্বার নিকট আমার আশা যে তিনি নিজের রহমতের ছায়ায় আমার পুত্রদের সাথে আমাকেও স্থান দেবেন।"

এমনিভাবে আরও অনেক মুজাহিদ শাহাদাতের আকাংখায় বিস্ময়কর উদাহরণ পেশ করেন। রাতের অন্ধকার যখন গভীর হলো, তখন উভয় বাহিনীর সৈন্যরা আঘাতে জর্জরিত হয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। কাদেসিয়ার যুদ্ধের এই প্রথম দিনকে ইয়াওমুল আরমাছ বলা হয়। এদিন পাঁচ থেকে ছশ' মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন এবং হাজার হাজার ইরানী নিহত হয়।

দ্বিতীয় দিন যুদ্ধের দামামা বাজতেই হযরত কা'কা' (রা) ইবনুল আমর তামিনী সিরিয়া থেকে এক হাজার জানবাজের সাথে সেখানে পৌছে গেলেন। হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ তাঁকে হযরত সায়াদের (রা) সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এই সাহায্য পৌছার পর মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধের ময়দান গরম হতেই প্রথম দিনের মত হাতীরা পুনরায় মুসলমানদের ওপর কিয়ামত সৃষ্টি করলো। হযরত কা'কা' (রা) এই মুসিবত মুকাবিলার জন্য একটি কৌশল আবিষ্কার করলেন। তিনি উটের ওপর বড় বড় ঝোলা দিয়ে তাদেরকেও হাতির মত ভীতি প্রদ বানিয়ে ফেললেন, ইরানীদের

ঘোড়া তা দেখে পিছু হটে যেতো এবং মুসলমান তাদের সওয়ারকে বর্শার খোরাক বানাতে লাগলেন। রোস্তম তখন পদাতিক বাহিনীকে সওয়ারদেরকে সাহায্যের জন্য সামনে অগ্রসর করালো। এই বাহিনী অন্ধকার ও তুফানের মত মুসলমানদের ওপর হামলা করলো। মুসলমানরা খুব বীরত্বের সাথে সেই ঝড়ের বেগের হামলা রুখে দিলো। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার ছিল যে, মাদায়েন থেকে ইরানী বাহিনী অব্যাহতভাবে তাজা দম সৈন্য সাহায্য হিসেবে লাভ করছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে হযরত হাশেম (রা) ইবনুল উতবা পাঁচ হাজার জওয়ানের সাহায্যকারী সৈন্য সমেত সিরিয়া থেকে কাদেসিয়া পৌছে গেল। এই অদৃশ্য সাহায্য মুসলমানদের সাহস দ্বিগুণ করে দিল। কিন্তু ইরানীদের বিরাট বাহিনী কোনক্রমেই কম হচ্ছিল না। এ সময় এক আশ্চর্য ধরনের ঘটনা ঘটলো। বনু ছাকিফ গোত্রের মশহুর বাহাদুর আবু মাহজান (রা) মদ পানের অভিযোগে হযরত সায়াদের (রা) অবস্থানস্থলের নিকট হাত-পা বাধা অবস্থায় একটি কক্ষে কয়েদ ছিলেন। তিনি কয়েদখানার ছিদ্র দিয়ে যুদ্ধের দৃশ্য দেখে খুব অস্থির হয়ে পড়ছিলেন এবং বীরত্বের আবেগে নিজের ঠোঁট বার বার দাঁত দিয়ে চেপে ধরছিলেন। হযরত সায়াদের (রা) স্ত্রী সালমা (রা) নিকটেই ছিলেন। তাঁর কাছে আবেদন জানিয়ে বললেন, এখন আমাকে ছেড়ে দাও। শহীদ হয়ে গেলে উত্তম নচেৎ নিজেই এসে বেড়ি পরে নেব। সালমা (রা) হযরত সায়াদের (রা) ভয়ে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁর প্রত্যাখ্যানে আবু মাহজানের অন্তর ভেঙ্গে পড়লো এবং জিহাদ থেকে নিজের বঞ্চনার জন্য অত্যন্ত দরদভরা কবিতা পাঠ করতে লাগলেন। এই কবিতা শুনে সালমার (রা) অন্তর বিগলিত হয়ে গেল এবং তিনি আবু মাহজানকে (রা) শুধু ছেড়েই দিলেন না। বরং ঘোড়া ও অস্ত্রও দিয়ে দিলেন। আবু মাহজান (রা) মুখ ও মাথায় কাপড় লেপ্টে ঘোড়া দৌড়ে দুশমনের ব্যূহের ওপর বিদ্যুতের মত আপতিত হলেন এবং তাদেরকে বিশৃংখল করে ফেললেন। তাঁর উদ্দীপনার অবস্থাটা এমন ছিল যে, কখনো যুদ্ধের ময়দানের এক দিকে থাকতেন। আবার পরক্ষণেই অন্যদিকে উপস্থিত হতেন। মুসলমানরা বিস্মিত হয়ে পড়লো যে, এই নিকাবধারী কে? সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য কোন ফেরেশতা নাযিল করেছেন। স্বয়ং হযরত সায়াদ (রা) আবু মাহজানের (রা) বাহাদুরী দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মনে মনে বলছিলেন, লোকটির যুদ্ধের ধরন দেখেতো মনে হয় যে, সে আবু মাহজান (রা)। কিন্তু সেতো এখন কয়েদ। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দান খুব গরম রলো। অন্ধকার যখন গভীর হলো এবং উভয় বাহিনী স্ব-স্ব অবস্থানস্থলে ফিরে গেল তখন হযরত আবু মাহজানও (রা) ফিরে এসে নিজের বেড়ি নিজেই পরিধান করলেন।

হযরত সায়াদ (রা) ওপর তলা থেকে নীচে নেমে এলেন এবং যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করতে করতে সালমাকে (রা) বললেন, "আজ আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের ময়দানে এক আশ্চর্য ধরনের মানুষ প্রেরণ করেছিলেন লোকটি মুখের ওপর নিকাব দিয়ে রেখেছিলেন এবং উবলক ঘোড়ার ওপর সওয়ার ছিলেন। সে দুশমনের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি যদি আবু মাহজানকে কয়েদ করে না রাখতাম, তাহলে আমি মনে করতাম যে সেই ব্যক্তি আবু মাহজানই।"

একথা শুনে সালমা (রা) ঘটনা বর্ণনা করলেন। হযরত সায়াদ (রা) খুব প্রভাবিত হলেন এবং অশ্রু নয়নে বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি এ ধরনের মুজাহিদকে কয়েদ রাখতে পারি না।" একথা বলেই তিনি তক্ষুণি হযরত আবু মাহজানকে (রা) মুক্ত করে দিলেন। তিনিও ছিলেন মরদে মু'মিন। মুক্তি পেতেই হযরত সায়াদকে (রা) বললেন, "হে আমীর, হদ বা শাস্তির ভীতি আমাকে মদ পান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। কিন্তু আজ আমি আল্লাহর ভয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে কখনো মদ স্পর্শ করবো না।"

কাদেসিয়ার যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনকে ইয়াওমুল আগওয়াছ বলা হয়ে থাকে। এদিন দশ হাজার ইরানী নিহত হয় এবং দু'হাজার মুসলমান শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

তৃতীয় দিন সকালে উভয় বাহিনী পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলো। হযরত সায়াদ (রা) দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করছিলেন যে, আজ যুদ্ধের ফায়সালা করেই ছাড়বেন। বস্তুত তার হেদায়াত অনুযায়ী মুসলমানরা অগ্রসর হয়েই খুব দ্রুত গতিতে ইরানীদের ওপর হামলা করছিলেন। কিন্তু ইয়াওমুল আরমাছের মত আজও ইরানীদের হাতিগুলো প্রচন্ড ধ্বংস লীলা সাধন করলো এবং মুসলমানদেরকে সিদ্ধান্তমূলক আঘাত হানা থেকে বিরত রাখলো। পাহাড় সদৃশ দু'টো সরদার হাতি খুব বেশী ক্ষতি করছিল। হযরত সায়াদ (রা) বনু তামিম ও বনু আসাদকে হাতি দু'টোকে শেষ করার নির্দেশ দিলেন। তামিমী যোদ্ধারা হযরত সায়াদের (রা) নির্দেশ পেতেই সাদা হাতিটির ওপর হামলা করলো। হাতিটির দিকে কোন মুজাহিদ অগ্রসর হলেই শুঁড় দিয়ে ধরে পায়ের নীচে পিষে তাকে শহীদ করে ফেলতো। এমনিভাবে কয়েকজন মুজাহিদ একেরপর এক শাহাদাতের পিয়ালা পান করলেন। শেষে কা'কা' (রা) ও আছেম (রা) সেই হাতির দিকে অগ্রসর হলেন এবং তার শুঁড় কেটে দিলেন এবং চোখ অকেজো করে ফেললেন। অন্য দিকে অপর হাতিটির অবস্থাও একই ধরনের হলো। উভয় হাতি প্রচন্ড ব্যাথায় চীৎকার দিতে দিতে পেছনের দিকে ভাগলে অন্য হাতিও তাদের অনুসরণ করলো। এমনিভাবে হাতির মুসিবত থেকে আল্লাহ

তায়ালা মুসলমানদেরকে নাজাত দিলেন। ততক্ষণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু হযরত সায়াদ (রা) যুদ্ধের ফায়সালা করার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তিনি নিজের সৈন্যদেরকে নতুন করে সাজালেন এবং তারপর তাদেরকে ইরানীদের ওপর সিদ্ধান্তকর হামলা চালানোর নির্দেশ দিলেন। বীরত্ব্যের আবেগে উদ্বেলিত মুজাহিদরা ইরানীদের ওপর এমন প্রচণ্ড হামলা চালালেন যে, তাদের পা টল টলায়মান হয়ে উঠলো। হযরত কা'কা' (রা), আছেম (রা), আমর (রা) ইবনুল মা'দিকারব, কায়েস (রা) ইবনুল আশয়াছ এবং তাদের জানবাজ সঙ্গীরা ইরানী বাহিনীর কেন্দ্রভাগ উল্টে দিলেন এবং রোস্তমের সিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। রোস্তমের যিরাহ পরিধানকারী হিফাজতী দল প্রচণ্ডভাবে বাধা দিল। কিন্তু মুসলমান জানবাজরা তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে ফেললো। রোস্তম গুরুতরভাবে আহত হয়ে ভেগে দাঁড়ালো এবং নদীতে ঝাঁপ দিল। হেলাল ইবনুল আলকামা নামক এক মুজাহিদ তার ঠ্যাং ধরে টেনে তুললো এবং তার মাথা কেটে নিল। তারপর সে রোস্তমের সিংহাসনের ওপর আরোহণ করে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো, "আমি রোস্তমকে হত্যা করে ফেলেছি।" এই আওয়াজ শুনেই ইরানীদের চেতনা সম্পূর্ণরূপে লোপ পেতে শুরু করলো এবং তারা ভেড়া বকরীর মতো মারা পড়লো, যে রাতে এই রক্তাক্ত যুদ্ধ শেষ হলো তাকে " লাইলাতুল হারির" বলা হয়ে থাকে। তার পূর্বে অর্থ্যাৎ যুদ্ধের তৃতীয় দিন "ইয়াওমুল উমাস" নামে প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধে ৩০ হাজার ইরানী নিহত হয় এবং তাদের এমন শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটে যে, কিসরার সিংহাসনের মূলই নড়বড়ে হয়ে গেল। এই যুদ্ধে ইরানীদের জাতীয় পতাকাও মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং গণিমতের মালের তো কোন সীমা পরিসীমাই ছিল না। মুসলমান শহীদদের মোট সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার ছিল।

কাদেসিয়ার মহান বিজয়ের পর হযরত সায়াদ (রা) বাবল পর্যন্ত ইরানীদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং আশেপাশের সকল এলাকা কবজা করে নিলেন। ইরানের রাজধানী মাদায়েন নিকটেই ছিল। হযরত ওমরের (রা) হেদায়াত অনুযায়ী হযরত সায়াদ (রা) মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হলেন। পথি-মধ্যে ইরানীরা স্থানে স্থানে বাধা দিল এবং কয়েকটি ছোটখাটো সংঘর্ষ হলো। কিন্তু সাহসী মুজাহিদরা অমিতবিক্রমে মাদায়েন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন এবং তার পশ্চিম অংশ অবরোধ করে নিলেন।

এই অবরোধ দু'মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। শেষে সকল ইরানী বিশেষ করে মাদায়েনে যারা দাজলা নদীর পূর্বতীরে বসবাস করতো তারা একত্রিত হলো। তারা নদীর পুল ভেঙ্গে সকল নৌকা অপর তীরের দিকে নিয়ে গেল। সে সময় নদীতে প্রচন্ড তুফান এসেছিল এবং তা অতিক্রম করা বাহ্যতঃ ছিল

অসম্ভব ব্যাপার। হযরত সায়াদ (রা) এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আল্লাহর নাম নিয়ে নিজের ঘোড়া নদীর মধ্যে চালিয়ে দিলেন। অন্য মুজাহিদরাও তাঁকে অনুসরণ করলো। দাজলার ফুঁসে ওঠা পানির ওপর মুজাহিদরা ঘোড়ার জিনের সঙ্গে সংলগ্ন পদদ্বয় রাখার লোহার আংটির সাথে আংটি মিলিয়ে এমনভাবে অগ্রসর হতে লাগলেন যেন তারা ফুল বাগানের আঙ্গিনায় আমোদ-প্রমোদ করছিলেন। ইরানীরা তা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়লো। বেশ কিছুক্ষণ তারা একনজরে মুসলমানদেরকে দেখতে লাগলো এবং "দেও এসেছে, দেও এসেছে" বলে পালানো শুরু করলো। ইয়াযদগিরদ নিজের হেরেম ও সম্পদের একাংশ আগেই হালোয়ান প্রেরণ করেছিল। এখন নিজেও মাদায়েনের ব্যথায় প্রাচীরের ওপর ব্যর্থতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পালিয়ে গেল। হযরত সায়াদ (রা) মাদায়েন প্রবেশ করলেন। এ সময় চারদিকে গভীর নীরবতা ছেয়েছিল এবং কিসরার প্রাসদসমূহ অন্যান্য আজিমুশ্বান ভবনসমূহ এবং সবুজে ঘেরা বাগান-সমূহ বর্তমান অবস্থার ভাষা দিয়ে পার্থিব জগতের অস্থায়ীত্বের ঘোষণা দিচ্ছিল। এই দৃশ্য দেখে হযরত সায়াদের (রা) মুখ দিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে এই আয়াত জারী হয়ে গেল ঃ

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ○ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا
فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ○ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ○ فَمَا بَكَتْ
عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ○

"কতনা বাগ-বাগীচা, ঝর্ণাধারা, ক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদ রাজী ছিল, যা তারা পেছনে রেখে গিয়েছিল। কতইনা বিলাস সামগ্রী যাতে তারা আনন্দ করছিল তাদের পিছনের পড়ে রলো। এই হলো তাদের পরিণাম! আর আমরা অন্য লোকদেরকে এসব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানালাম। অতপর না আসমান তাদের জন্য কাঁদলো, না যমীন। তাদেরকে খানিকটা অবসরও দেয়া হলো না।" (আদ-দুখান ঃ ২৫-২৮)

মাদায়ানে মুসলমানরা কোটি কোটি দিনারের গনিমতের মাল লাভ করলো। তার মধ্যে এমন এমন বিরল বস্তু ছিল যা দেখে মানুষের জ্ঞান বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। এসব বস্তুর মধ্যে কতিপয়ের নাম হলো ঃ

নওশিরওয়ার সোনা খচিত মুকুট, শাহানে সালফের জরি মন্ডিত খঞ্জর, যিরা এবং তরবারী, নীরেট সোনার একটি বিরাট কৃতির ঘোড়া। ঘোড়াটির বুকে ইয়াকুত জড়ানো ছিল। তার ওপর ছিল সোনায় নির্মিত একজন সওয়ার।

সওয়ারটির মাথায় ছিল হিরার মুকুট। এমনিভাবে সোনার উটনীও তার সোনার সওয়ার। কিসরার প্রাসাদের সোনার বিছানা যার আয়তন ছিল ৬০ বর্গগজ। তা ছিল মূল্যবান জওহর দিয়ে সজ্জিত।

মুসলমানরা এই মূল্যবান গনিমাতের মাল একত্রিত করার কাজে এমন বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, বিশ্বের ইতিহাস তার উদাহরণ পেশ করতে অক্ষম। কোন মুজাহিদ যদি সামান্য একটি সুঁচও পেয়ে থাকতো অথবা মূল্যবান জওহর, তাহলে সে তা নির্দ্বিধায় আমীরের নিকট জমা দিয়ে দিত। এরা ছিল সেই আরব যাদের নিয়ে ইরানবাসীরা ভূখা-নাঙ্গা থাকার উপহাস করতো। হযরত সায়াদ (রা) গনিমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ মদীনা প্রেরণ করলেন এবং অবশিষ্ট সব মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

মাদায়েন বিজয়ের পর মুসলমানরা সামনে অগ্রসর হয়ে জালোলা, হালওয়ান, তাকরিত, মোসাল, হাইত এবং মাসবাজান প্রভৃতি স্থান জয় করে নিল এবং আরব ইরাকের শেষ সীমানা পর্যন্ত তাদের শাসনের বিস্তার লাভ ঘটলো। তারপর হযরত ওমর (রা) মুসলমানদেরকে সামনে অগ্রসর হওয়ায় বাধা দিলেন এবং হযরত সায়াদকে (রা) বিজিত এলাকাসমূহের গভর্নর বানিয়ে তার আইন-শৃংখলা রক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করার নির্দেশ দিলেন।

হযরত সায়াদ (রা) মাদায়েনে নিজের স্থায়ী আবাস বানিয়ে ইমারাতের দায়িত্ব এমন যোগ্যতা ও ইনসাফের সঙ্গে আঞ্জাম দিলেন যে, সকল প্রজা সাধারণ কৃতজ্ঞ হয়ে গেল। মুসলমানদের পূত-পবিত্র ও পসন্দনীয় পর্বসমূহ ইরানীদের অন্তর জয় করে নিল এবং তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। হযরত সায়াদ (রা) অত্যন্ত অল্প সময়ে বিজিত এলাকায় আদম শুমারী এবং ভূমির জরীপ করালেন। জমির আসল মালিকদের দখল বহাল রাখলেন এবং পতিত জমি মুসতাহিক ও যোগ্য লোকদের দখলে আনার অনুমতি দিলেন। ধন-সম্পদ ও জিযিয়ার অত্যন্ত ইনসাফপূর্ণ আইন রচনা করলেন এবং সাধারণের কল্যাণের অনেক কাজ করালেন। কিছু দিনের মধ্যেই সারা দেশে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতার যুগ শুরু হলো। এমনিভাবে সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হযরত সায়াদ (রা) প্রমাণ করলেন যে, তিনি শুধুমাত্র একজন যোগ্য সেনাপতিই নন বরং উত্তম গভর্নরও।

মুসলমানরা বেশ কিছু দিন মাদায়েনে অবস্থান করলেন। তারপর হযরত সায়াদ (রা) অনুভব করলেন যে, সেখানকার আবহাওয়া মুসলমানদের উপযোগী হয়নি। তিনি এই অবস্থা পত্রের মাধ্যমে হযরত ওমরকে (রা) জানালেন। সেখান থেকে নির্দেশ এলো যে, আরব সীমান্তের মধ্যে একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করে একটি নতুন শহরের পত্তন ঘটাও। কিন্তু

সেখানকার আবহাওয়া যেন সুন্দর হয়। সুতরাং হযরত সায়াদ (রা) সতের হিজরীতে কুফা শহর আবাদ এবং রাজধানীও মাদায়েন থেকে কুফা স্থানান্তর করেন। কুফা এসে হযরত সায়াদ (রা) সাধারণের কল্যাণমূলক কাজের প্রতি আরো বেশী মনোযোগ দেন। ছোট ছোট নহর কেটে পানি সরবরাহের খুব সুন্দর ব্যবস্থা করেন। অনেক পুল ও মুসাফিরখানা বানান এবং নিজের অর্থ দিয়ে কয়েকটি মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সৈন্যদের বেতন বন্টনের সুন্দর ব্যবস্থা এবং সৈন্য সংখ্যা ও যুদ্ধ সরঞ্জামের পরিপ্রেক্ষিতে কুফায় ইসলামী বিশ্বের সবচেয়ে বড় ছাউনী বানালেন।

হযরত সায়াদের (রা) কুফা অবস্থানকালে কুফাবাসীর একটি দল তাঁর বিরোধী হয়ে গেল এবং তারা হযরত ওমরের (রা) নিকট অভিযোগ করলো যে, হযরত সায়াদ (রা) ভালোভাবে নামায পড়ান না। হযরত ওমর (রা) হযরত মুহাম্মদ (রা) ইবনুল মুসলিমাকে প্রেরণ করে তদন্ত করালেন। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলো। তা সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা) একুশ হিযরীতে হযরত সায়াদকে (রা) মুসলিহাতের কারণে আমীরের পদ থেকে অপসারণ করলেন এবং তিনি মদীনা ফিরে এলেন।

২৩ হিজরীতে এক অগ্নি উপাসক গোলাম আবুলুলু ফিরোজ হযরত ওমরের (রা) ওপর হত্যামূলক হামলা করে বসলো। আঘাত এত গুরুতর ছিল যে, তাঁর বাঁচার আর আশা রলো না। সুতরাং লোকেরা তাঁর নিকট তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের আবেদন জানালো। ফারুকে আজম (রা) অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ৬ জন মহান সাহাবীর নাম উল্লেখ করলেন এবং বললেন তাঁরা নিজেদের মধ্য থেকে যাঁকে ইচ্ছা খলিফা নির্বাচন করে নেবেন। এই ৬ জনের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সায়াদ (রা)। অন্য পাঁচজন হলেন ঃ হযরত আলী (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম, হযরত তালহা (রা) ইবনুল উবায়দুল্লাহ এবং হযরত আবদুর রহমান (রা) ইবনুল আওফ।

হযরত ওমর ফারুক (রা) ওফাতের পূর্বে হযরত সায়াদ (রা) সম্পর্কে বিশেষভাবে এই কথাগুলো বলেছিলেন ঃ

"আমি সায়াদকে (রা) দায়িত্বহীনতা অথবা খিয়ানতের কারণে পদচ্যুত করিনি। সায়াদ (রা) যদি খিলাফতের জন্য নির্বাচিত হন তাহলে সে তার যোগ্য এবং সে যদি নির্বাচিত না হয় তাহলে যিনি খলিফা নির্বাচিত হবেন তিনি তার নিকট থেকে সাহায্য নেবেন।"

ফারুকে আজমের (রা) ওফাতের পর মজলিশে শুরা আলাপ আলোচনার পর হযরত ওসমানকে (রা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করলেন। তিনি খিলাফতের আসনে বসেই হযরত সায়াদকে (রা) দ্বিতীয়বার কুফার গভর্নর নিয়োগ করলেন। এবার তিনি সেই পদে তিন বছর ছিলেন। ২৬ হিজরীতে বাইতুলমালের ব্যবস্থাপক হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনুল মাসউদের সঙ্গে মতবিরোধ হলে হযরত ওসমানও (রা) তাঁকে আমীরের পদ থেকে অপসারণ করেন। তারপর হযরত সায়াদ (রা) দেশের রাজনীতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে নেন এবং মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দশ মাইল দূরে আকীক নামক স্থানে নির্জনত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আকীক অবস্থানের দীর্ঘ সময়ে ইসলামী বিশ্বে বড় বড় উত্থান-পতন এবং ফিতনা-ফাসাদ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি এসব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতের শেষের দিকে যখন মুফসিদ বা বিদ্রোহীরা খলিফার আবাসস্থল অবরোধ করলো তখন হযরত সায়াদ (রা) আকীক থেকে মদীনা তাশরীফ আনলেন এবং বিদ্রোহীদেরকে সামর্থ অনুযায়ী বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা হযরত সায়াদের (রা) নসিহতের কোন প্রভাব গ্রহণ করলো না এবং তিনি নিরাশ হয়ে আকীক ফিরে গেলেন। হযরত ওসমান গনির (রা) মজলুমানা শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খলিফার আসনে আসীন হলেন। এ সময় হযরত সায়াদ (রা) নির্দ্বিধায় তাঁর বাইয়াত করেন। কিন্তু উষ্ট্র ও সিফ্‌ফিনের কোন যুদ্ধেই তিনি অংশ নেননি। উষ্ট্রের যুদ্ধে লোকজন তাঁকে তাদের সাথে যাওয়ার দাওয়াত দিলে তিনি বললেন ঃ "আমাকে এমন তরবারীর কথা বল যে তরবারী কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য সূচীত করবে।"

হাফেজ ইবনে কাছির (র) "আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে লিখেছেন যে, ফিতনার যুগে একবার হযরত সায়াদের (রা) ভ্রাতুষ্পুত্র হাশিম (রা) ইবনুল উতবা তাঁকে বললেন, আপনি যদি এখন খিলাফতের দাবী করেন তাহলে একলাখ তরবারী আপনার সমর্থনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। জবাবে তিনি বললেন, "ভ্রাতুষ্পুত্র সেই এক লাখ তরবারীর মধ্য থেকে আমি শুধু এমন একটি তরবারী চাই যা কাফেরের ওপর চালানো যাবে, কিন্তু কোন মুসলমানের ওপর চালানো যাবে না।"

হযরত সায়াদের (রা) আকীকের নির্জনত্বের জীবন দীর্ঘদিন ধরে চলার পর তাঁর ওপর বার্দ্ধক্য জেঁকে বসতে লাগলো। দেহের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল এবং দৃষ্টিশক্তিও জবাব দিয়ে বসলো। শেষে প্রকৃত স্রষ্টার ডাক এসে উপস্থিত হলো এবং ৫৫ হিজরীতে তিনি পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন। জানাযা মদীনায় আনা হলে সেখানে কান্নার রোল পড়ে গেল এবং চারদিক থেকে মানুষ

জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য ভেঙ্গে পড়লো। মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকাম উম্মুহাতুল মু'মিনীনের (রা) হুজুরার সামনে জানাযার নামায পড়ালেন এবং ইসলামের এই মহান বীরকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহীত করা হয়।

হযরত সায়াদ (রা) বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অধিক সন্তান দিয়েছিলেন। চরিতকাররা তাঁর ১৮টি পুত্র ও ১৮টি কন্যার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে সায়াদ (রা) হযরত সায়াদের (রা) হুলিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, তিনি ছিলেন খর্বাকৃতির, মাথা বড়, নাক চেপ্টা, মাংসল দেহ, ঘনচুল, হাতের আঙ্গুল মোটা ও মজবুত।

হযরত সায়াদের (রা) চরিত্রের বাগান বিভিন্ন রংয়ের ফুলে সুসজ্জিত ছিল। ইসলাম গ্রহণে অগ্রগমন, রাসূল প্রেম, কঠোর অবস্থায় ধৈর্য্যধারণ, দ্বীনের প্রতি সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ, সুন্নাতের অনুসরণ, যুহুদ ও তাকওয়া, বীরত্ব, বিনয়, ত্যাগ, দানশীলতা, সত্যকথন ও স্পষ্ট ভাষণ তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি সেই সময় দাওয়াতে হকের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন যখন এ কাজ ছিল তরবারীর ধারের ওপর চলার নামান্তর। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলের (সা) মুহাব্বাত ও আনুগত্যকে জীবনের নিত্য সঙ্গী বানিয়ে নিয়েছিলেন। সবসময় নিজের জীবনকে হুজুরের (সা) জন্য কুরবানীর উদ্দেশ্যে প্রস্তুত থাকতেন। এই গভীর ভালোবাসার বদৌলতে তিনি নবীর দরবারে বিশেষ নৈকট্য লাভ করেছিলেন। একবার হুজুর (সা) তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন "হে আল্লাহ, তার দোয়া কবুল কর এবং তার নিক্ষেপিত তীর ঠিক রাখো।"

এ মুবারক দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা, হযরত সায়াদের (রা) দোয়া কবুল করতেন। লোকজন তাঁর নিকট কল্যাণের দোয়া কামনা করতো এবং তাঁর বদদোয়াকে ভয় করতো। তিনি অসুস্থ হলে হুজুর (সা) সশরীরে তাঁর শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ নিতেন। কঠিন অবস্থায় ধৈর্য্যধারণ সাহাবীদের বিশেষ গুণ ছিল। তিনি হক পথে এমন এমন মুসিবত সহ্য করেছেন যার কথা চিন্তা করতেও মানুষ কেঁপে উঠে। যাঁরা সাবিকুনাল আউয়ালুন ছিলেন তাঁরা তো বিশেষভাবে মুশরিকদের নির্যাতনের শিকার হতেন। হযরত সায়াদও (রা) সেই পবিত্র দলের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি কয়েকবছর পর্যন্ত মক্কায় অন্যান্য মুসলমানের সাথে প্রত্যেক ধরনের মুসিবত বরদাশত করতেন। এমনকি শিবে আবি তালিবেও তিন বছর পর্যন্ত অবরোধের বিষবৎ মুসিবৎ স্বেচ্ছায় বরণ করেন। অথচ এই অবরোধ শুধুমাত্র বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের জন্য নির্ধারিত ছিল। দ্বীনের প্রতি সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধের অবস্থাটা এমন ছিল যে, ভয়াবহ

ভীতি সত্ত্বেও হক পথে সর্বপ্রথম একজন ইসলামের শত্রুকে উৎখাত করেন। এমনিভাবে আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম তীর চালিয়ে ছিলেন উতবা ইবনুল আবি ওয়াক্কাস তাঁর বড়ভাইও পৃষ্টপোষক ছিলেন। কিন্তু উতবা যখন ওহোদের যুদ্ধে হুজুরকে (সা) আহত করলো তখন তিনি তার জীবনের শত্রু হয়ে গেলেন। সুন্নাত অনুসরণের এমন ব্যবস্থা ছিল যে, প্রতিটি কাজে হুজুরের (সা) আহকাম ও পন্থা সামনে রাখতেন। তিনি বলতেন, রাসূলের (সা) পবিত্র জীবন অনুকরণ ও অনুসরণের সর্বোত্তম আদর্শ যুহুদ ও তাকওয়ার অবস্থা ছিল, সারা জীবন কখনো কোন মালদার মানুষের নিকট থেকে কোন তোহফা বা হাদিয়া গ্রহণ করেননি এবং কখনো এমন কোন লোকমা খাননি যা পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ ছিল। পরনিন্দা বা গীবত খুবই অপসন্দ করতেন এবং তার সামনে অন্য কোন মুসলমানের খারাব বর্ণনার অনুমতি দিতেন না। সবসময় লোকদেরকে হক কথা বলার পরামর্শ এবং কপটতা থেকে দূরে থাকার হেদায়াত দিতেন। নিজের সন্তানদেরকে বেশীর ভাগ সময় অল্পে তুষ্ট থাকার ওসিয়ত করতেন।

জিহাদের প্রতি উৎসাহ এবং বীরত্ব হযরত সায়াদের (রা) জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। বদর ও তার পরের ওহোদের যুদ্ধে তিনি যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং ফিদাকারী প্রদর্শন করেছিলেন তাতে সাইয়েদুল মুরসালিন (সা) প্রকাশ্য প্রশংসা করেছিলেন। পরবর্তী যুদ্ধসমূহেও তাঁর বীরত্ব ও জানবাজীর একই অবস্থা অব্যাহত ছিল। এই গুণের কারণেই ইরাক আভিযানের নেতৃত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়। কাদেসিয়ার যুদ্ধে অসুস্থতার কারণে তিনি কার্যত যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। তবুও তিনি যখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে মুজাহিদদেরকে জীবন বাজী রাখতে দেখতেন তখন আবেগে বাধ্য হয়ে বার বার এপাশ ওপাশ করতেন।

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত সায়াদের (রা) জিহাদের আবেগের কারণে লোকজন তাঁকে ফারিসুল ইসলাম বা ইসলামের অশ্বারোহী বলে ডাকতো।

হযরত সায়াদ (রা) দ্বীন ও দুনিয়া প্রত্যেক দিক থেকেই অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। কিন্তু স্বভাবে নম্রতা, বিনয়, ধৈর্য ও স্থৈর্য্যের গুণ ছিল বেশী। গরীবদের সাথে বসা এবং তাদের সাহায্য করায় আনন্দ অনুভব করতেন। কোন শ্রমিককে বোঝার নীচে দেবে যেতে দেখলে তার বোঝা উঠিয়ে মনযিলে পৌছে দিয়ে আসতেন। কাউকে পথ হারিয়ে যেতে দেখলে তাকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্য স্থলে পৌছে দিয়ে আসতেন। যদিও তিনি আকীকে একটি ভালো বাড়ী বানিয়েছিলেন। কিন্তু স্বভাবের সরলতায় কোন পরিবর্তন আসেনি। একদম

সাধারণ খাবার খেতেন এবং সাদাসিধে পোশাক পরতেন। ইবাদাত থেকে ফারেগ হয়ে নিজের পশু চরানোর জন্য জঙ্গলে নিয়ে যেতেন। আমীর থাকাকালীন অভাবগ্রস্তদের ভাতা নিজে গিয়ে বন্টন করতেন। ছোট ছোট কাজ নিজেই করতেন এবং এজন্য কোন খাদেম বা গোলামকে কষ্ট দিতেন না। দানশীলতা এবং আল্লাহর পথে খরচেও তাঁর প্রশস্ত হাত ছিল। এমন কখনো হয়নি যে, কোন ভিক্ষুক তার দরজা থেকে মাহরুম হয়ে ফিরে গেছে। গরীব মিসকিনের জন্য তাঁর ঘরের দরজা সবসময় খোলা থাকতো। মসজিদ ও মক্তব নির্মাণের জন্য প্রাণ খুলে দান করতেন। সামরিক বাহিনীর কোন সদস্য যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় শহীদ হয়ে যেতেন তাহলে নিজস্ব তহবিল থেকে সেই ঋণ আদায় করে দিতেন। তাঁর মধ্যে ত্যাগ ও পরমুখাপেক্ষীহীনতার গুণও পূর্ণরূপেই পাওয়া যেতো। হযরত ওমরের (রা) ওসিয়ত অনুযায়ী তিনিও খিলাফতের যোগ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি হযরত আবদুর রহমান (রা) ইবনুল আওফের পক্ষে নিজের দাবী পরিত্যাগ করেন। ফিতনার যুগে একবার তার পুত্র আমর (বা আমের) তাঁকে নির্জনত্ব ত্যাগ করে খিলাফতের দাবী করার উৎসাহ দিয়েছিল। তাতে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তার বুকের ওপর হাত মেরে বলেছিলেন ঃ

"আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি যে, আল্লাহ পরহেজগার, বেগরজ ও লুক্কায়িত বান্দাকে ভালোবাসেন।"

হক কথা বলার ব্যাপারে তিনি কোন বড় ব্যক্তিত্বকেও পরওয়া করতেন না। একবার আমীরে মাবিয়ার (রা) সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। গিয়ে "আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহাল মূলক" বলে সম্বোধন করলেন। তিনি বললেন, "আপনি যদি আমীরুল মু'মিনীন বলতেন তাহলে কি কোন অসুবিধা হতো ?" তিনি বললেন " আল্লাহর কসম, আপনি যে ভাবে ক্ষমতায় এসেছেন সেভাবে আমাকে দেয়া হলে আমি অবশ্যই তা গ্রহণ করা পসন্দ করতাম না।"

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) বলেন, "সায়াদের (রা) মধ্যে বীরত্ব ও নমনীয়তার সাথে সাথে কোমলতাও ছিল।" বস্তুত তিনি কাউকে কষ্টে দেখলে চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠতো। ইবাদাতের পর দোয়ার সময় চোখ মুদে যেতো। অধিকাংশ সময় অশ্রুসজল হয়ে বলতেন, "এই নশ্বর জীবন শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে, আর আমরা পার্থিব আরাম-আয়শে মশগুল হয়ে পড়েছি।"

নেতৃস্থানীয় চরিত্রকাররা হযরত সায়াদের (রা) অন্যান্য গুণাবলী ছাড়া ইবাদাতের প্রতি আগ্রহ, আল্লাহভীতি এবং ইলম ও ফজলের উল্লেখও বিশেষভাবে করেছেন। সবসময়ই তাঁর ওপর আল্লাহভীতি ছেয়ে থাকতো। খুব

বেশী রোযা রাখতেন এবং রাতের অধিকাংশ সময় আল্লাহর স্মরণে কাটাতেন। নামাযের জন্য দাঁড়ালে আল্লাহর ভয়ে দেহ কেঁপে উঠতো এবং চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত। তাহাজ্জুদের নামাযের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। অধিকাংশ সময় অর্ধেক রাতের পর মসজিদে নববীতে গিয়ে অত্যন্ত খুশু ও খুজুর সঙ্গে নামায পড়তেন। নামাযের পর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ, আমার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে সৃষ্টির সেবার তাওফিক দিন।" পবিত্র রমযান মাস এলে তাঁর খুশীর সীমা থাকতো না। এই পবিত্র মাসে রাত-দিন ইবাদাত ছাড়া আর কোন কাজ করতেন না। রাতের শেষ অংশ আল্লাহর ভয়ে এমনভাবে ক্রন্দন করতেন যে, দাড়ি মোবারক ও জায়নামায চোখের পানিতে ভিজে যেত। কুরআনে হাকিমের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণ ও মনোযোগ ছিল। তিলাওয়াতে কালামে পাকে কোন শূন্যতা আসতে দিতেন না। এমন খোশ ইলহান ও দরদভরা কণ্ঠে কুরআনে হাকিম তিলাওয়াত করতেন যেন শ্রবণকারীদের ওপর যাদুমন্ত্র প্রভাব ফেলতো। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সায়েব বলেন, একবার হযরত সায়াদ (রা) তাঁর নিকট তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, "আবদুর রহমান, আমি শুনেছি যে, তুমি খোশ ইলহানির সঙ্গে কুরআনে করীম তিলয়াত করে থাকো। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি যে, কুরআন শিক্ষা গ্রহণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এজন্য যখন তিলাওয়াত করবে তখন কাঁদবে। আর যদি কাঁদতে না পার তাহলে তোমার সুরতে যেন শিক্ষা গ্রহণের নমুনা প্রকাশ পায় এবং তা খোশ ইলহানির সঙ্গে তিলাওয়াত করবে।"

রাসূলের (সা) সাথে হযরত সায়াদের (রা) বিশেষ ঘনিষ্টতার কারণে তাঁর ইলম ও ফজলের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছিল। তিনি বছরের পর বছর ধরে নবীর (সা) জ্ঞানের প্রস্রবণ থেকে ফয়েজ লাভ করেছিলেন। তার প্রভাবেই হুজুরের (সা) ওফাতের পর তিনি জালিলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাফাককুহ ফিদ দ্বীন বা দ্বীনের সমঝে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদান করেছিলেন। তিনি ফকিহ সাহাবীদের সেই কাতারভুক্ত ছিলেন যাতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত উম্মে সালমা (রা), হযরত আনাস (রা) ইবনুল মালিক, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) এবং হযরত মুয়াজ (রা) ইবনুল জাবালের মত উম্মাহর স্তম্ভরা শামিল ছিলেন। তাঁরা অসংখ্য শাখায় জ্ঞানের মনিমুক্তায় পরিপূর্ণ ছিলেন। লোকজন মাসয়ালা জানার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তাঁর নিকট আসতো এবং তিনি সকলকে মুতমায়েন করে ফিরিয়ে দিতেন। কোন মাসয়ালা সম্পর্কে জানা না থাকলে সমসাময়িক সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে জিজ্ঞেস করে

নেয়ায় কোন লজ্জা অনুভব করতেন না। যদিও হযরত সায়াদ (রা) হাদীস বর্ণনায় খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন তবুও তিনি দু' শ' পনরটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইসলামের শাহসওয়ার হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস নিসন্দেহে ইসলামের ইতিহাসে একজন বহুবিধ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর এসব গুণাবলী অনুকরণযোগ্য। ইসলামী জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রাসূল প্রেম, ধৈর্য, অটলতা ও বীরত্বের মত গুণাবলী ছাড়াও রাজনীতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং জিহাদের নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতাও প্রদান করেছিলেন। ইসলামের যেখানে এবং যেভাবে প্রয়োজন পড়েছিল তিনি নিজের সকল যোগ্যতার নযরানা তৎক্ষণাৎ পেশ করেছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফুজ জুহরী

৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাস। এ সময় রহমতে আলমের (সা) বনু কালাবের দিকে একটি সামরিক বাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন পড়লো। এই গোত্র দাওমাতুল জুনদুলের নিকটে বসবাস করতো এবং খুব শক্তিশালী ছিল। হুজুর (সা) চেয়েছিলেন, এই অভিযানের নেতৃত্ব এমন একজনের ওপর অর্পিত হোক, যিনি তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম ও সুন্দরভাবে দিতে পারেন। আবার যুদ্ধের প্রয়োজন হলে তারও নেতৃত্ব দিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে হুজুরের (সা) নির্বাচনী দৃষ্টি নিজের এমন একজন জীবন উৎসর্গকারীর ওপর নিক্ষিপ্ত হলো, যে নবুওয়াত প্রাপ্তির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক সময়ই হক পথে জীবন উৎসর্গের বাস্তব প্রমাণ পেশ করেছে। তিনি একজন মানুষ প্রেরণ করে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই উজ্জল লাল বর্ণের এবং দীর্ঘ আকৃতির এক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হলেন। লম্বা দাড়ি এবং মাথায় কান পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি এসেই আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। এই গোলামকে কি জন্য স্মরণ করেছেন। তাকে কি কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হবে ?"

প্রিয়নবী (সা) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের সাথে সামনে বসালেন। সেই অভিযানের কথা বিস্তারিত বললেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে (তাঁর পাগড়ী খুলে) নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর মাথার ওপর কালো পাগড়ী বাঁধলেন। পাগড়ীটির চার আঙ্গুল বরাবর তাঁর পিঠের ওপর ছেড়ে দিলেন। অতপর তাঁকে সাতশ' মুজাহিদের নেতা নিয়োগ করলেন এবং পুনরায় হামদ ও ছানার পর তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য গমন কর। আল্লাহর নাফরমানদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। কিন্তু খেয়ানত করো না, কোন লাশ বিকৃত করো না। (দুশমনের লাশের ঠোঁট, কান, নাক প্রভৃতি কাটবে না) এবং শিশুদেরকে হত্যা করবে না। তোমাদের প্রতি এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং নবীর চরিত্র মনে করবে।"

তাঁরা নবীর (সা) ইরশাদের সামনে মাথা নত করলেন। সেই নির্দেশের ওপর আমল করার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং সঙ্গীদেরসহ দাওমাতুল জুন্দুলে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

রাসূলের (সা) এই সাহাবী যাঁর দস্তারবন্দী বা পাগড়ী বাঁধার কাজ স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালিন (সা) নিজের পবিত্র হাতে সম্পাদন করেছিলেন এবং যাঁকে এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন—তিনি ছিলেন হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফুজ জুহুরী।

সাইয়েদেনা আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান বিন আওফ সেই দশ জালিলুল কদর সাহাবীর (রা) অন্যতম ছিলেন যাঁদেরকে সাকিয়ে কাওছার (সা) বিশেষভাবে নাম উল্লেখ করে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং যিনি "আশারায়ে মুবাশশারাহ"র "মুহতাম বিশ শান" উপাধিতে বিখ্যাত হন। হযরত আবদুর রহমান (রা) কুরাইশের "বনু যুহরা" খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ আবদি আওফ (অথবা আবদি জাওফ) বিন আবদি বিন হারিছ বিন যুহরাহ বিন কিলাব বিন মুররাহ।

তাঁর নসব ৬ষ্ঠ পুরুষে কিলাব বিন মুররাহতে গিয়ে মহানবীর (সা) নসবনামার সঙ্গে মিলে যায়। হুজুরের (সা) মাতা হযরত আমেনাও বনু যুহরার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং তাঁর নসবনামা যুহরাহ বিন কিলাবে গিয়ে হযরত আবদুর রহমানের (রা) নসবের সাথে মিলে যায়। যুহরাহ হুজুরের (সা) প্রপিতামহ কুসাই বিন কিলাবের ভাই ছিলেন।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) মাতার নাম শিফা (রা) বিনতে আওফ (বিন আবদি বিন হারিছ বিন যুহরাহ) ছিল। কতিপয় রেওয়ায়াতে তাঁর নাম সুফিয়া, সফা এবং দাবায়য়াহও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু চরিতকারদের অধিকাংশই শিফা (রা) নামকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। হযরত শিফা (রা) স্বামী আওফ বিন আবদি আওফের চাচার কন্যা ছিলেন। তিনি সাহাবিয়া হওয়ার মর্যাদাও লাভ করেন।

বাইহাকী (র) এবং হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন, মহানবীর (সা) জন্মের সময় দাইয়ের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন হযরত শিফা (রা) বিনতে আওফ। তিনি হযরত আমেনার নিকটাত্মীয় ছিলেন।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) জন্মসাল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়াত রয়েছে। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হাতির বছরের

দশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেছেন। এইদিক থেকে তিনি হুজুরের (সা) থেকে বয়সে ১০ বছর ছোট ছিলেন। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার (র) "আল-ইসাবাতে" তাঁর বয়স সম্পর্কে যে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জন্মের সাল হাতির বছরের থেকে বারো বছর পর নির্ধারিত হয়।

সহীহ বুখারী অনুযায়ী হযরত আবদুর রহমানের (রা) জাহেলী নাম ছিল আবদি আমর। কিন্তু ইবনে সায়াদ (র), হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র), বালাজুরী (র) এবং হাফেজ জাহাবী (র) তাঁর জাহেলী নাম আবদুল কাবা বলে লিখেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "আল-ইসাবা" গ্রন্থে এবং ইমাম হাকিম (র) "মুসতাদরাকে" বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি ঈমান আনয়ন করেন তখন হুজুর (সা) তাঁর জাহেলী নাম পরিবর্তন করে আবদুর রহমান নাম রাখেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) যে পরিবেশে চোখ খুলেছিলেন তা ছিল কুফর ও শিরক এবং ফিসক-ফুজুরের পঙ্কে নিমজ্জিত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হযরত আবদুর রহমানকে (রা) সৎ স্বভাব দান করেছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" লিখেছেন যে, জাহেলী যুগে তিনি নিজের ওপর মদ হারাম করে নিয়েছিলেন।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) পিতা আওফ ছিলেন ব্যবসায়ী। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, আবদুর রহমানও (রা) একজন সফল ব্যবসায়ী হবেন। সুতরাং তিনি যুবক পুত্রকে ব্যবসা-বাণিজ্যের পদ্ধতি ও গুরু রহস্য খুব ভালোভাবেই মগজে ঢুকিয়েছিলেন এবং কতিপয় বাণিজ্যিক সফরে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণও দিয়েছিলেন। নবীর (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বের কথা, একবার তিনি ফাকাহ বিন মুগিরা [হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের চাচা] আফফান। (হযরত ওসমান গনির পিতা) হযরত ওসমান গনি (রা) এবং হযরত আবদুর রহমানকে (রা) সঙ্গে নিয়ে বাণিজ্যের জন্য ইয়েমেন গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে বনু জাযিমার লোকজন আওফ এবং ফাকাহকে হত্যা করে ফেলে। আফফান, হযরত ওসমান গনি (রা) এবং হযরত আবদুর রহমান (রা) বেঁচে গেলেন। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুর রহমান (রা) অত্যন্ত বীরত্বের সাথে দুশমনের মুকাবিলা করেন এবং নিজের পিতার হত্যাকরীকে সেখানেই শেষ করে দেন। এই রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত আবদুর রহমান প্রকৃতিগতভাবেই অত্যন্ত বাহাদুর এবং জানবাজ ছিলেন।

হযরত আবদুর রহমানের বয়স ছিল তখন ২৭ অথবা ২৩। ইসলাম-সূর্য উদিত হলো এবং হাদিয়ে বরহক (সা) রিসালাতের মানসাবে অভিষিক্ত হলেন।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) সুন্দর স্বভাব এবং পবিত্র নফস তৎক্ষণাৎ তাঁকে ইসলামের দিকে অগ্রসর করে দিল এবং তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) তাবলীগে নবুয়তের প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, ইসলাম গ্রহণকারীদের ক্রমিক নম্বরে তাঁর সংখ্যা ছিল তের। সে সময় পর্যন্ত হুজুরে আকরাম (সা) দারে আরকামে আশ্রয় গ্রহণ করেননি।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবদুর রহমানও (রা) ইসলাম অনুসারীদের মত মক্কার কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে যান। নবুয়তের পাঁচ বছর পর সারওয়ারে আলম (সা) মজলুম সাহাবীদেরকে (রা) হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। এ সময় হযরত আবদুর রহমান (রা) দশজন পুরুষ এবং চারজন মহিলার সঙ্গে হাবশা চলে গেলেন। সে সময় তাঁর দুই স্ত্রী ও কয়েকটি সন্তান ছিল। কিন্তু তিনি একা গেলেন এবং পরিবার পরিজনকে আল্লাহর ওপর ভরসা করে মক্কাতেই রেখে গেলেন। তিন-চার মাস পর হাবশার মুহাজিররা উড়ো খবর পেলেন যে, মক্কার কাফের এবং রাসূলের (সা) মধ্যে আপস হয়ে গেছে। এই খবর শুনে কতিপয় মুহাজির হাবশা থেকে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুর রহমানও (রা) শামিল ছিলেন। মক্কার নিকট পৌছে জানতে পেলেন যে, খবরটা ছিল সেরেফ গুজব। কিন্তু তখন তাঁরা ফিরে যাওয়া ঠিক মনে করলেন না এবং প্রত্যেকেই কুরাইশের কোন না কোন প্রভাবশালী সরদারের আশ্রয় নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। আল্লামা বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুর রহমান (রা) আসওয়াদ বিনইয়াগুছের আশ্রয় নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

হাবশা থেকে ফিরে এসেও হযরত আবদুর রহমান (রা) এবং অন্য মুসলমানদের শান্তির সঙ্গে থাকার ভাগ্য হলো না। কেননা, হকপন্থীদের ওপর কুরাইশ মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন ক্রমেই কঠোর হতে লাগলো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বনবী (সা) পুনরায় মুসলমানদেরকে হাবশা গমনের হেদায়াত দিলেন। সুতরাং নবুয়তের ৬ বছর পর আশিরও অধিক পুরুষ এবং আঠার-উনিশজন মহিলা এক কাফেলার আকারে হাবশার পথ ধরলেন। হযরত আবদুর রহমানও (রা) সেই কাফেলায় শামিল ছিলেন। এসব সাহাবী হাবশায় কয়েক বছর উদ্বাস্তুর জীবন কাটাতে লাগলেন। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন। হাবশার মুহাজিরদের একটি দলতো বারো বছরেরও বেশি হাবশায় অবস্থান করেছিলেন এবং খায়বারের যুদ্ধের সময় হযরত জাফর (রা) বিন আবি তালিবের সঙ্গে মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে আসেন। অবশ্য অনেক সাহাবী হুজুরের (সা) মদীনা হিজরতের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে মক্কা ফিরে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফও ছিলেন। নবুয়তের তেরতম

বছরে মহানবী (সা) নিজের জান নিছারদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন। এ সময় হযরত আবদুর রহমানও (রা) হিজরত করে মদীনা চলে যান। এভাবে তাঁর তিনবার হিজরতের মর্যাদা লাভ ঘটেছিল। মদীনায় পৌঁছে হযরত আবদুর রহমান (রা) হযরত সায়াদ (রা) বিন রবি আনসারীর মেহমান হন। কয়েক মাস পর মহানবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত আবদুর রহমানকে (রা) হযরত সায়াদ (রা) বিন রবির ইসলামী ভাই বানানো হয় এবং এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের পর হযরত সায়াদ (রা) বিন রবি ত্যাগের এমন এক মহান উদাহরণ পেশ করলেন যে, ইতিহাসে তার কোন নজির পাওয়া যায় না। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে ঃ

"আমাদের এখানে আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ এলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ও সায়াদ (রা) বিন রবি'র মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করলেন। সায়াদ (রা) ধনী মানুষ ছিলেন। তিনি আবদুর রহমানকে (রা) বললেন, সকল আনসার জানে যে, আমি খুব ধনী মানুষ। আমি নিজের সম্পদ আধা-আধি ভাগ করে দেব। আপনার এবং আমার মধ্যে এবং আমার দুই স্ত্রী রয়েছে। আপনি তাদেরকে দেখুন। যাকে পছন্দ করেন তাকে আমি তালাক দিয়ে দেব এবং সে যখন হালাল (ইদ্দত অতিক্রম করবে) হয়ে যাবে তখন আপনি তাকে নিকাহ্ করবেন।

আবদুর রহমান (রা) বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবার পরিজন ও বিত্তবৈভবে বরকত দিন। (আমার এসব বস্তুর প্রয়োজন নেই) এখানে কি কোন বাজার আছে—যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য হয়। সায়াদ (রা) বললেন, হাঁ আছে। বাজারের নাম কাইনুকা। আবদুর রহমান (রা) সকালে বাজারে গেলেন এবং ঘি ও পনির আনলেন। অতপর পরের দিন সকালেও গেলেন। সেদিন যখন ফিরলেন তখনও কিছু ঘি ও পনির অতিরিক্ত বাঁচিয়ে এনেছিলেন।"

এই রেওয়ায়াতে যেখানে হযরত সায়াদের (রা) নজিরবিহীন ত্যাগের দৃশ্য অবলোকন করা যায় সেখানে হযরত আবদুর রহমানের (রা) মুখাপেক্ষীহীনতা ও নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাসের প্রমাণও পাওয়া যায়।

হযরত আবদুর রহমান (রা) পিতার কাছ থেকে ব্যবসাকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এবং তিনি ব্যবসার পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি মদীনায় ব্যবসা শুরু করলে অল্প দিনের মধ্যেই চরম উন্নতি করলেন। ইবনে সায়াদ (র) "তাবকাত"-এ স্বয়ং তাঁর এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, "আমি যদি পাথরও উঠাতাম তাহলেও খেয়াল হতো যে তার নীচে রুপা অথবা সোনা পাবো।"

সহীহ্ বুখারীর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ব্যবসা শুরুর পর কিছু সঞ্চয় হলে তিনি একজন আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

"কয়েকদিন পর আবদুর রহমান এলেন। তখন তাঁর কাপড়ের ওপর হলুদ রংয়ের দাগ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেসা করলেন, নিকাহ করেছ ? তিনি বললেন, জ্বী হাঁ। জিজ্ঞেস করলেন, কাকে ? জবাব দিলেন, একজন আনসারী মহিলাকে। বললেন, তাকে কত মোহর দিয়েছ ? আরজ করলেন, খেজুরের বীচির পরিমাণ সোনা। ইরশাদ হলো, ওয়ালিমা করো একটি বকরী হলেও।"

বুখারীতে সেই আনসারী মহিলার নাম উল্লেখ নেই। অবশ্য অন্যান্য নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা তাঁর নাম সাহলা (রা) বিনতে আছেম বর্ণনা করেছেন। তিনি বাল্লি গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তা ছিল কাজায়া গোত্রের শাখা এবং কাজায়া সম্পর্কে ইবনে সায়াদ (র) লিখেছেন ঃ ওয়াহুম মিনাল আনসার—অর্থাৎ তারা আনসার ছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) নিজের বাণিজ্য সম্প্রসারনের কয়েকটি পন্থা বের করেন। তার মধ্যে সেই বাণিজ্য চুক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা তাঁর ও মক্কার সরদার উমাইয়া বিন খালফের মধ্যে হয়েছিল। সহীহ্ বুখারীতে স্বয়ং তাঁর থেকে রেওয়ায়াত আছে ঃ

"আমি উমাইয়া বিন খালফকে লিখিত দিলাম যে, সে আমাকে মক্কায় রক্ষা করবে এবং আমি তাকে মদীনায় রক্ষা করবো। আমি যখন আর রহমানের উল্লেখ করলাম তখন উমাইয়া বলতে লাগলো, আমি আর রহমানকে চিনি না। তুমি তোমার জাহেলিয়াতের নাম লিখ। সুতরাং আমি আমার নাম আবদি আমর লিখলাম।"

এই রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এই চুক্তি হযরত আবদুর রহমানের (রা) মদীনা আগমনের পর সম্পাদিত হয়েছিল এবং ব্যবসা প্রসঙ্গে হযরত আবদুর রহমান (রা) হিজরতের পরও মক্কা যাতায়াত করতেন। হাদীস ব্যাখ্যাকারীরা এই রেওয়ায়াত থেকে এই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যে, হযরত আবদুর রহমান লিখা পড়া জানতেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদর নামক স্থানে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবদুর রহমান (রা) তাতে খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। যুদ্ধের সময় তিনি দুশমনের ব্যূহে আপাদমস্তক ঢুকে পড়েন এবং কয়েক জন মুশরিককে আহত করা ছাড়া সায়ের বিন আবি রাফায়াকে

জাহান্নামে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সহীহ্ বুখারীতে বদরের যুদ্ধের প্রসঙ্গে স্বয়ং হযরত আবদুর রহমান (রা) থেকে দু'টি ঘটনা বর্ণিত আছে। একটি ঘটনা হলো ঃ

"বদরের দিন আমি ব্যূহে দাঁড়িয়েছিলাম। ফিরে দেখি, আমার ডাইনে ও বাঁয়ে দুই যুবক। আমি তাদের ব্যাপারে আশস্ত হতে পারলাম না। ইত্যবসরে একজন আমাকে নীচু গলায় বললো, চাচা! আবু জেহেলকে দেখিয়ে দিন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভ্রাতুষ্পুত্র কি করবে ? সে বললো, আমি আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তাকে হত্যা করবো অথবা সেই চেষ্টায় নিহত হবো। অন্যজনও আস্তে আস্তে আমাকে একই কথা বললো। অতপর আমি খুশী হলাম যে, আমি কোন্ দুই ব্যক্তির মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। আমি ইঙ্গিতে আবু জেহেলকে দেখিয়ে দিলাম। তারা দু'জন বাজ পাখীর মত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাকে মেরে ফেললো। তাঁরা দু'জন ছিলেন আফরার (রা) পুত্র।

চরিতকারদের অধিকাংশই লিখেছেন, আবু জেহেলকে গুরুতরভাবে আহতকারী যুবকদ্বয় ছিলেন হযরত মুয়াজ (রা) এবং হযরত মুয়াব্বিজ (রা)। তাঁরা উভয়েই আফরা'র পুত্র ছিলেন (আফরার তাদের মায়ের নাম ছিল। পিতার নাম ছিল হারিছ বিন রিফায়া। তাঁর সম্পর্ক ছিল আনসারের খাজরাজ গোত্রের বনু নাজ্জারের সাথে।)

দ্বিতীয় ঘটনা ছিল উমাইয়া বিন খালফের হত্যা সংশ্লিষ্ট। উমাইয়া মুশরিক বাহিনীতে শামিল হয়ে মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে এসেছিল। মুশরিকরা যখন পরাজিত হলো এবং তারা পালাতে শুরু করলো তখন উমাইয়া হযরত আবদুর রহমানকে (রা) দেখে ফেললো। বস্তুত বাণিজ্য চুক্তিতে হযরত আবদুর রহমান (রা) তাকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উমাইয়া পালাতে পালাতে তাঁকে ডেকে বললো বাঁচাও। হযরত আবদুর রহমান (রা) প্রতিশ্রুতি পালনের ধারণায় তাকে বাঁচাতে চাইলেন। এটা ভিন্ন কথা যে, তিনি তাতে সফল হননি। এই ঘটনা তাঁর মুখে এইভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

"যখন বদরের দিন এলো তখন আমি পাহাড়ের দিকে চললাম। যাতে তাকে (উমাইয়া বিন খালফ) হিফাজত করা যায়। সে সময় লোকজন শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু বেলাল (রা) তাকে (উমাইয়াকে) দেখে ফেললো। তিনি চলে গেলেন এবং আনসারদের এক সমাবেশে দাঁড়িয়ে বললেন, উমাইয়া বিন খালফ এখনো রয়ে গেছে। তাকে (আল্লাহর দুশমন) ছেড়ে দেয়ায় কোন কল্যাণ নেই। আনসারের একটি দল তাঁর সঙ্গে আমাদের পিছু নিলেন। আমি ভয় পেলাম যে,

তাঁরা আমাদেরকে পেয়ে যাবে। আমি তাকে (উমাইয়ার পুত্র) পেছনে ছেড়ে দিলাম। যাতে তাঁরা তার সঙ্গে মুকাবিলা করতে থাকে। তাঁরা তাকে হত্যা করে ফেললো। কিন্তু আমাদের পিছু নেয়া ত্যাগ করলো না। সে (উমাইয়া) ভারী বপুর মানুষ ছিল। (এজন্য দ্রুত চলতে পারতো না)। যখন তারা আমাদের নিকট পৌছলো আমি তখন তাকে বললাম বসে পড়। সে বসে পড়লো। আমি রক্ষার ধারণায় নিজেকে তার ওপর নিক্ষেপ করলাম। তারা (আনসাররা) আমার নীচ দিয়ে তরবারী চালালো এবং তাকে হত্যা করে ফেললো। আমার পায়েও তরবারীর আঘাত লাগলো।"

এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুর রহমান (রা) বদরের যুদ্ধে হাজ্জাজ ইবনুল হারিছ নামক একজন মুশরিককে কয়েদও করেছিলেন।

ওহুদের যুদ্ধেও হযরত আবদুর রহমান (রা) মাথা হাতের তালুতে রেখে যুদ্ধ করেছিলেন। ইবনে হিশাম (র) এবং হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি ওহুদের যুদ্ধে ২১টি আঘাত পেয়েছিলেন। পায়ের আঘাত এত প্রচণ্ড ছিল যে, সারা জীবন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, যুদ্ধের আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল তখন হযরত হারিছ (রা) বিন ছিম্মাহ আনসারী হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আবদুর রহমান বিন আওফকে দেখেছ? তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি পাহাড়ের দিকে কাফেরদের ভীড়ে আটকা পড়েছিলেন। আমি সেদিকে যেতে চাইলাম। কিন্তু আপনার ওপর দৃষ্টি পড়ে গেল। এজন্য এদিকে চলে এলাম। হুজুর (সা) বললেন, আবদুর রহমানকে (রা) ফেরেশতারা বাঁচাচ্ছেন। তারপর হযরত হারিছ (রা) হযরত আবদুর রহমানের (রা) নিকট গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর সামনে কাফেরদের সাতটি লাশ পড়ে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি তাদের সকলকেই হত্যা করেছেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) জবাব দিলেন ঃ ইরতাত এবং অমুক অমুককে তো আমি হত্যা করেছি। অবশিষ্ট মুশরিকের হত্যাকারী আমার নজরে আসেনি। একথা শুনে হযরত হারিছ (রা) চেঁচিয়ে উঠলেন এবং বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পূর্ণ ঠিকই বলেছিলেন। (মিয়ারে আনসার)

ওহোদের যুদ্ধের পর হযরত আবদুর রহমান (রা) খন্দকের যুদ্ধে জীবন বাজী রেখে অংশ নিয়েছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে বিশ্বনবী (সা) হযরত আবদুর রহমানকে (রা) সাতশ' মানুষ দিয়ে দাওমাতুল জান্দালের নিকটে বসবাসরত বনু কালাব গোত্রের দিকে প্রেরণ করলেন। রওয়ানার পূর্বে হুজুর

(সা) তাঁর পাগড়ী খুলে ফেললেন এবং স্বয়ং নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী বাঁধলেন এবং পেছনের দিকে চার আঙ্গুল বরাবর শামলা ছেড়ে দিয়ে বললেন, "আবদুর রহমান (রা) পাগড়ী এভাবে বেঁধো। কেননা এটা উত্তম ও পছন্দনীয় পন্থা।"

হযরত আবদুর রহমান (রা) দাওমাতুল জান্দালে পৌঁছে বনু কালাবকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। প্রথম দিন তাদের ওপর কোন প্রভাব পড়লো না। দ্বিতীয় দিনও দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা একটুও নড়লো না। তৃতীয় দিন তাঁরা তাদেরকে পুনরায় হকের প্রতি আহবান জানালেন। এবার তাদের খৃস্টান সরদার আসবাগ বিন আমর কালবীর ওপর হযরত আবদুর রহমানের (রা) দাওয়াতের বিশেষ প্রভাব পড়লো এবং তিনি ঘাড় থেকে খৃস্টানত্বের জিঞ্জির নামিয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে বনু কালাবের আরো অনেক মানুষও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিশ্বনবীকে (সা) হযরত রাফে (রা) বিন কামিতের হাতে একটি পত্র প্রেরণ করলেন। এই পত্রে তিনি আসবাগের ইসলাম গ্রহণের খবর দিলেন এবং বনু কালাবের সাথে সম্পর্ক রাখার প্রশ্নে জানতে চাইলেন। হুজুর (সা) জবাবে লিখে পাঠালেন যে, তুমি আসবাগের কন্যাকে বিয়ে কর। হযরত আবদুর রহমান (রা) হুজুরের (সা) ইরশাদ তামিলের জন্য আসবাগের (রা) কন্যা তামাজুরকে (রা) বিয়ে করলেন এবং তাঁকে রুখসত করিয়ে সঙ্গে করে মদীনা নিয়ে এলেন। হযরত আবু সালমা বিন আবদুর রহমান (রা) (হাদীসের মশহুর রাবী) হযরত তামাজুরের (রা) গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কতিপয় চরিতকার এই ধারণা পোষণ করেছেন যে, হুজুর (সা) হযরত আবদুর রহমানকে (রা) আসবাগ কন্যাকে বিয়ের পরামর্শ এজন্য দিয়েছিলেন, যাতে বনু কালাবের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক মজবুত হয়। এর পূর্বে কুরাইশ ও বনু কালাবের মধ্যে পারস্পরিক বিয়ে শাদীর সম্পর্ক ছিল না।

এক রেওয়ায়াতে এটাও এসেছে যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। এ সময় হুজুর (সা) তাঁকে দ্বিতীয় নসিহত ছাড়াও এই হেদায়াতও দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তোমাকে বিজয় দিলে (অথবা বনু কালাব ইসলামের দাওয়াত কবুল করলে) তুমি তাদের সরদার বা হাকিমের কন্যাকে বিয়ে করবে। এই রেওয়ায়াত ইবনে সায়াদ (র) "তাবকাতে" এবং ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাতে" উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রথম রেওয়ায়াত যা হাফেজ ইবনে হাজার (র) এবং মুহাদ্দিস দারে কুতনী (র) বর্ণনা করেছেন তাই কিয়াসের বেশি কাছাকাছি।

সারিয়্যায়ে দাওমাতাল জান্দালের পর হযরত আবদুর রহমান (রা) মক্কা বিজয় থেকে তাবুকের যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত সকল যুদ্ধে রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে, মক্কা বিজয়ের পর হুজুর (সা) হযরত আবদুর রহমানকে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের সঙ্গে বনু জাযিমাতে ইসলামের তাবলীগের জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

তাবুকের যুদ্ধের সময় এমন এক ঘটনা সংঘটিত হলো যে, তাতে হযরত আবদুর রহমানের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেল।

সহীহ মুসলিমে হযরত মুগিরাহ (রা) বিন শু'বা থেকে বর্ণিত আছে যে, "আমি রাসূলের (সা) সাথে তাবুকের যুদ্ধ করেছিলাম। তিনি যখন পবিত্রতার জন্য তাশরীফ নিলেন। আমি ফজরের নামাযের পূর্বে (পানির) পাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে এলাম। তিনি যখন ফিরে এলেন তখন আমি পাত্র থেকে পানি তাঁর হাতের ওপর ঢাললাম। তিনি তিনবার দু'হাত ধুলেন। অতপর মুখ ধুলেন। অতপর নিজের জুব্বা (আস্তিন) খুলতে লাগলেন। আস্তিন ছিল খুব আঁটো-সাঁটো। খুললো না। ফলে ভেতর থেকে হাত বের করলেন এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতপর মোজার ওপর মসেহ করলেন। অতপর রওয়ানা দিলেন। আমিও রওয়ানা করলাম।

লোকজন আবদুর রহমান (রা) বিন আওফকে ইমাম বানালো এবং তিনি নামায শুরু করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এক রাকায়াত পেলেন। তিনি লোকদের সাথে (বাজামায়াত) দ্বিতীয় রাকায়াত পড়লেন। আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ যখন সালাম ফিরালেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের নামায পূর্ণ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন মুসলমানরা ঘাবড়ে গেল এবং বারবার সুবহান আল্লাহ বলা শুরু করলো। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামায শেষ করলেন তখন বললেন, খুব করেছ, ঠিক করেছ। উদ্দেশ্য ছিল যে, সময়মত নামায পড়বে।"

এই প্রসঙ্গে মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়াতে এ টুকুন বেশি আছে ঃ

"মুগিরাহ (রা) বলেন, আমি আবদুর রহমানকে হটিয়ে দিতে চাইলাম, কিন্তু নবী করীম (সা) বললেন, তাঁকে থাকতে দাও।"

মুসনাদে আহমদেও এ ধরনের একটি রেওয়ায়াত আছে। সেই রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ একদিন ফজরের নামায পড়ালেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সাথে নামায পড়লেন। এই রেওয়ায়াতে এটা ব্যাখ্যা করা হয়নি যে এটা কোন সময়ের ঘটনা।

কয়েকজন চরিতকার এই ঘটনাকে হযরত আবদুর রহমানের (রা) মহান ফযীলত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরীর জিলকদ মাসের শেষে অথবা জিলহজ্জ মাসের শুরুতে বিশ্বনবী (সা) তিনশ' মুসলমানের এক কাফেলা মদীনা থেকে মক্কা মুয়াজ্জামা রওয়ানা করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এই কাফেলার আমীর এবং হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তার নকীব ছিলেন। কুরবানীর জন্য ২০টি উট ছিল কাফেলার সঙ্গে। এই কাফেলায় হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ শামিল ছিলেন। রাসূলের (সা) যামানায় এটা মুসলমানদের প্রথম হজ্জ ছিল। কুরআনে করিমে এই হজ্জকে হজ্জে আকবার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাতে হযরত আবু বকর (রা) লোকদেরকে হজ্জের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং কুরবানীর দিন দাঁড়িয়ে ইসলামের খুতবা পাঠ করেছিলেন। হযরত আলী (রা) সূরায়ে তাওবার ৪০টি আয়াত শুনিয়েছিলেন। যাতে কাফেরদের সাথে সব ধরনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার ঘোষণা ছিল। সে সময় ঘোষণা দেয়া হয় যে, এখন থেকে কোন মুশরিককে কাবা শরীফে প্রবেশের এযাজত দেয়া হবে না এবং কেউ উলঙ্গ হয়ে হজ্জ করতে পারবে না।

দশম হিজরীতে রহমতে আলম (সা) বিদায় হজ্জের জন্য মক্কা মুয়াজ্জামা তাশরীফ নেন। তখন হযরত আবদুর রহমানও (রা) তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

বিদায়হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর (একাদশ হিজরীর সফর মাসে) বিশ্বনবী (সা) রোগাক্রান্ত হলেন। তিবরানী (র) হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুরের (সা) ওফাতের কিছুদিন পূর্বে সাহাবীরা (রা) আরজ করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে মুহাজিরদের ব্যাপারে (সুন্দর আচরণের) ওসিয়ত করছি। তোমরা যদি তা না করো তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কোন নফল এবং ফরয কবুল করবেন না।

একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মহানবীর (সা) ওফাতের পর ছাকিফায়ে বনু সায়িদায় খিলাফতের বিবাদ উত্থাপিত হলো। কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী এ সময় হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ও হযরত ওমরের (রা) সঙ্গে সেখানে তাশরীফ নিয়েছিলেন এবং সেই সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে অংশ নিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিককে (রা) বাইয়াতকারীদের মধ্যে তাঁর ক্রমিক নম্বর ছিল তিন। অথবা কমপক্ষে তিনি প্রথম বাইয়াতকারীদের মধ্যে ছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার পর সর্বপ্রথম সেই অভিযান পূর্ণ করার দিকে মনোযোগ দিলেন যে অভিযানে হুজুর (সা) নিজের ওফাতের পূর্বে হযরত উসামাকে (রা) নিয়োগ করেছিলেন। ইবনে জারির তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হযরত উসামাকে (রা) বিদায় করার জন্য তাঁবুতে তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত আবদুর রহমানও (রা) সওয়ারীর সাথে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। আর হযরত আবদুর রহমান (রা) তাঁর সওয়ারীর রশি ধরে রেখেছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হযরত আবদুর রহমানকে (রা) খুব শ্রদ্ধা করতেন ও মর্যাদা প্রদান করতেন এবং তিনি অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর নিকট থেকে পরামর্শ নিতেন। এগারো হিরজীতে সিদ্দিকে আকবার (রা) হযরত আবদুর রহমানকে (রা) আমীরুল হজ্জ বানিয়ে মক্কা মুয়াজ্জামায় প্রেরণ করেন। বারো হিজরীতে আমীরুল হজ্জ কে ছিলেন ? এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। একমত অনুযায়ী সে বছরও হযরত আবদুর রহমান (রা) আমীরে হজ্জ ছিলেন। তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন, তের হিজরীতে ওফাতের পূর্বে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হযরত ওমর ফারুককে (রা) নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করতে চাইলেন। এ সময় সর্বপ্রথম এই ব্যাপারে হযরত আবদুর রহমানের (রা) সঙ্গে পরামর্শ করেন। তিনি লৌকিকতা ছাড়াই আরজ করলেন, ওমর (রা) নিসন্দেহে এই পদের যোগ্য। কিন্তু তিনি খুব কঠোর প্রকৃতির মানুষ। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেন, "আমি নরম ছিলাম বলেই সে কঠোর ছিল। যখন তার ওপর খিলাফতের দায়িত্ব পড়বে তখন খোদ বখোদ নরম হয়ে যাবেন।"

হযরত ওমর ফারুকও (রা) হযরত আবদুর রহমানকে খুব মান্য করতেন। তিনি যখন খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন তখন নিজের খিলাফতকালে আগমনকারী প্রথম হজ্জে স্বয়ং যেতে পারেননি এবং হযরত আবদুর রহমানকে (রা) আমীরে হজ্জ বানিয়ে প্রেরণ (১৩ হিজরী) করেন। তারপর তিনি হযরত আবদুর রহমানকে (রা) মজলিশে শুরার স্থায়ী সদস্য বানান। ফারুকী শাসনামলের বিভিন্ন ঘটনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) অত্যন্ত একনিষ্ঠ এবং সুষ্ঠু মতের উপদেষ্টা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিলেন।

১৪ হিজরীতে যখন ইরাকের ওপর বাকায়দা সেনা অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তখন হযরত ওমর ফারুক (রা) সকল আরব মুজাহিদকে তলব করেন। সুতরাং জিহাদের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত মুজাহিদদের এক বিরাট বাহিনী মদীনা মুনাওয়ারাতে একত্রি হয়ে গেল। সে সময় হযরত ওমর ফরুক (রা) নেতৃস্থানীয় সাহাবাদেরকে (রা) বললেন ঃ

"আমার ইচ্ছা, এই বাহিনীর সাথে আমি স্বয়ং যাবো। আমার অনুপস্থিতিতে আলী (রা) খিলাফতের কাজ করবেন। তালহা (রা), যোবায়ের (রা) এবং আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ আমার সঙ্গে থাকবেন। তালহা (রা) অগ্রবর্তী বাহিনীর অফিসার হবেন এবং ডান ও বাঁয়ের নেতৃত্ব যোবায়ের (রা) এবং আবদুর রহমান (রা) করবেন।"

সাধারণ মুজাহিদরা যখন আমীরুল মু'মিনীনের (রা) ইচ্ছার কথা জানতে পেলো তখন তারা খুব খুশী হলো। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান (রা) এ ব্যাপারে মতদ্বৈততা প্রকাশ করলেন এবং বললেন ঃ

"হে আমীরুল মু'মিনীন। আপনি এখানেই অবস্থান করুন এবং সৈন্যদেরকে পাঠিয়ে দিন। খোদা নাখাস্তা যদি আপনি যুদ্ধের ময়দানে শেষ হয়ে যান অথবা আপনার উপস্থিতিতে সৈন্যরা পরাজিত হয় তাহলে মুসলমানদের প্রচণ্ড ধাক্কা লাগবে এবং ইসলাম শেষ হয়ে যাবে। আপনার অনুপস্থিতিতে যদি কোন অসম্ভব ঘটনা ঘটে তাহলে আপনি এখান থেকে তার প্রতিকার করতে পারবেন।"

অন্য নেতৃস্থানীয় সাহাবী ও (রা) হযরত আবদুর রহমানের কথার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। তখন প্রশ্ন উঠলো যে, এই গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব কার ওপর ন্যস্ত করা যাবে। সকলেই এই ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন। এমন সময় হযরত আবদুর রহমান (রা) পুনরায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি।" হযরত ওমর ফারুক (রা) বললেন, কে ? তিনি বললেন, সায়াদ (রা) বিন মালিক (আবি ওয়াক্কাস)। আমীরুল মু'মিনীন এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সাহাবী তাঁর নির্বাচনের সাথে একমত প্রকাশ করলেন এবং হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস এই বিরাট অভিযানের নেতৃত্বে নিয়োজিত হলেন। পরবর্তী ঘটনাসমূহ প্রমাণ করেছে যে, হযরত আবদুর রহমানের (রা) রায় কত সঠিক ও সুস্থ ছিল। ওয়াকেদী (র) এবং তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় যখন রোমকদের প্রচন্ড যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর মদীনা পৌঁছলো তখন হযরত আবদুর রহমান (রা) এত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন যে, তিনি মজলিশে শুরাতে হযরত ওমরকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন! আপনি স্বয়ং সেনাপতি হোন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। আল্লাহ নাকরুন যদি আমাদের ভাইদের কোন ক্ষতি হয় তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কি।" কিন্তু অন্য নেতৃস্থানীয় সাহাবীরা (রা) তাঁর সঙ্গে একমত হলেন না এবং সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত হলো ।

নাহাওয়ান্দের মশহুর যুদ্ধে প্রথম যখন হযরত ওমর ফারুক (রা) আহলুর রায় সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন তখন তাবারীর (র) বক্তব্য অনুযায়ী হযরত আবদুর রহমান রায় দিয়েছিলেন যে, আমীরুল মু'মিনীনকে যুদ্ধের স্থানে গমন সমীচিন হবে না।

নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ ইরাকে আজমের সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ বলে বলা হয়ে থাকে। এজন্য আরবরা তাকে "ফাতুহুল ফুতুহ" নাম দিয়েছে। এই যুদ্ধে বেশুমার গনিমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হয়। গনিমতের মালের হাজার হাজার গাঁট যখন মদীনা মুনাওয়ারাতে আনা হলো তখন হযরত ওমর (রা) তা মসজিদে নববীতে রাখার নির্দেশ দিলেন এবং সেখানে বিশেষ বিশেষ সাহাবীর পাহারা মোতায়েন করলেন। তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, তাতে হযরত আবদুর রহমানও (রা) শামিল ছিলেন।

কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) জিহাদে অংশগ্রহণের নিয়তে এক-দু'বার সিরিয়া তাশরীফ নিয়েছিলেন। তাবারী লিখেছেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের পর হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং খৃস্টানদের মধ্যে জাবিয়া নামক স্থানে যে চুক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছিল তাতে স্বাক্ষী হিসেবে হযরত আবদুর রহমানও (রা) দস্তখত করেছিলেন। আমওয়াসের প্লেগের সময়ও (আঠারো হিজরী) হযরত আবদুর রহমান (রা) সিরিয়ায় ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) যখন সফর করতে করতে সুরগ নামকস্থানে পৌছলেন তখন তিনি খবর পেলেন যে, সিরিয়াতে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। হযরত ওমর (রা) সেখান থেকে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আবু ওবায়দা (রা) তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেন। এ সময় এই সমস্যার হযরত আবদুর রহমান (রা) সমাধান দিলেন। এই প্রসঙ্গে সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বর্ণিত আছে ঃ

"আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ এলেন। তিনি কিছু প্রয়োজনে কোথাও গিয়েছিলেন। বললেন, আমার নিকট এই (সমস্যার) ব্যাপারে এলেম আছে। আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন, যখন তোমরা কোন স্থানে এই প্লেগের কথা শোনো তখন সেখানে যাবে না এবং তোমরা যদি কোন স্থানে থাকো এবং সেখানে সেই মহামারীর বিস্তার লাভ ঘটে তাহলে সেখান থেকে পালিও না।"

এই পবিত্র হাদীস শুনে হযরত ওমর ফারুক (রা) বললেন ঃ "আল্লাহর শোকর! ফিরে চলো।" সুতরাং লোকদেরকে নিয়ে সেখান থেকে ফিরে গেলেন। সালেম বিন আবদুল্লাহ (রা) বলেন যে, হযরত ওমরের (রা) প্রত্যাবর্তনের কারণ ছিল শুধুমাত্র হযরত আবদুর রহমানের (রা) বর্ণিত হাদীস।

২৩ হিজরীর ২৬শে জিলহজ্জ হযরত ওমর ফারুকের (রা) ওপর হত্যামূলক হামলার ঘটনা সংঘঠিত হলো। আমীরুল মু'মিনীন (রা) ফজরের নামায পড়ানোর জন্য দাঁড়ালেন। এ সময় একজন পারসী গোলাম আবু লুলু ফিরোজ তাঁর ওপর খঞ্জর দিয়ে হামলা করে গুরুতরভাবে আহত করলো। সহীহ বুখারীতে হযরত আমর (রা) বিন মাইমুন থেকে বর্ণিত আছে ঃ

"হযরত ওমর (রা) (আহত হওয়ার পর) আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের হাত ধরলেন এবং তাঁকে (ইমামতের জন্য) সামনে অগ্রসর করিয়ে দিলেন। যাঁরা নিকটে ছিলেন তাঁরা সবকিছু দেখছিলেন। আমিও দেখছিলাম। দূরের অবশিষ্টদের কোন খবর ছিল না (যে কি হচ্ছে)। শুধু এতুটুকুন যে হযরত ওমরের (রা) ক্ষীণ আওয়াজে লোকেরা চিৎকার করছিলেন। সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ। আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ তাদেরকে সংক্ষিপ্ত নামায পড়ালেন।"

নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর হযরত আবদুর রহমান (রা) অন্যদের সঙ্গে আহত আমীরুল মু'মিনীনকে উঠিয়ে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) যখন জীবিত থাকার আর কোন আশা রইলো না তখন লোকেরা খিলাফতের পদে কাউকে মনোনয়ন দানের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। তাঁদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ফারুকে আজম (রা) এই ৬ বুজর্গের নাম পেশ করলেন ঃ

হযরত আলী (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত যোবায়ের (রা), হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ বললেন, এই ৬ ব্যক্তির মধ্য থেকে যার পক্ষে বেশী রায় পাওয়া যাবে তাকেই খলিফা নির্বাচন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) শেষ সময় পর্যন্ত তাদের সকলের ব্যাপারে খুশী ছিলেন।

আহত হওয়ার তিনদিন পর হযরত ওমর ফারুক (রা) পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন এবং ২৪ হিজরীর ১লা মুহাররম তাঁর দাফন পর্ব সমাপ্ত হয়। যেসব বুজুর্গ এই মহান ব্যক্তিকে কবরে নামিয়েছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম, হযরত ওসমান জুন্নারাইন (রা) এবং হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস ছাড়া হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফও ছিলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) ওফাতের পূর্বে এই ওসিয়তও করেছিলেন যে, খিলাফতের সমস্যা তিন দিনের মধ্যে সমাধান হওয়া উচিত। সুতরাং তাঁর দাফনের পর এই সমস্যা

নিয়ে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। প্রথম দুই দিন পর্যন্ত কোন ফায়সালা হয়নি। তৃতীয় দিন হযরত আবদুর রহমান (রা) অন্যান্য (মনোনীত) বুজুর্গকে বললেন, আপনারা খিলাফতের ব্যাপারটি তিনজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন। তাতে হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস হযরত আবদুর রহমানের (রা) পক্ষে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। হযরত যোবায়ের (রা) হযরত আলীর (রা) পক্ষে এবং হযরত আবদুর রহমান (রা) হযরত ওসমানের (রা) পক্ষে মত দিলেন। অতপর আবদুর রহমান (রা) নিজের হক পরিত্যাগের কথা ঘোষণা করলেন এবং হযরত ওসমান (রা) ও হযরত আলীকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি এই নির্বাচনের কাজটি আমার ওপর ন্যস্ত করবেন ? আল্লাহ স্বাক্ষী, আমি আপনাদের মধ্য থেকে আফজাল ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে দ্বিধা করবো না।

উভয় বুজর্গ তাঁর কথা সমর্থন করলেন। তারপর হযরত আবদুর রহমান (রা) উভয় বুজুর্গকে পৃথক পৃথক ডেকে নিয়ে তাঁদের ফজিলত, গুণাবলী ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করলেন এবং প্রত্যেকের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তাঁকে যদি খিলাফতের পদ দেয়া হয় তাহলে তিনি আদল বা ইনসাফ করবেন এবং যদি তাঁর পরিবর্তে অন্যাকে প্রদান করা হয় তাহলে তাঁর আনুগত্য করবেন। এই প্রতিশ্রুতির পর হযরত আবদুর রহমান (রা) (এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী সাধারণ সমাবেশে এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিলেন এবং পুনরায়) হযরত ওসমানকে (রা) বললেন, "হে ওসমান হাত ওঠান।" তিনি হাত বাড়ালেন। এ সময় হযরত আবদুর রহমান (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে তার বাইয়াত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকল মানুষ বাইয়াতের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এই প্রসঙ্গে হাদীসের কিতাবসমূহে ও চরিতগ্রন্থে আরো কয়েকটি বর্ণনা আছে। তার মধ্যে একটি মশহুর বর্ণনা হলো, হযরত ওসমান (রা) নির্ভাবনায় শায়খাইনের আনুগত্যের ওয়াদা করেছিলেন। এজন্য হযরত আবদুর রহমান (রা) তাঁকে হযরত আলীর (রা) ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। অনেকে এই বক্তব্যকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যাহোক, হযরত আবদুর রহমান (রা) ব্যাপারটি খুব সুন্দরভাবে সমাধান করেছিলেন এবং একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। সহীহ বুখারীর একটি রেওয়ায়াতে জানা যায় যে, খিলাফত সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত হযরত আবদুর রহমানই (রা) মুসলমানদের ইমামত করেছিলেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান (রা) জুন্নুরাইনও হযরত আবদুর রহমানের (রা) মান-মর্যাদা বহাল রেখেছিলেন এবং বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নিতেন।

সহীহ বুখারীতে আছে, চব্বিশ হিজরীতে গরমে হযরত ওসমানের (রা) নাক দিয়ে রক্ত পড়ার কারণে হজ্জে যেতে পারেননি। এ সময় তিনি হযরত আবদুর রহমানকে (রা) আমীরে হজ্জ নিয়োগ করেন। ২৯ হিজরীতে হযরত ওসমান (রা) হজ্জে গমন করেন। তখন তিনি হযরত আবদুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে যান।

হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতের প্রথম ৬ বছর অত্যন্ত নিরাপদ ও শান্তির সাথে অতিবাহিত হলো কিন্তু তারপর থেকে ফেতনা শুরু হয়ে গেল। এটা হযরত আবদুর রহমানের (রা) জীবনের শেষ অধ্যায় ছিল। তিনি চুপচাপ নির্জনত্বে কাটাতেন। শেষে সেই মুহূর্ত এসে পৌছলো। যে মুহূর্ত প্রতিটি জীবের ওপর একদিন না একদিন এসেই পৌছে। একত্রিশ অথবা বত্রিশ হিজরীতে মহানবীর (সা) সেই বুজুর্গ সাহাবী পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন। ইবনে সায়াদের (র) বক্তব্য অনুযায়ী যে সময় তাঁর বয়স ছিল ৭৫ বছর। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার (র) "আল-ইসাবা" গ্রন্থে তাঁর বয়স সে সময় ৭২ বছর ছিল বলে বর্ণনা করেছেন। ইবনে সায়াদ (র) এবং হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রা) জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়েছিল।

সাইয়েদেনা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু জানাযার পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ঃ

"আবদুর রহমান (রা) যাও, তুমি ভালো যামানা পেয়েছিলে এবং ফিতনা থেকে বেঁচে রওয়ানা দিয়েছ।"

সাইয়েদেনা হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস জানাযায় শরীক ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন "ওয়া আজবালাহ" "ওয়া আজবালাহ" (হায় আফসোস ! এই পাহাড় অর্থাৎ বিরাট ব্যক্তি দুনিয়া থেকে রওয়ানা দিয়েছে) সহীহ বুখারীর (কিতাবুল জানায়েজ) এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কতিপয় মুসলমান তাঁর কবরের ওপর তাঁবু টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) তা দেখে বললেন, এই তাঁবু উঠিয়ে নাও। তাঁর ওপর (আবদুর রহমানের) তাঁর আমল ছায়া দেবে।"

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিভিন্ন সময় বেশ কিছু সংখ্যক বিয়ে করেছিলেন (তবে এক সময়ে চার থেকে বেশি স্ত্রী কখনো ছিল না।) স্ত্রীদের নাম হলো ঃ

উম্মে কুলছুম বিনতে উতবা বিন রাবিয়া, নাম অজানা বিনতে শাইবা বিন রবিয়া, উম্মে কুলছুম (রা) বিনতে উকবা বিন আবি মুঈত, সাহলা (রা) বিনতে

আছেম ফুজাইয়া, বাহরিয়া বিনতে হানি শাইবানিয়া, উম্মে হাবিবা (রা) বিনতে জাহাশ [উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব (রা) বিনতে জাহাশের বোন ছিলেন। এই দিক থেকে হযরত আবদুর রহমান (রা) হুজুরের (সা) ভায়রা ভাই ছিলেন] সাহলা (রা) বিনতে সোহায়েল (রা), উম্মে হাকিম বিনতে কারেজ, বিনতে আবুল হোসাইন বিন রাফে' আওসিয়া, তামাজুর (রা) বিনতে আসবাগ, আসমা বিনতে সালামা, উম্মে হারিছ মাজদ বিনতে ইয়াযিদ হুমাইরিয়া, গাযাল বিনতে কিসরা, যয়নব বিনতে সাবাহ, বাদিয়া বিনতে গায়লান ছাকাফিয়া। পুত্রোদের নাম হলো ঃ

সালেম আকবার (ইসলামের আগে মারা গিয়েছিল), মুহাম্মাদ ইবরাহিম, হামিদ, ইসমাঈল, মায়ান, ওমর, যায়েদ, উরওয়া আকবার, সালেম আসগার, আবু বকর, আবদুল্লাহ, আবু সালমা আবদুল্লাহ আসগার, আবদুর রহমান, মাসয়াব, সোহায়েল, আবুল আবিয়াজ, ওসমান, উরওয়া আসগার, ইয়াহিয়া এবং বেলাল।

কন্যাদের নাম হলো ঃ উম্মুল কাসেম, হামিদা, আমাতার রাহমান, আমাতার রাহমান সোগরা, আমিনা, মারইয়াম, উম্মে ইয়াহিয়া ও জুয়াইরিয়া।

হযরত আবদুর রহমান (রা) অন্যতম ধনী সাহাবী ছিলেন। নজিরবিহীন দানশীলতা ও আল্লাহর পথে ব্যয় ছাড়াও মৃত্যুকালে তিনি স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়া এক হাজার উট, তিন হাজার বকরী এবং একশ ঘোড়া রেখে যান। এসব পশু বাকীতে চরে বেড়াতো। ইবনে সায়াদ এবং ইবনে কাছির বর্ণনা করেছেন, তাঁর চার স্ত্রী রেখে যাওয়া সম্পদের অষ্টমাংশ থেকে আশি হাজার দিনার করে পেয়েছিলেন। ওফাতের পূর্বে ৫০ হাজার দিনার এবং এক হাজার ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করেন। তাছাড়া বদরের সাহাবীদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য চারশ' দিনার করে দেয়ার ওসিয়ত করেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, সে সময় একশ' বদরী সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই আনন্দের সাথে সেই ওসিয়ত থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে স্বয়ং আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমানও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উম্মুহাতুল মু'মিনিনের (রা) জন্য একটি বাগান ওসিয়ত করেছিলেন। এই বাগান চার লাখ দিরহামে বিক্রী হয়।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) এবং অন্য কতিপয় চরিতকার হযরত আবদুর রহমানের হুলিয়া এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

দেহ লম্বা ও উঁচু, রং উজ্জ্বল, নাক উঁচু ও লম্বা, প্রশস্ত চোখ, পলক ঘন ও বড়, লম্বা দাড়ি, মাথার ওপর থেকে কানের নীচে পর্যন্ত বাবরী চুল, অত্যন্ত

সুদর্শন, বাহুতে গোশত, মজবুত হাতের কব্জী, মোটা আঙ্গুল , ওহোদের যুদ্ধে আঘাত পাওয়ার কারণে পা ছিল খোঁড়া।

ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহতে" হযরত কাবিসা বিন জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি ওমর ফারুকের (রা) নিকট গিয়েছিলাম। তাঁর ডানদিকে অন্য আর একজন বসেছিলেন। তাঁর রং ছিল আলোর মত সাদা। তিনি ছিলেন আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ।

সাইয়েদেনা হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ-এর চরিত্র ছিল বিভিন্ন গুণাবলীর সংমিশ্রণে সমৃদ্ধ। চরিতকাররা তাঁর ইলম ও ফজল, দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা, কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণ, রাসূল প্রেম, জিহাদের প্রতি উৎসাহ, আল্লাহর পথে ব্যয়, ত্যাগ, সত্যবাদিতা ও পরিচ্ছন্নতা, খোদাভীতি, প্রতিশ্রুতি পূরণ, নরম অন্তর, সঠিক রায়, ইবাদাতের প্রতি গভীর আকর্ষণ, তাকওয়া, বিনয়, আমানত, আমর বিল মারুফ বা ভালো কাজের নির্দেশ রোগীর সেবা, সাহসিকতা এবং বীরত্বের কথা ব্যাপক আকারে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ইলম ও ফজলের আন্দাজ ওয়াকেদীর এই বর্ণনা থেকে করা যায়। তাতে বলা হয়েছে যে, তিনি সেই বুজর্গদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা রাসূলের (সা) যুগে ফতওয়া দিতেন। তাঁর নিকট থেকে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীন অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত ওমর ফারুকও (রা) শামিল ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবা"তে লিখেছেন, হযরত ওমর ফারুক (রা) একবার তাঁর নিকট থেকে রেওয়ায়াত করেন। তখন তিনি তাঁর সম্পর্কে "আল-আদলুর রজী" শব্দ ব্যবহার করেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসের মধ্যে জিযিয়ায়ে মাজুস (অর্থাৎ অগ্নি উপাসকদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায়) হাদ্দে খামার (মদ্যপের দণ্ড ৮০ দুররা), মাকামে তাউন (অর্থাৎ প্লেগ আক্রান্ত স্থান থেকে পলায়ন না করার এবং সেখানে না যাওয়া) এর মত হাদীসসমূহ ফিকাহর কিতাবসমূহে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা পেয়েছে। তাঁর জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ছিল সীমাহীন। বয়স্ক ও মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রা) মত অল্প বয়স্ক সাহাবীর নিকট থেকেও তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) একটি সচ্ছল পরিবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং গৃহে সকল ধরনের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তিনি সকল পরিণাম উপেক্ষা করে সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন যে সময় এ ধরনের করাটা মুসিবত ও দুঃখ-দুর্দশাকে আহ্বান করার নামান্তর ছিল। তিনি তিনবার হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং হক পথে সব ধরনের মুসিবত বরদাশত করেছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিশ্বনবীকে (সা) গভীরভাবে ভালোবাসতেন। যুদ্ধসমূহে তিনি রাসূলের (সা) ওপর নিজের জীবনকে কুরবান করার জন্য সবসময় তাঁর সফরসঙ্গী হতেন। তেমনি যখনই সুযোগ পেতেন তখনই নবীজীর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে ফয়েজ লাভ করতেন। মুসনাদে আহমাদ, কানযুল উম্মাল, তিরমিযী এবং মুসতাদরাকে হাকিম প্রভৃতিতে স্বয়ং হযরত আবদুর রহমান (রা) থেকে বির্ণত আছে যে, আমরা রাসূলের (সা) সাহাবীদের মধ্য হতে চার অথবা পাঁচ ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতাম না। যাতে তাঁর কোন প্রয়োজন হলে তা পূরণ করতে পারি। একদিন আমি তাঁর খিদমতে হাজির হলাম। তিনি বাড়ী থেকে বের হলেন। আমি তাঁর পিছু চললাম। তিনি উঁচুস্থানে অবস্থিত একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি সিজদায় অবনত হলেন এবং এত দীর্ঘ সময় সিজদায় রলেন যে, আমি ভীত হয়ে পড়লাম। মনে করলাম সম্ভবত আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রুহ কবজ করে নিয়েছেন। একথা ধারণা হতেই আমি কাঁদতে লাগলাম। হুজুর (সা) নিজের পবিত্র মাথা উঠালেন এবং বললেন, আবদুর রহমান (রা) তোমার কি হয়েছে ? আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি দীর্ঘক্ষণ সিজদায় রয়েছেন। এতে আমি মনে করলাম যে, আপনি চিরকালের জন্য আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এজন্য আমি কাঁদছিলাম। হুজুর (সা) বললেন ঃ জিবরাইল (আ) আমাকে বললেন, আমি কি আপনাকে সুসংবাদ দেব না যে, আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি আপনার ওপর দরুদ প্রেরণ করবে, আমি তার ওপর দরুদ প্রেরণ করবো এবং যে আপনার ওপর সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার ওপর সালামত নাযিল করবো। আমার এই লম্বা সিজদা সিজদায়ে শুকর বা কৃতজ্ঞতার সিজদা ছিল।

তিনি অত্যন্ত নরম অন্তরের মানুষ ছিলেন। কখনো লৌকিকতা পূর্ণ খাবার সামনে এলে অশ্রু সজল নেত্রে বলতেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর পরিবার পরিজনের সারা জীবন যবের রুটিও মেলেনি।" সহীহ বুখারীতে আছে, একবার রোযা ছিলেন। সন্ধ্যায় খাবার সামনে এলে মুসলমানদের অতীত বুভুক্ষার কথা স্মরণ করে বললেন, মুসয়াব (রা) বিন উমায়ের নিহত হলেন। তিনি আমার থেকে উত্তম ছিলেন। তাঁকে এক চাদরের কাফন দেয়া হলো। তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যেতো। আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। হামযা (রা) নিহত হলেন। তিনিও আমার থেকে উত্তম ছিলেন। অতপর আমাদের জন্য দুনিয়া এত প্রশস্ত করে দেয়া হলো যে, আমরা ভীত হয়ে পড়লাম। আমরা ধারণা করলাম যে, আমাদের নেক আমলের প্রতিদান আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়াতেই দিয়ে না দেয়া হয়। অতপর ক্রন্দন শুরু করে দিলাম এবং খাওয়া ছেড়ে দিলাম।

নিজের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে এত সজাগ ছিলেন যে, বদরের যুদ্ধের সময় উমাইয়া বিন খালফের মত অকর্মাকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হলেন।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) সত্যবাদিতা ও ক্ষমা প্রিয়তার কথা সকলে স্বীকার করতেন। মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বলে আছে যে, একবার হযরত যোবায়ের (রা) হযরত ওসমানের (রা) আদালতে দাবী করলেন যে, আমি ওমরের (রা) পরিবারের নিকট থেকে এক টুকরো জমি ক্রয় করেছি। এই জমি ওমর (রা) ইবনুল খাত্তাবকে রাসূলুল্লাহ (সা) জাগীর হিসেবে দান করেছিলেন। কিন্তু আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ বলেন, এই জমির টুকরোয় তাঁর জমিও এসে গেছে। যা তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) ওমরের (রা) জাগীরের সাথে দান করেছিলেন। হযরত ওসমান (রা) জবাব দিলেন, আবদুর রহমান (রা) নিজের পক্ষে অথবা বিপক্ষে যে সাক্ষ্যই দেবেন তা গ্রহণ করা হবে।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) আমানত ও তাকওয়ার ওপর আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুকের (রা) এত আস্থা ছিল যে, উম্মুহাতুল মু'মিনীন (রা) যখন হজ্জের জন্য গেলেন তখন তিনি হযরত আবদুর রহমানকে (রা) তাঁদের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করলেন।

যোবায়ের বিন বকার (র)-এর উক্তি হলো, আবদুর রহমান (রা) রাসূলের (সা) স্ত্রীদের আমানতদার ছিলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" লিখেছেন, হযরত আবদুর রহমান (রা) হজ্জের সফরে আজওয়াজে মুতাহহিরাতের (রা) জন্য পর্দা ও সওয়ারীর ব্যবস্থা করতেন এবং যেখানে তাঁবু ফেলা হতো সেখানে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নামতেন।

ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ"-তে এবং ইমাম সুয়ুতি (র) "জামেয়ুস সগীরে" উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে এই রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের স্ত্রীদেরকে বলতেন, যে ব্যক্তি আমার পর তোমাদের খিদমত করবে সে হবে সত্যবাদী ও দানশীল। হে আল্লাহ ! আবদুর রহমান (রা) বিন আওফকে সালসাবিল (জান্নাতের একটি পুকুর) থেকে সতেজতা দান কর।

স্বয়ং রাসূলে আকরাম (সা) যেন ইঙ্গিত করেছিলেন যে, আমার ইন্তেকালের পর আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ আজওয়াজে মুতাহহিরাতের খিদমত করবেন এবং তিনি সত্যবাদী।

নিজের গুণাবলীর বদৌলতে হযরত আবদুর রহমান (রা) নবীর (সা) নৈকট্যলাভের মর্যাদা হাসিল করেছিলেন। কয়েকটি রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আপনি বিভিন্ন সময়ে পবিত্র বাসস্থান থেকে বাইরে যাওয়ার সময় হযরত আবদুর রহমানকে (রা) নিজের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, একবার হুযুর (সা) হযরত সায়াদ (রা) বিন উবায়দাকে শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ নেন। এ সময় হযরত আবদুর রহমানও (রা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অন্য আরেক রাওয়ায়াতে আছে, হুযুরের (সা) পুত্র হযরত ইবরাহীম (রা) যখন রোগাক্রান্ত হলেন তখন তিনি হযরত আবদুর রহমানকে (রা) সাথে নিয়ে আওয়ালীয়ে মদীনায় হযরত আবু ইউসুফের গৃহে তাশরীফ নিলেন। তাঁর স্ত্রী হযরত ইবরাহীমের (রা) দাই ছিলেন। হুজুরে আকরাম (সা) হযরত ইবরাহীমকে (রা) উঠিয়ে চুমু দিলেন। যখন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস বের হচ্ছিল তখন হুজুরের (সা) অশ্রু সজল হয়ে গেলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদছেন?"

ইরশাদ হলো, "হে ইবনে আওফ, এটা রহমাত।"

হযরত আবদুর রহমান (রা) নিজের কথায় পুনরুক্তি করলেন। এ সময় তিনি (সা) বললেন ঃ

"চোখ অশ্রু বহায় অন্তর দুঃখ ভারাক্রান্ত। কিন্তু আমরা তা-ই বলবো যা আমাদের রবের মর্জী। হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছিন্নতায় আমরা দুঃখ ভারাক্রান্ত।"

ইবনে আসাকির (র) হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত আবদুর রহমান (রা) এবং হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের মধ্যে কোন কথায় তিক্ততার সৃষ্টি হলো [হযরত খালিদ (রা) হযরত আবদুর রহমানকে (রা) কোন কঠিন কথা বলে ফেললো]। মহানবী (সা) এ খবর পেলেন। এ সময় তাঁর (সা) নিকট হযরত খালিদের (রা) কথা অসহনীয় মনে হলো [অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবদুর রহমান (রা) রাসূলের (সা) নিকট হযরত খালিদের (রা) বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন] হুজুর (সা) হযরত খালিদকে (রা) ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ

"খালিদ, তুমি আমার কোন বদরী সাহাবীকে কষ্ট দিও না। কেননা তোমাদের মধ্যে, কোন ব্যক্তি যদি ওহোদ পাহাড় সমান সোনা ব্যয় করে তাহলে তাঁদের (বদরের সাহাবীদের) অর্ধেক পর্যন্তও পৌঁছাতে পারবে না।"

এই ঘটনা ইমাম মুসলিম, হাইছামী, তিবরানী এবং কতিপয় অন্য ওলামাও বর্ণনা করেছেন। যদিও ব্যাখ্যা ও বাক্যে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে।

এই ঘটনা থেকেই হযরত আবদুর রহমানের (রা) ত্যাগের কথা আন্দাজ করা যেতে পারে। আসহাবে শুরায় ৬ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলীর (রা) সমর্থক ছিলেন এবং একজন হযরত আবদুর রহমানের (রা) নাম পেশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি খিলাফতের দাবী থেকে সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাহার করে নিলেন এবং পরিষ্কার বলে দিলেন ঃ

"আমি সেই ব্যক্তি নই যে, খিলাফতের ব্যাপারে তোমাদের সাথে ঝগড়া করবো।"

হযরত আবদুর রহমান (রা) অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ছিলেন এবং পরিস্থিতির বোধগম্যতা ও মত সকলের নিকট গ্রহণীয় ছিল। এই কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে উপদেষ্টা বানিয়েছিলেন। তার পরামর্শ অত্যন্ত সঠিক ও উম্মাতের কল্যাণের আবেগে উৎসারিত থাকতো। ইবনে জারির তাবারীর মত অনুযায়ী হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের ওফাতের পূর্বে তাঁর ব্যাপারে এই বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন ঃ

"আবদুর রহমান (রা) অত্যন্ত সঠিক মতের মানুষ। তার মত যুক্তিসঙ্গত এবং সঠিক হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে (ভুল রায় থেকে) তাঁকে হেফাজত করা হয়। (সে যদি খলিফা হয়) তাহলে তোমরা তাঁর কথা শুনবে।"

ইবাদাতের প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন আকর্ষণ। অত্যন্ত খুশু ও খুজুর সাথে নামায পড়তেন। বিশেষ করে যোহরের ফরজের পূর্বে দীর্ঘক্ষণ যাবত নফল পড়তেন। বেশী বেশী রোযা রাখতেন এবং বেশ কয়েকবার বাইতুল্লাহর হজ্জের সুযোগ লাভ করেছিলেন।

হযরত আবদুর রহমানকে (রা) আল্লাহ তায়ালা এত অধিক ধন-সম্পদ দান করেছিলেন, যা মাত্র হাতে গোণা কয়েকজন সাহাবীরই ছিল। তিনি একজন সাহসী ও সফল ব্যবসায়ী ছিলেন এবং সম্পদ তার ওপর যেন বর্ষিত হতো। মক্কা থেকে শূন্য হাতে এসেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর আনসারী ভাই হযরত সায়াদ (রা) বিন রবি নিজের অর্ধেক সম্পদ পেশ করলেন তখন তিনি তা গ্রহণে ক্ষমা চাইলেন এবং দোয়া করতে করতে বাজারের রাস্তা দেখিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর প্রতি আবেদন জানালেন। তারপর তাঁর নিজস্ব ব্যবসার এতো উন্নতি হয়েছিল যে, তার বাণিজ্যিক পণ্য শত শত উটের ওপর বোঝাই হয়ে

বাইরে যেতো এবং তেমনিভাবে বাইরে থেকে আসতো। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, ব্যবসা ছাড়া তিনি ব্যাপকভাবে কৃষিকাজও করতেন। হুজুর (সা) তাঁকে খায়বারে এক বিরাট জায়গীর দান করেছিলেন। এছাড়াও তিনি নিজেও অনেক জমি ক্রয় করেছিলেন। জুরুফে তাঁর মালিকানায় জমিতে ২০টি উট পানি সেচের কাজ করতো। হযরত আবদুর রহমান (রা) ধন-সম্পদের দিক দিয়েই ধনী ছিলেন না বরং অন্তরেরও ঐশ্বর্যশালী ছিলেন এবং নিজের সম্পদকে নির্দ্বিধায় ব্যয় করতেন। তাঁর আল্লাহর পথে ব্যয় এবং দানশীলতার অসংখ্য ঘটনা চরিতগ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে। তা পাঠ করে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কেমন প্রশস্ত হাত ও কেমন কল্যাণের আবেগ দান করেছিলেন।

ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহতে" লিখেছেন যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) দুইবার ৪০ হাজার করে দিনার আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করেন। জিহাদের জন্য পাঁচশ' ঘোড়া এবং পাঁচশ' উট উপস্থিত করেছিলেন। সূরায়ে তাওবা নাযিলের সময় চার হাজার দিরহাম পেশ করেন। মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত উম্মে বকর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ নিজের একটি জমি ৪০ হাজার দিনারে বিক্রয় করেন এবং এই সমুদয় অর্থ বনি যুহরার ফকির, অভাবী ব্যক্তি এবং উম্মুহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে বন্টন করে দেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশার (রা) নিকট যখন অংশ পৌছলো তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই অর্থ কে পাঠিয়েছে? তাঁকে বলা হলো, আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ জমি বিক্রয় করেছেন এবং সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ বন্টন করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, আমার পর তোমাদের ওপর ভালো লোক ছাড়া আর কেউ মেহেরবানী করবে না। আল্লাহ পাক ইবনে আওফকে (রা) জান্নাতের সালসাবিল থেকে সজিবতা দান করুন।

মুসনাদে আহমাদ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রা) সিদ্দিকা নিজের ঘরে ছিলেন। তিনি চেঁচামেচি শুনলেন। জিজ্ঞেস করলেন, চেঁচামেচি কিসের। লোকেরা বললো, আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের বাণিজ্যিক পণ্যের কাফেলা সিরিয়া থেকে এসেছে। তাতে সব ধরনের সামান রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আমি হুজুর (সা) থেকে শুনেছিলাম যে, আবদুর রহমান (রা) হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। হযরত আবদুর রহমানের (রা) নিকট হযরত আয়েশার (রা) কথা পৌছলো। তখন তিনি সমগ্র বাণিজ্যিক কাফেলা (শুধু পণ্যই নয় বরং উট ও তার পালান পর্যন্ত) আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিলেন।

ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত আবদুর রহমান (রা) একটি সম্পত্তি (বনি নজিরের) ৪০ হাজার দিনারে কিদামাহ'র নিকট বিক্রি করলেন এবং এর সকল অর্থ আজওয়াজে মুতাহহিরাতের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। অন্য আরেক সময়ে আরেকটি জমি ৪০ হাজার দিনারে হযরত ওসমানের (রা) নিকট বিক্রি করেন এবং তাও আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেন।

ইমাম হাকিম (র) ও হাফেজ আবু নঈম (র) বলেন, হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ (নিজের জীবনে) ত্রিশ হাজার দাস ও দাসী আজাদ করেছিলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি একদিনেই ত্রিশটি করে গোলাম আযাদ করতেন।

বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে মোটা অংকের অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করা ছাড়াও তিনি সাধারণ দান খয়রাতের ধারা সবসময় অব্যাহত রাখতেন। ওফাতের পূর্বে তিনি যে ওসিয়ত করেছিলেন তার বিস্তারিত ওপরে আলোচিত হয়েছে।

সম্পদের আধিক্য গাফলতের কারণ না হয়ে হযরত আবদুর রহমানের (রা) জন্য আল্লাহভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আল্লাহর পথে অন্তর খুলে খরচ করা সত্ত্বেও তিনি সবসময় চিন্তান্বিত থাকতেন যে, এই বিত্ত বৈভব পরকালে ক্ষতির কোন কারণ না হয়ে বসে। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) “ইসতিয়াব” গ্রন্থে লিখেছেন, একবার তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমার (রা) খিদমতে আরজ করলেন, উম্মুল মু'মিনীন আমার আশংকা হয় যে সম্পদের আধিক্য (আখিরাতে) আমাকে ধ্বংস করে না ফেলে। তিনি বললেন, পুত্র, নিজের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় অব্যাহত রাখো।

সংক্ষিপ্ত কথা হলো, সাইয়েদেনা হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের জীবনের প্রতিটি দিকেই এমন উদাহরণ তুল্য ব্যক্তিত্ব বলে প্রমাণিত হবে যে, মিল্লাতে ইসলামিয়া তাঁর ওপর গৌরব করতে পারে এবং তাঁর পদাংক অনুসরণ করে কল্যাণ ও সাফল্যের মনযিলে পৌছতে পারে।

হযরত তালহাতাল খায়ের (রা)

দোজাহানের রহমত (সা) একদিন নিজের কতিপয় সাহাবীর (রা) মধ্যে বসেছিলেন। এমন সময় একজন গ্রামের মানুষ এসে উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! কুরআনে করিমের

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُ واللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ -

"ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক আছে যাঁরা আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ স্বীয় মানত পূর্ণ করেছেন আর কেউ সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছেন।"—এই আয়াত কাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ? –আহযাব ঃ ২৩

রহমতে আলম (সা) গ্রাম্য লোকটির প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না। তিনি নিজের প্রশ্নের পুনরুক্তি করলেন। কিন্তু হুজুর (সা) পুনরায়ও চুপ মেরে রইলেন। ইত্যবসরে মাঝামাঝি আকৃতির সুঠামদেহী ও উজ্জল লাল রংয়ের একজন সুদর্শন মানুষ রাসূলের (সা) দরবারে এসে উপস্থিত হলেন। হুজুর (সা) তৎক্ষণাৎ প্রশ্নকারীর প্রতি মনোযোগী হলেন এবং বললেন ঃ

"এই হলো সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে এই আয়াত প্রযোজ্য (অথবা তিনি সেই সকল মানুষের একজন, যাদের শানে এই আয়াত নাযিল হয়েছে।)"

এই সাহাবী যিনি এই মহান মর্যাদা লাভ করেছিলেন। স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালিন ফখরে মওজুদাত (সা) তাঁকে উল্লিখিত আয়াতের স্বাক্ষী মেনেছেন। তিনি ছিলেন, হযরত তালহা (রা) বিন উবায়দুল্লাহ।

সাইয়েদেনা আবু মুহাম্মদ তালহা (রা) বিন উবায়দুল্লাহ মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি সেই দশ সাহাবীর (আশারায়ে মুবাশশিরাহ) অন্যতম যাঁদেরকে সাকিয়ে কাওছার (সা) নাম উল্লেখপূর্বক জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। হযরত তালহার (রা) সম্পর্ক ছিল কুরাইশের বনু তাইম খান্দানের সঙ্গে। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

তালহা (রা) বিন উবায়দুল্লাহ বিন ওসমান বিন আমর বিন কা'ব বিন সায়াদ বিন তাইম বিন মুররাহ বিন কা'ব বিন লুব্বী।

মুররা বিন কা'বে গিয়ে তাঁর নসবনামা রাসূলে আকরামের (সা) নসবের সঙ্গে মিলে যায় এবং আমর বিন কা'বে গিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) সঙ্গে মিলে যায়। হযরত তালহার (রা) দাদা ওসমান বিন আমর এবং হযরত আবু বকরের (রা) দাদা আমের বিন আমরের সহোদর ছিলেন।

হযরত তালহার (রা) পিতা উবায়দুল্লাহ ইসলামের যুগ পাননি। অবশ্য তার মাতা সা'বা (রা) (বিনতে আবদুল্লাহ হাজরামী বিন জামাদ বিন সালমা বিন কাবার) দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং মহিলা সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মশহুর সাহাবী হযরত আলা (রা) ইবনুল হাজরামী ছিলেন তাঁর ভাই এবং হযরত তালহার (রা) মামা।

বিশ্বনবীর (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রায় চৌদ্দ-পনেরো বছর পূর্বে হযরত তালহা (রা) জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালেই বাণিজ্য পেশা গ্রহণ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অত্যন্ত সৎ স্বভাব দান করেছিলেন। প্রিয়নবী (সা) দাওয়াতে হক শুরু করলেন। সেই ডাকে প্রথম যে কয়জন নেক স্বভাবের সাহাবী সাড়া দিয়েছিলেন তার মধ্যে হযরত তালহাও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এক রাওয়ায়াতে আছে যে, তিনি সেই আট সাহাবীর একজন যারা সর্বপ্রথম ঈমানের নিয়ামতে নিজেদেরকে পূর্ণ করেছিলেন। যদিও কিছু সংখ্যক আলেম এই রেওয়ায়াত মানতে চিন্তা করেছেন, কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তিনি নবীর (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং তাতে তাঁর সমগোত্রীয় বুজুর্গ হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) তাবলীগ ও তালকিন প্রভুতভাবে কার্যকর ছিল। হযরত তালহার (রা) ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে ইবনে সায়াদ (র) ইমাম হাকিম (র) এবং ইবনে আছির (র) একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা স্বয়ং হযরত তালহার (রা) যবানীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে, আমি (নবীর নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে) বসরা (সিরিয়া) গিয়েছিলাম। সেখানে এক ইবাদাত খানায় একজন পাদরী দেখতে পেলাম। সেই পাদরী লোকদেরকে জিজ্ঞেস করছিল যে, আজ কাল মক্কা থেকে কোন লোক এসেছে কিনা। আমি বললাম হাঁ আমি সেখান থেকেই আসছি। পাদরী জিজ্ঞেস করলো যে, আহমদ নবী (সা) প্রকাশ পেয়েছেন কি? আমি বললাম, কোন্ আহমাদ (সা)? পাদরী বললো, আহমাদ (সা) বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব। এটাই তাঁর প্রকাশ কাল। তিনিই দুনিয়ার শেষনবী। তুমি ফিরে গিয়ে কাল বিলম্ব না করে তাঁর বাইয়াত করে নিবে। আমি বসরা থেকে মক্কা ফিরে এলাম এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার অনুপস্থিতিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে কি? লোকেরা বললো, মুহাম্মাদ (সা) বিন আবদুল্লাহ নবুয়ত দাবী

করেছেন এবং ইবনে আবি কুহাফা (হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)) তাঁর আনুগত্য কবুল করেছেন। আমি একথা শুনে আবু বকরের (রা) নিকট এলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি মুহাম্মাদের (সা) আনুগত্য কবুল করে নিয়েছেন ? তিনি বললেন, হাঁ, তিনি হকের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। তুমিও এই দাওয়াত কবুল করে নাও। তারপর আমি পাদরীর নিকট থেকে যা কিছু শুনেছিলাম তা তাঁকে বর্ণনা করলাম। তিনি খুব খুশী হলেন এবং আমাকে সাথে নিয়ে রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। আমি তাঁর নিকট দরখাস্ত করলাম যে, আমাকেও আপনার দ্বীনে দাখিল করিয়ে নিন। তিনি আমার দরখাস্ত কবুল করলেন এবং আমি ঈমানের নিয়ামতে পূর্ণ হয়ে গেলাম।

চরিত গ্রন্থসমূহের অসংখ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইসলাম গ্রহণের পর অন্য তাওহীদপন্থীর মত হযরত তালহাকেও (রা) মক্কার কাফেরদের জুলুম নির্যাতনের শিকার হতে হয়। মা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনিও পুত্রের ইসলাম গ্রহণে খুব গোস্বা হলেন। ইমাম বুখারী (র) "তারিখুস সগীরে" হযরত মাসউদ (রা) বিন খারাশের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, "আমরা সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে চক্কর দিচ্ছিলাম। আমরা দেখলাম যে অনেক মানুষ একজন যুবককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? লোকেরা বললো, তালহা (রা) বিন উবায়েদ উল্লাহ্ বেদ্বীন হয়ে গেছে। একজন মহিলা সেই যুবকের পিছনে পিছনে শাপ শাপান্ত করতে করতে যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম এই মহিলা কে? লোকেরা বললো, মহিলাটি তার মা সা'বা বিনতে হাজরামী।

হাফেজ ইবনে কাছির (র) "আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে লিখেছেন, নওফিল বিন খুয়ায়েলদ আদবিয়া ছিল শেরে কুরাইশ লকবে মশহুর। হযরত তালহার (রা) ইসলাম গ্রহণে প্রচন্ড ক্রোধান্বিত হলো। সে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং হযরত তালহাকে (রা) ধরে একই রশিতে বাধলো। এজন্য এই দুই ব্যক্তিকে কারিনাইন বা সঙ্গী বলা হয়। ইমাম বাইহাকী লিখেছেন যে, হুজুর (সা) তাঁদের নির্যাতিত হওয়ার খবর পেলেন। এসময় তিনি দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আমাদেরকে ইবনে আদবিয়ার অপকর্ম থেকে রক্ষা কর।"

ইবনে আছির (র) ও ইমাম হাকিম (র) বলেন, হযরত তালহার (রা) ইসলাম গ্রহণের কথা যখন তাঁর চাচা ও বড় ভাই (ওসমান বিন উবায়েদুল্লাহ) জানতে পেল তখন তারা হযরত তালহা (রা) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) উভয়কে রশি দিয়ে বেঁধে খুব করে পেটালো। যাতে এই কঠোরতায় তারা

ইসলাম ত্যাগ করে। কিন্তু হায়! তাঁদের ধৈর্য ছিল পাহাড়ের মত। এই নির্যাতনে তাঁরা সামান্য মাত্রও টললেন না।

(উসুদুল গাব্বাহ–মুসতাদরাকে হাকিম)

এক বর্ণনায় আছে যে, মহানবী (সা) মক্কায় হযরত তালহার (রা) ভাই বানিয়েছিলেন নিজের ফুফাতো ভাই হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের সঙ্গে।

কাফেরদের সকল অস্ত্রই যখন হযরত তালহাকে (রা) দ্বীনে হক থেকে হটাতে ব্যর্থ হলো তখন তারা তাঁকে নিজের ওপর ছেড়ে দিলো এবং তিনি পূর্বের মত নিজের ব্যবসার কাজে মশগুল হয়ে গেলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, যে সময় রহমতে আলম (সা) মক্কা থেকে হিজরত করেন সে সময় হযরত তালহা (রা) নিজের ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া গিয়েছিলেন। এদিকে হুজুর (সা) মক্কা থেকে মদীনা রওয়ানা হলেন। ওদিকে হযরত তালহা (রা) নিজের বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়া থেকে মক্কা রওয়ানা হলেন। মদীনা পৌছে সেখানকার লোকদেরকে অস্থিরচিত্তে হুজুরের (সা) ইনতিজার করতে দেখলেন। সেখান থেকে মক্কা রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে বিশ্বনবী (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে সাক্ষাত হয়ে গেল। তাঁরা প্রিয়নবী (সা) ও হযরত আবু বকরের (রা) খিদমতে কিছু সিরীয় কাপড় পেশ করলেন এবং মদীনাবাসীর অস্থির চিত্তে অপেক্ষার কথা বললেন। অতপর নিজের কাফেলার সঙ্গে মক্কা চলে গেলেন। ঠিক একই ধরনের বর্ণনা সহীহ বুখারীতে হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের ব্যাপারেও পাওয়া যায়। তিনিও ব্যবসায়ী মুসলমানদের এক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া থেকে ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে বিশ্বনবীর (সা) সাথে সাক্ষাত হলো এবং তিনি হুজুর (সা) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) খিদমতে কিছু সাদা কাপড় তোহাফা হিসেবে পেশ করেন। এটা একই ঘটনা, না দু'টি পৃথক ঘটনা তা জানা যায়নি (এটাও হতে পারে যে, হযরত তালহা (রা) এবং হযরত যোবায়ের (রা) উভয়ই একই বাণিজ্যিক কাফেলাতে ছিলেন। আবার এটাও হতে পারে যে, দু'জন ভিন্ন কাফেলাতে ছিলেন)।

মক্কা ফিরে এসে হযরত তালহা (রা) ব্যবসার পাটচুকিয়ে ফেললেন এবং কিছু দিন পরই নিজের মা সা'বা (রা) বিনতে আল হাজরামীকে সঙ্গে নিয়ে (তিনি সে সময় ঈমানের নিয়ামতেপূর্ণ হয়েছিলেন) মদীনা হিজরত করেন। মদীনা মুনাওয়ারাতে সাইয়েদেনা হযরত আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ আনসারী তাঁকে নিজের মেহমান বানান। কয়েক মাসপর প্রিয়নবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেন। তখন হযরত তালহাকে (রা) হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব আনসারীর ইসলামী ভাই বানান।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ "বদরের যুদ্ধ" সংঘটিত হয়। সহীহ জামেতে বদরের সাহাবীদের যে তালিকা দেয়া হয়েছে তাতে হযরত তালহার (রা) নাম নেই। চরিতকাররা এই প্রসঙ্গে দু'টি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, সে সময় তিনি ব্যবসায়িক উদ্দেশে সিরিয়া গিয়ে থাকবেন। আবার অন্যরা লিখেছেন, প্রিয়নবী (সা) তাঁকে একা অথবা হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদের সাথে মুশরিকদের খবর আনার জন্য সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও হুজুর (সা) গনিমতের মালে তাঁর অংশও দিয়েছিলেন এবং এও বলেছিলেন, তুমি জিহাদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে না। উভয় ধরনের বর্ণনায় একটি কথা অবশ্য পাওয়া যায়। তাহলো, অন্য মুজাহিদের মত হযরত তালহাও (রা) বদরের গনিমতের মালের অংশ পেয়েছিলেন। যেন তিনি কোন না কোনভাবে যুদ্ধে শরীক ছিলেন। কেননা গনিমতের মালের হকদার তাকেই মনে করা হতো যে কোন না কোন উপায়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। দুশমনের সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি যুদ্ধেরই অংশ হয়ে থাকে। এজন্য তাঁকেও যুদ্ধে শরীক মনে করা হয়েছে। তিনি যদি বাণিজ্য ব্যাপদেশে সিরয়া গিয়ে থাকতেন তাহলে গনিমতের মালের হকদার হতেন না। সে জন্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তাঁর সিরিয়া গমনের বর্ণনাটা সন্দেহযুক্ত।

তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। হযরত তালহা (রা) এই যুদ্ধে খুব উৎসাহ -উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। তাতে তিনি মহানবীর (সা) হিফাজতের জন্য নিজের জীবন বাজী লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এই যুদ্ধের হিরো হিসেবে পরিগণিত হন। যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে মুসলমানরা কাফেরদেরকে পরাজিত করেছিলেন। অতপর গনিমতের মাল একত্রিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। দূর্ভাগ্যবশত সুড়ঙ্গ পথে নিয়োজিত তীরান্দাজদেরও অধিকাংশই নিজের স্থান পরিত্যাগ করে এবং গনিমতের মাল গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় কাফেরদের এক ঘোর সওয়ার দল পাহাড় চক্কর মেরে সেই সুড়ঙ্গ পথে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো এবং তাদের ব্যূহ তছনছ করে ফেললো। উপরন্তু বিশ্বনবীর (সা) শাহাদাতের খবরের মত দূর্ভাগ্যজনক গুজবও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাতে অনেক মুসলমানের অন্তরে খটকা লেগেছিল। ওদিকে হুজুর (সা) যুদ্ধের ময়দানে পাহাড়ের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রলেন এবং কিছু মুহাজির ও আনসার যারা তাঁর নিকটে ছিলেন, তাঁরা সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে প্রত্যেক দিক থেকে তাঁকে (সা) কাফেরদের হামলা থেকে রক্ষা করছিলেন। হযরত তালহাও (রা) সেই জানবাজদের মধ্যে ছিলেন। কাফেররা বারবার রাসূলের (সা) ওপর হামলা করছিল। কিন্তু

রিসালাত প্রদীপের এইসব পতঙ্গ জীবনের বাজী লাগিয়ে তাদেরকে পিছনে হটিয়ে দিতেন অথবা সেই চেষ্টায় নিজের জীবন কুরবান করে দিতেন। তিন-চারবার এমন অবস্থা হলো যে, কাফেররা হুজুরের (সা) ওপর হামলা করলো। এসময় তিনি বললেন, কেউকি আছে যে তাদের বাধা দেবে ? হযরত তালহা (রা) প্রত্যেকবারই সামনে অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির আছি। কিন্তু অন্য কতিপয় জানবাজ অগ্রসর হয়ে নিজের আকা ও মাওলাকে (সা) মুশরিকদের তরবারীর আঘাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছিলেন। অতপর এমন এক সময় এলো, যখন জানবাজ সাহাবী ও হুজুরের (সা) মধ্যে কাফেররা এসে দন্ডায়মান হলো এবং শুধুমাত্র হযরত তালহা (রা) তাঁর (সা) নিকটে ছিলেন। হুজুরকে (সা) খুব ভীতিকর অবস্থায় দেখে হযরত তালহা (রা) তাঁর ওপর পতঙ্গের মত গিয়ে দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করলেন। দেহ ও জীবন তাঁর সকল মুহাব্বাত ঈমানী মুহাব্বাতে পরিবর্তিত হলো এবং তিনি ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে প্রত্যেক দিক থেকে আঘাত তীর, বর্শা, তরবারী এবং পাথর নিজের দেহ দিয়ে বাধা দিতে লাগলেন। তাঁর দেহে ক্ষতের ওপর ক্ষত সৃষ্টি হতে লাগলো। কিন্তু হুজুরের (সা) সামনে থেকে হটে যাওয়ার কল্পনাও তাঁর অন্তরে স্থান পায়নি। বাস্তবতঃ তিনি ওহীর ধারককে (সা) বাঁচানোর জন্য নিজের সমগ্র দেহকে কিমা বানিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলেন। তিনি রক্তে গোসল করে ফেলেছিলেন এবং কুড়িটির মত যখম তাঁর দেহকে ঝাঁঝরা করে ফেলেছিল। কিন্তু সাইয়েদুল মুরসালিনের (সা) জন্য জীবন কুরবান করার তড়পানি তাঁকে এমন শক্তি দিয়েছিল যা তাঁকে পড়ে যেতে দেয়নি। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী সে সময় তাঁর মুখ দিয়ে একটি যুদ্ধ গাথা উচ্চারিত হয়েছিল।

ইত্যবসরে একজন মুশরিক হুজুরের (সা) নিকট পৌছে তরবারী দিয়ে আঘাত হানলো। হযরত তালহা (রা) সেই আঘাত নিজের হাত দিয়ে ঠেকালেন। তাঁর আঙ্গুলগুলো শহীদ হয়ে গেল (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী দুই আঙ্গুলের ধমনী কেটে গেল।) সেই মুহূর্তে হুজুর (সা) একদিকে সরে দাঁড়ালেন এবং আঘাত থেকে মাহফুজ হয়ে গেলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) বর্ণনা করেছেন, এ সময় হযরত তালহার (রা) যবান দিয়ে আহ! শব্দ বেরিয়ে গেল। এর বিপরীত ইবনে সায়াদ (র) লিখেছেন, সে সময় তাঁর মুখ দিয়ে খুব হয়েছে শব্দ বের হয়েছিল। তাতে হুজুর (সা) বলেছিলেন যে, তুমি যদি এই শব্দের পরিবর্তে বিসমিল্লাহ বলতে তাহলে তোমাকে ফেরেশতারা উঠিয়ে নিতেন এবং সবার সামনে তোমাকে আসমানের ওপর নিয়ে যেতেন।

মোটকথা, হযরত তালহা মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে একাগ্রতার সাথে পাগলের মত মহানবীকে (সা) হেফাজতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ইত্যবসরে অন্য কতিপয় জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীও তাঁর সাহায্যের জন্য এসে উপস্থিত হলেন এবং সকলে মিলে মুশরিকদেরকে হটিয়ে দিলেন। হযরত তালহা (রা) যদিও আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর হিম্মত ছিল তরতাজা। জামে' তিরমিযীতে আছে যে, হুজুর (সা) পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পবিত্র দেহের ওপর দু'টি যিরাহ ছিল (এবং তিনি আহতও ছিলেন)। এজন্য পাহাড়ে উঠায় কষ্ট মনে হচ্ছিল। হযরত তালহা (রা) (নিজের আঘাতের কথা ভুলে গিয়ে) সামনে অগ্রসর হলেন এবং হুজুরকে (সা) নিজের পিঠের ওপর বসিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলেন। এসময় রাসূলের (সা) জবান দিয়ে উচ্চারিত হলো, তালহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ফতহুল বারি"তে লিখেছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হযরত তালহার (রা) দেহে ৭০-এর বেশী ক্ষত বা আঘাত গণনা করেছিলেন।

কতিপয় রেওয়ায়াতে তাঁর আঘাতের বিস্তারিতও দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে, শুধু হাতেই ২৪টি আঘাত লেগেছিল এবং তা চিরকালের জন্য অবশ হয়ে গিয়েছিল। সারা শরীরে তরবারী, বর্শা এবং তীরের ৭৫টি আঘাত লেগেছিল। তারবারীর এক কোপে মাথাও গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল।

সহীহ বুখারীতে (কিতাবুল মাগাজিতে) কায়েস বিন আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত আছে, "আমি তালহার হাত দেখেছিলাম, যা অবশ হয়ে গিয়েছিল। এই হাত দিয়ে তিনি ওহোদের যুদ্ধে নবী করিমকে (সা) রক্ষা করেছিলেন।"

হযরত তালহা (রা) ওহোদের যুদ্ধে যে নজীরবিহীন ঈমানী জোশ, বীরত্ব ও ফিদাকারী প্রদর্শন করেন তার বিনিময়ে তাকে রিসালাতের দরবার থেকে "খায়ের " -এর মহান উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। রহমতে দারাইন (সা) তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন ঃ "এ তালহা নয়, এ হলো খায়ের।"

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, সে সময় রহমতে আলমের (সা) ইঙ্গিতে হযরত হাসসান (রা) বিন ছাবিত এই কবিতা বলেছিলেন, "এবং তালহা (রা) ওহোদের দিন মুহাম্মদকে (সা) হেফাজত করেছিলেন, এমন সময় যখন তাঁর (সা) জন্য হয়ে গিয়েছিল সবকিছু সংকুচিত ও কঠিন।

তিনি বাহু দিয়ে বর্শার সাহায্যে তাঁকে (সা) রক্ষা করেছিলেন এবং তিনি নিজের আঙ্গুল তারবারীর নীচে দিয়েছিলেন যা অবশ হয়ে গিয়েছিল।"

হযরত তালহা (রা) ওহোদের দিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রতিশ্রুতি পূরণের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করান তা তাঁকে অন্য সকল সাহাবীর (রা) নিকট অত্যন্ত প্রিয় ও মর্যাদাপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছিল এবং তারা তাঁর ওপর ঈর্ষা করতো। সাইয়েদেনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বলতেন ঃ

"ওহোদের দিন, ওহোদের দিন ছিল না। সত্য বলতে কি সেটা ছিল তালহার (রা) দিন।"

সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে দেখে বলতেন ঃ

" হে তালহা, হে ওহোদওয়ালা, হে সাহেবে ওহোদ!"

ওহোদের যুদ্ধে হযরত তালহা (রা) যে মহান সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তার শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে নিজেও কখনো কখনো তার উল্লেখ করতেন। সহীহ বুখারীতে (কিতাবুল মাগাযি বাবে গুযওয়ায়ে ওহোদ) তাঁর থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। এই হাদিসে তিনি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন।

ওহোদের যুদ্ধের পর রাসূলের (সা) যুগে সংঘটিত সকল যুদ্ধেই হযরত তালহা (রা) মহানবীর সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই জীবন বাজী রাখার নৈপুন্যতা দেখিয়েছেন। তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানেও উপস্থিত ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধে যখন বনু হাওয়াযিনের অসংখ্য তীরান্দাজীতে অধিকাংশ মুসলমানের পা টলটলায়মান হয়ে গিয়েছিল তখন তিনি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে অটল ছিলেন। ইত্যবসরে দুশমনরা পরাজিত হয়ে গেল। তাবুকের যুদ্ধের (নবম হিজরী) সময় তিনি যুদ্ধ ব্যয় নির্বাহের জন্য বিরাট অংক দান করেছিলেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, সে সময় মহানবী (সা) তাঁকে "ফাইয়াজ" বা দানবীর উপাধিতে বিভূষিত করেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি নবীর (সা) অন্যান্য যুদ্ধে ব্যয় নির্বাহের জন্যও বহু পরিমাণ অর্থ দিয়েছিলেন। এক যুদ্ধে তিনি সাধারণ মুসলমানের খাওয়ার খরচ বহন করেছিলেন। এই উদারতা ও কল্যাণের আবেগের জন্য তাঁকে "দানবীর" উপাধি প্রদান করা হয়।

ইবনে হিশাম 'সিরাতুন নবী'তে লিখেছেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা মুসলমানদের মধ্যে অপপ্রচার করতে চেয়েছিল। এই লক্ষ্যে তারা মদীনা থেকে কিছু দূরে সুয়ায়লেম ইহুদীর বাড়ীতে একত্রিত হয়ে পরিকল্পনা আঁটতো। রাসূলে করীম (সা) তাদের এই অপকর্মের খরব পেলেন। তিনি তাদেরকে নির্মূলের জন্য হযরত তালহাকে (রা) নিয়োগ করলেন। তিনি কতিপয় লোক নিয়ে সুয়ায়লেমের বাড়ী অবরোধ করলেন এবং তাতে আগুন লাগিয়ে দিলেন। ফলে মুনাফিকদের সাহসে ভাটা পড়লো এবং তাদের ফিতনা প্রায় বন্ধই হয়ে গেল।

দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের জন্য বিশ্বনবী (সা) মক্কা মুয়াজ্জামা তাশরীফ নিলেন। হযরত তালহাও (রা) হুজুরের (সা) সঙ্গে ছিলেন। সহীহ বুখারীতে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবাবৃন্দ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তালহা (রা) ছাড়া কারোর নিকট কুরবানীর পশু ছিল না।"

এগারো হিজরীতে রাসূলে আকরাম (সা) ওফাত পেলেন। সে সময় হযরত তালহা (রা) শোকে দুঃখে একদম অস্থির হয়ে পড়লেন এবং কয়েকদিন পর্যন্ত নির্জনত্ব যাপন করলেন। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। তখন হযরত তালহাও (রা) তাঁর হাতে বাইয়াত করলেন। সিদ্দিকে আকবার (রা) তাঁকে খুব মানতেন এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর নিকট থেকে পরামর্শ নিতেন।

তের হিজরীতে ইন্তেকালের পূর্বে তিনি খিলাফতের পদের জন্য হযরত ওমর ফারুককে (রা) নিয়োগ করলেন। এ সময়ে হযরত তালহা (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে রাসূলের খলিফা! ওমর হলো কঠিন মেযাজের মানুষ এবং এই কঠোরতা কয়েকবার আপনার পর্যবেক্ষণেও এসেছে। সে যদি খলিফা হয়, তাহলে আল্লাহই জানেন, আল্লাহর মাখলুকের সঙ্গে কেমন আচরণ করে। আপনি এ ব্যাপারে দ্বিতীয় বার চিন্তা করুন। কেননা আখিরাতে আপনাকে তার জবাবদিহি করতে হবে।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেন, "আমাকে যদি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে আমি আল্লাহকে জবাব দেবো যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দাদের ওপর সেই ব্যক্তিকে আমীর বানিয়েছি যিনি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালো।"

হযরত ওমরের (রা) ব্যাপারে তালহার (রা) এই মত কোন ব্যক্তিগত বিরোধ অথবা স্বার্থপরতার ভিত্তিতে ছিল না বরং তিনি নেক নিয়তের ভিত্তিতে হযরত ওমরের (রা) কঠোর মেযাজ সাধারণ মুসলমানের জন্য অসহনীয় হতে পারে বলে মনে করেছিলেন। তবুও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) যখন নিজের মতের ওপর কায়েম রলেন তখন তাঁর ওফাতের পর হযরত তালহা (রা) নির্ভাবনায় হযরত ওমর ফারুকের (রা) বাইয়াত করেন—এবং যখন তিনি নিজের চেষ্টা, দূরদৃষ্টি এবং নেক আমল দিয়ে এটা প্রমাণ করলেন যে, খিলাফতের পদের জন্য তাঁর চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর নেই তখন তিনি মন ও

অন্তর দিয়ে তাঁর সমর্থক এবং সাহায্যকারী হয়ে গেলেন। ফারুকে আজমের (রা) নিকটও হযরত তালহা (রা) অত্যন্ত কদর ও মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁকে মসলিশে শুরার সদস্য মনোনিত করলেন এবং সবসময় তাঁর পরামর্শের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

অবশেষে ২৩ হিজরীতে হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হলো। ওফাতের পূর্বে তিনি এই ৬ সাহাবীকে খিলাফতের জন্য মনোনীত করেন ঃ

হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত যোবায়ের (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ এবং হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস।

এসব সাহাবীকে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে খলিফা নির্বাচন করার অধিকার ছিল। হযরত তালহা (রা) ত্যাগ স্বীকার করলেন এবং হযরত ওসমানের (রা) পক্ষে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন।

হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতকালের বেশীর ভাগ সময়ই হযরত তালহা (রা) চুপচাপ অতিবাহিত করেন। শুধুমাত্র শেষ বছরে (৩৫ হিজরীতে) তাঁর নাম জনগণের মাঝে শোনা যায়। সে বছর আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমানের (রা) বিরুদ্ধে ফিতনা ও বিশৃংখলা চরম পর্যায়ে পৌছেছিল। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, কিছু ব্যবস্থাপনা বিষয়ে হযরত ওসমানের (রা) সাথে হযরত তাহলার (রা) মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু আমীরুল মু'মিনীনের বিরুদ্ধে বিশৃংখলা ও বিদ্রোহ তিনি কোনক্রমেই পসন্দ করতেন না। সুতরাং যখন মিসর, কুফা ও বসরার বিদ্রোহীরা মদীনার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লো এবং তারা হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা) ও হযরত যোবায়েরকে (রা) তাদের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করলো তখন এই তিন বুজর্গ তাদেরকে ভর্ৎসনা বা দমক দিলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল ও তাবকাতে ইবনে সা'দে আছে যে, যখন বিদ্রোহীরা খলিফার আবাসস্থল অবরোধ করলো তখন হযরত তালহা পরিস্থিতি জরিপের জন্য অবরোধকারীদের সমাবেশে তাশরীফ নিলেন। কিয়াস করা হয় যে, তিনি বিদ্রোহীদেরকে তাদের তৎপরতা বন্ধের আহবান জানিয়ে থাকবেন। সে সময় [অথবা অন্য সময় যখন হযরত তালহা (রা) অবরোধকারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন] হযরত ওসমান (রা) নিজের বাড়ীর জানালা দিয়ে বয়স্ক সাহাবীদের প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে ডাকলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত তালহার (রা) নামও এলো। প্রথম তো তিনি চুপ

রইলেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রা) যখন তিনবার তাঁর নাম ধরে ডাকলেন তখন তিনি জবাব দিলেন, আমি হাজির। হযরত ওসমান (রা) হক পথে নিজের খিদমত ও ফজিলতসমূহ বর্ণনা করলেন এবং হযরত তালহার (রা) নিকট তার স্বীকৃতি চাইলেন। তিনি পূর্ণ সমাবেশে উচ্চস্বরে তার সত্যতা স্বীকার করলেন। কিন্তু বিদ্রোহী বা বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে তার কোন প্রভাব পড়লোনা। অসহায় তালহা (রা) ফিরে গেলেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, অবরোধ যখন ভয়ংকররূপ নিল তখন হযরত আলী (রা) ও হযরত যোবয়েরের (রা) মত হযরত তালহাও (রা) নিজের পুত্র মুহাম্মাদকে (রা) খলিফার বাসভবন রক্ষায় নিয়োগ করলেন। তাঁরা অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে বিদ্রোহীদের মুকাবিলা করলেন। কিন্তু তারা অন্য দিক থেকে এসে ভেতরে ঢুকে পড়লো এবং আমীরুল মু'মিনীনকে (রা) অত্যন্ত নির্দয়তার সাথে শহীদ করে ফেললো। হযরত তালহা (রা) এই হৃদয়বিদারক ঘটনা জানতে পেরে খুব দুঃখিত হলেন এবং অত্যন্ত দুঃখের সাথে বললেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা ওসমানের (রা) ওপর রহম করুন।" লোকেরা বললো, বিদ্রোহীরা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত। হযরত তালহা (রা) বললেন "আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন।" তারপর এই আয়াত পাঠ করলে।

فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلاَ اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ - يس : ٥٠

ইবনে জারির তাবারী এই প্রসঙ্গে হযরত তালহা (রা) এবং হযরত যোবায়েরের (রা) এই বাক্যাবলীও উল্লেখ করেছেন ঃ

"আমরা শুধু এটাই চাইতাম যে, (কতিপয় ব্যাপারে) হযরত ওসমানকে (রা) তার কর্মপদ্ধতি পরিবর্তনে প্রস্তুত করা হবে। আমরা কখনো এই ধারণা করিনি যে, তাঁকে হত্যা করে ফেলা হবে। কিন্তু বেওকুফরা ধৈর্যশীলদের ওপর বিজয়ী হয়ে গেল এবং তাঁরা তাঁকে হত্যা করে ফেললো।"

সাইয়েদেনা হযরত ওসমানের (রা) শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। এটা ছিল খুব ভীতিক সময় এবং হযরত ওসমানের (রা) মজলুমানা শাহাদাতে মুসলমানদের একটি বড় শ্রেণীর মধ্যে বিরাট অশান্তি বিরাজিত ছিল। ইবনে সায়াদ কাতিবুল ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন, হযরত তালহা (রা), হযরত যোবায়ের (রা) এবং অন্য কতিপয় বয়স্ক সাহাবা হযরত আলীর (রা) বাইয়াত করে নিলেন। কিন্তু পরে যখন তাঁরা দেখলো যে, যাঁরা হযরত ওসমান গণির (রা) বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল তার বেশীরভাগই হযরত আলীর (রা) সৈন্যে শামিল হয়ে গেছে। তখন তাঁরা (তাবারী, ইবনে আছির, ইবনে কাছির প্রমুখের বক্তব্য

অনুযায়ী) হযরত আলীর (রা) সঙ্গে সাক্ষাত করেলন এবং বললেন যে, আমরা হদ কায়েমের শর্তে আপনার হাতে বাইয়াত করেছি। এখন আপনি হযরত ওসমান (রা) হত্যাকান্ডে শরীকদের ওপর হদ জারী করে দেন।

হযরত আলী (রা) বললেন, "ভাইসব! আপনাদের দৃষ্টিতে যেসব কথা আছে আমিও তা জানি। কিন্তু তাদেরকে কি করে পাকড়াও করা যাবে যারা এখন শক্তিশালী। বর্তমান পরিস্থিতিতে কি তাদের ওপর হদ জারী করা সম্ভব ?"

সকলেই বললেন, "না!" এতে হযরত আলী (রা) বললেন, "আল্লাহর কসম, আমিও আপনাদের সাথে একমত। কিন্তু পরিস্থিতি একটু ঠিক হতে দিন। যাতে অধিকার আদায় সম্ভব হয়।"

তারপর হযরত তালহা (রা) ও হযরত যোবায়ের (রা) হযরত আলীর (রা) নিকট থেকে বিদায় হয়ে মক্কা মুয়াজ্জামা গেলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) হজ্জের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী উম্মুল মু'মিনীন (রা) হজ্জ থেকে ফারেগ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় রাস্তায় হযরত তালহা (রা) ও হযরত যোবায়ের (রা) তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং মদীনার অবস্থা বর্ণনা করলেন। তা শুনে উম্মুল মু'মিনীন (রা) তাঁদের সঙ্গে মক্কা মুয়াজ্জামা ফিরে গেলেন। উম্মুল মু'মিনীনের (রা) সাথে পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হলো যে, সংশোধনের ঝান্ডা বুলন্দ করতে হবে। সুতরাং তাঁরা উম্মুল মু'মিনীনের (রা) সঙ্গে বসরা রওয়ানা হলেন এবং সেখানে পৌঁছা পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ তাঁদের বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলো। হযরত আলী (রা) এই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে তিনিও নিজের বাহিনী নিয়ে মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হলেন। উভয় পক্ষে উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম মানুষরা ছিলেন। তাঁরা যদি পরস্পর সংঘর্ষশীল না হতেন তাহলে সমঝোতার কোন পথ হয়তো বের হয়ে আসতো। কিন্তু কিছু মানুষ মিথ্যা কথা ও গুজব ছড়িয়ে সংঘর্ষ আবশ্যিক করে তুললো এবং "উষ্ট্রের যুদ্ধের" দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হলো। তাবারী, ইবনে সা'দ, ইবনে আছির, হাফেজ ইবনে হাজার, হাফেজ ইবনে আবদুল বার এবং অন্য আরো নেতৃস্থানীয় চরিতকার বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধের শুরুতে হযরত আলী (রা) হযরত তালহা (রা) ও হযরত যোবায়েরকে (রা) পয়গাম পাঠালেন যে, আপনারা আমার নিকট এসে আলোচনা করুন। উভয় বুজর্গ হযরত আলীর (রা) নিকট গেলেন। এ সময় তিনি তাদেরকে হুজুরের (সা) কতিপয় ইরশাদ স্মরণ করালেন। তার ফল এই হলো যে, হযরত যোবায়ের (রা) যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে পৃথক চলে গেলেন এবং হযরত তালহা (রা) প্রথম কাতারের পরিবর্তে পেছনের কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। এ

সময় মারওয়ান ইবনুল হাকাম একটি বিষাক্ত তীর তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করলেন। এই তীর তাঁর হাটুতে (অথবা পা) বিদ্ধ হলো এবং তার ব্যথায় মুসলিম উম্মাহর এই মহান ব্যক্তি শাহাদাত লাভ করেন।

এখানে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, মারওয়ান কেন তাঁর ওপর তীর নিক্ষেপ করলো। কেননা উভয়েই একই বাহিনীতে ছিলেন। ইবনে খালদুন এবং অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক তার জবাব এই দিয়েছেন যে, বনু উমাইয়ার সাধারণ লোকদের ধারণা এই ছিল যে, সেইসব মানুষ কোন না কোন ভাবে ওসমান (রা) হত্যার জন্য দায়ী যারা বিশৃংখলার সময় মদীনায় উপস্থিত ছিলেন। অথচ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেননি অথবা যাঁরা সাইয়েদেনা হযরত ওসমানের (রা) সঙ্গে কখনো কোন ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন মারওয়ান হযরত তালহাকে (রা) এ ধরনের মানুষই মনে করতেন এবং তাঁর প্রতি খুব খারাপ ধারণা ছিল। এ জন্য সে তাঁর রক্তে হাত রঞ্জিত করেছিলো।

[আধুনিক যুগের কতিপয় আলেম এবং ঐতিহাসিক "উষ্ট্রের যুদ্ধ" এবং হযরত তালহার (রা) ব্যাপারে উপরেল্লিখিত বর্ণনার সমালোচনা করেছেন এবং সনদের সিলসিলার দিক থেকে তাকে দলিল হিসেবে গ্রহণীয় মনে করেননি। বিতর্ক সৃষ্টি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যাহোক, একটা কথা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলা যায় যে, হযরত তালহা (রা) যাকিছু করেছিলেন তা নেক নিয়তের সাথে করেছিলেন এবং তাতে তাঁর কোন ব্যক্তিস্বার্থ ছিল না।]

ইমাম বুখারী (র) "তারিখুস সাগীরে" লিখেছেন যে, উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত তালহা (রা) সর্বপ্রথম শহীদ হন। এটা ৩৬ হিজরীর ১০ই জমাদিউস সানী জুময়ার দিনের ঘটনা। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৪ বছর।

ইমাম জাহাবী (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হযরত তালহার (রা) শাহাদাতে খুবই আফসোস করেছিলেন।

ইবনে সায়াদ (র) তাবকাতে লিখেছেন যে, যুদ্ধের পর হযরত তালহার (রা) এক পুত্র হযরত আলীর (রা) খিদমতে হাজির হলে তিনি তাঁকে খুব মুহাব্বাতের সাথে নিজের নিকট বসিয়েছিলেন। তাঁর সম্পত্তি তাঁকে ফেরত দেন এবং বলেন, "আমি আশা করি আখিরাতে আমার ও তোমার পিতার মধ্যে সেই মুয়ামেলা পেশ হবে যার উল্লেখ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَنَزَعْنَا مَافِى صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ

"আমরা তাদের অন্তর থেকে বিরক্তি দূর করে দেব এবং তারা ভাইয়ের মত একে অপরের সামনে সিংহাসনে বসে থাকবে।"(আল হিজর ঃ ৪৭)

হযরত তালহাকে (রা) যুদ্ধের ময়দানের এক কোণায় দাফন করা হলো। কিন্তু স্থানটি ছিল নীচু। বৃষ্টির সময় পানিতে ডুবে যেত। আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, এক ব্যক্তি পরপর তিনবার হযরত তালহাকে (রা) স্বপ্নে দেখলেন। তিনি নিজের লাশকে সেই কবর থেকে স্থানান্তরের কথা বলছিলেন। সেই ব্যক্তি নিজের স্বপ্নের কথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে (রা) বর্ণনা করলেন। এ সময় তিনি হযরত আবু বাকরাহ (রা) বিন মাসরুহর বাড়ী দশ হাজার দিরহামে কিনে তাতে কবর খুঁড়ালেন এবং হযরত তালহার (রা) লাশ সেখানে স্থানান্তর করালেন। দর্শকরা বর্ণনা করেছেন, এতদিন পরও হযরত তালহার (রা) পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত ও তরতাজা ছিল। এমনকি চক্ষুতে যে কর্পর লাগানো হয়েছিল তাও সম্পূর্ণরূপে ঠিকঠাক ছিল।

হযরত তালহা (রা) নিজের জীবনে (বিভিন্ন সময়) বেশ কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীদের নাম হলো ঃ হামনা (রা) বিনতে জাহাশ, খাওলা বিনতে কা'কা' তামিমী (রা), সা'দা বিনতে আওফ, উম্মে আবান (রা) বিনতে উতবা, উম্মে কুলছুম বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রা), উম্মুল হারিছ বিনতে কাসামা, ফারয়াতা বিনতে আলী তুগলাবী, রুকাইয়া (রা) বিনতে আবু উমাইয়া, ফারিয়া (রা) বিনতে আবু সুফিয়ান (রা)—হযরত তালহার (রা) চার স্ত্রী হামনা (রা), রুকাইয়া (রা), ফারিয়া (রা) এবং উম্মে কুলছুম (রা) প্রিয় নবীর (সা) শ্যালীকা ছিলেন। হামনা (রা) হযরত যয়নাব (রা) বিনতে জাহাশের, রুকাইয়া হযরত উম্মে সালামার (রা), ফারেয়া (রা) হযরত উম্মে হাবিবার (রা) এবং উম্মে কুলছুম হযরত আয়েশার (রা) বোন ছিলেন।

পুত্রদের নাম হলো ঃ মুহাম্মাদ (রা) (সাজ্জাদ), ইমরান, মূসা, ইসহাক, ইসমাঈল, ইসা, ইয়াহিয়া, ইয়াকুব, জাকারিয়া, ইউসুফ ও সালেহ।

কন্যারা হলেন ঃ আয়েশা, উম্মে ইসহাক, সা'বাহ এবং মরিয়ম।

ইবনে হাযাম বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে ইসহাককে হযরত হাসান (রা) বিন আলী (রা) বিয়ে করেছিলেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত হোসাইন (রা) বিন আলীর (রা) সঙ্গে বিয়ে হয় এবং তাঁর গর্ভেই হযরত ফাতিমা (রা) বিনতে হোসাইন (রা) জন্ম গ্রহণ করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) পৌত্র আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান (রা) এবং হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের পুত্র হযরত মাসয়াবও হযরত তালহার জামাতা ছিলেন।

হযরত তালহার (রা) বড় পুত্র মুহাম্মাদ (রা) সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি বেশী বেশী ইবাদাতের কারণে সাজ্জাদ উপাধিতে মশুহুর হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও উষ্ট্রের যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। এক পুত্র ইয়াকুব হিররার ঘটনায় শহীদ হন।

হযরত তালহা (রা) শৈশবকাল থেকেই ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। মদীনা এসেও তিনি এই পেশা অব্যাহত রাখেন এবং হেজাজের সফল ব্যবসায়ীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তাছাড়া হিজরতের পর তিনি কৃষিকাজও শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারের একটি জায়গীরও তাঁকে দান করেন। তিনি এই জায়গীরের ওপরই ভরসা করেননি বরং ইরাকে আরো অনেক জমি খরিদ করেন। সেই সব জমির মধ্যে "কানাত" ও "সারাত" খুব প্রসিদ্ধ। এসব স্থানে তিনি ব্যাপকভাবে কৃষি কাজ করেন। ২০টি উট জমিতে পানি সেচের কাজে নিয়োজিত থাকতো। এসব জমিতে এত প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো যে, ইবনে সায়াদের বক্তব্য অনুযায়ী তার প্রতিদিনের আয়ের পরিমাণ ছিল এক হাজার দিনার। মোটকথা, বাণিজ্য ও কৃষির আয় তাকে অসাধারণ বিত্তশালী করেছিল। কিন্তু তিনি যে ধরনের ধনী ছিলেন তেমনি উদার ও দানশীল ছিলেন। চরিতকাররা তাঁর আল্লাহর পথে ব্যয়, মেহমানদারী কল্যাণের আবেগ এবং দানশীলতার ২০টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, তিনি নিজের সম্পদ হক পথে নির্দ্বিধায় ব্যয় করতেন এবং তিনি ছিলেন দানবীরদের রাজা। হযরত কাবিসা (রা) বিন জাবের বলেছেন যে, আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত হযরত তালহার (রা) সঙ্গে ছিলাম এবং তাঁর থেকে বড় কাউকেই না চাইতেই সম্পদ দানকারী দেখিনি।

কায়েস বিন আবি হাযেম বর্ণনা করেছেন যে, আমি তালহার (রা) চেয়ে বেশী কাউকে না চাইতেই দান করার ব্যাপারে অগ্রগামী দেখিনি।

হযরত তালহা (রা) নবীর (সা) যুদ্ধসমূহে ব্যয় নির্বাহের জন্য মোটা অংকের অর্থ পেশ করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) বলেন যে, জি কারদের যুদ্ধের সময় তিনি মুসলমানদের প্রয়োজন অনুযায়ী পানির একটি পুকুর "বিসানে সালেহ" ক্রয় করে ওয়াকফ করেন। মুয়াত্তা ইমাম মালিকে হযরত সালমা (রা) বিন আকওয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত তালহা (রা) পাহাড়ের পাদদেশে একটি কূপ ক্রয় করেন এবং লোকদেরকে খাবার খাওয়ান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অবশ্যই হে তালহা, তুমি বড় উদার ও দানশীল।

তাবুকের যুদ্ধের ব্যয় প্রসঙ্গেও তিনি মোটা অংক ব্যয় করেন। তাঁর এ ধরনের দানশীলতার জন্য তিনি দানবীর উপাধির মুসতাহিক হয়ে গিয়েছিলেন।

এক রেওয়ায়াতে তাঁর লকব "জাওয়াদ" বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর পুত্র মূসা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার পিতাকে ওহোদের যুদ্ধে তালহাতুল খায়ের, তাবুকে তালহাতুল ফাইয়াজ এবং হুনাইনের যুদ্ধে তালহাতুল জাওয়াদ বলেছিলেন।

একবার তিনি হাজরা মাওত থেকে সাত লাখ দিরহামের মোটা অংক পেলেন। এই সমুদয় অর্থ তিনি অভাবী মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং তাঁর স্ত্রীর অংশে এলো শুধুমাত্র এক হাজার দিরহাম।

একবার নিজের একটি সম্পত্তি লাখ দিরহামে হযরত ওসমানের (রা) নিকট বিক্রি করলেন এবং এই সকল অর্থই তিনি আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিলেন।

অন্য আরেকবার চার লাখ দিরহাম তাঁর নিকট এলো। এই সমুদয় অর্থ তিনি নিজের কওম (বনু তাইম)-এর মধ্যে বন্ট করে দিলেন।

ইমাম জাহাবী (র) খাজা হাসান বাসরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত তালহা (রা) তাঁকে সাত লাখ দিরহাম দান করলেন। এত মোটা অংকের অর্থের কারণে সারারাত তিনি ঘুমুতে পারলেন না এবং সকাল হতেই তিনি এই সমগ্র অর্থ আল্লাহর পথে ভাগ করে দিলেন।

তাবকাতে ইবনে সা'দে হযরত তালহার (রা) স্ত্রী সা'দী (রা) বিনতে আওফ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তালহা (রা) বাড়ী এলেন। তিনি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কেন ? আমি কোন ভুল তো করে ফেলিনি ? তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, তুমিতো উত্তম স্ত্রী। আসল কথা হলো, আমার নিকট অনেক সম্পদ জমা হয়ে গেছে এবং আমি সে'ব্যাপারেই চিন্তা করছি।"

আমি (সা'দী) বললাম, চিন্তার কি আছে। নিজের পরিবার পরিজন এবং কওমের কাছে মানুষ প্রেরণ করুন এবং এই সম্পদ তাদের মধ্যে বন্টন করিয়ে দিন। সুতরাং তিনি তাই করলেন। আমি খাজাঞ্চীকে জিজ্ঞেস করলাম, কত মাল বন্টন করেছ ? সে বললো, চার লাখ।

একবার এক গ্রাম্য অভাবী ব্যক্তি তাঁর নিকট এলো এবং কোন আত্মীয়তার সূত্র উল্লেখ করে সওয়াল করলো। হযরত তালহা (রা) বললেন, "এর পূর্বে কেউ কখনো এই আত্মীয়ের সূত্র উল্লেখ করে আমার নিকট সওয়াল করেনি। আমার নিকট জমি আছে এবং হযরত ওসমান (রা) এই জমি তিন লাখ

দিরহামে ক্রয়ে আগ্রহী। চাইলে জমি নিতে পার অথবা তার মূল্যও নিতে পার।

গ্রাম্য লোকটি নগদ অর্থ নেয়াটাই পসন্দ করলো এবং হযরত তালহা (রা) তা খুশীর সাথে দিয়ে দিলেন।

হযরত তালহা (রা) নিজের গোত্রের (বনু তাইম) গরীব ও অভাবগ্রস্ত মানুষের স্থায়ী জামিন ছিলেন। ঋণগ্রস্তদের ঋণ আদায় করে দিতেন এবং গরীব মেয়ে ও বিধবা মহিলাদেরকে নিজের খরচে শাদী করিয়ে দিতেন। সাবিহা তাইমী ত্রিশ হাজার দিরহাম ঋণগ্রস্ত ছিলেন। হযরত তালহা (রা) তা জানতে পেরে তার সকল ঋণ নিজের নিকট থেকে আদায় করে দেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ ও হাফেজ জাহাবী বর্ণনা করেছেন, হযরত তালহা (রা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাকে (রা) খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং তিনি প্রতি বছর তার খিদমতে দশ হাজার দিরহাম পেশ করতেন। সাধারণ দান-সদকা এবং গরীব মিসকিনদের অভিভাবকত্ব ছাড়া মেহমানদারীও হযরত তালহার (রা) বিশেষ অভ্যাস ছিল। তিনি মেহমানদের খিদমত করে আত্মিক আনন্দ অনুভব করতেন এবং যদি তাদের কোন কাজ আটকে থাকতো তাহলে সেই কাজ পূর্ণ করে দেয়ায় কোন অশস্তি বোধ করতেন না।

হযরত তালহা (রা) যত পরিমাণ ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন আল্লাহ তায়ালা তাঁর থেকেও বেশী সম্পদ দান করতেন। সুতরাং তিনি যখন শাহাদাত পেলেন তখন পরিবার পরিজনের জন্য অনেক সম্পদ রেখে যান। একবার আমীরে মুয়াবিয়া (রা) তাঁর পুত্র মূসাকে (র) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিতা তোমাদের জন্য কি রেখে গেছেন। তিনি জবাবে বললেন, অনেক পরিমাণ সোনা ও রূপা ছাড়াও দু'লাখ দিনার এবং ২২ লাখ দিরহাম নগদ এবং তিনকোটি দিরহামের সম্পত্তি। এই সমুদয় মাল তিনি হালালভাবে হাসিল করেছিলেন এবং আল্লাহর পথে অকুণ্ঠ চিত্তে ব্যয়ের পরও তাঁর নিকট বেঁচে গিয়েছিল।

সাইয়েদেনা হযরত তালহা (রা) যদিও বছরের পর বছর মহানবীর (সা) সাহাবীয়াতের ফয়েজ লাভ করেছিলেন। কিন্তু হাদীস বর্ণনাতে তিনি খুব সতর্ক ছিলেন। এজন্য তাঁর থেকে খুব কম হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর রাবীদের মধ্যে হযরত জাবের (রা), সায়েব (রা) বিন ইয়াযিদ, আবদুর রহমান (রা) বিন ওসমান তাইমী, কায়েস (র) বিন আবু হাযেম, মালিক (র) বিন আবি আমের আসবাহী, আবদুল্লাহ (র) বিন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ এবং আবু ওসমান নাহদী প্রমুখ শামিল ছিলেন। তিনি নিজের হাদীসসমূহে উম্মুহাতের মাসয়ালা এবং

দ্বীনের উসূল সম্পর্কিত মাসয়ালা বর্ণনা করতেন। যেমন সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে বলেন ঃ

"রাসূলের (সা) নিকট নাজদের এক লোক এলো। তার চুল ছিল উসকো-খুশকো। আমরা তার বিড়বিড় আওয়াজ শুনলাম। কিন্তু কি বলছিল তা বুঝতে পারলাম না। সে যখন নিকটে এলো তখন জানতে পেলাম যে, ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, দিন-রাতে পাঁচ নামায। বললো, তাছাড়া আরো কিছু নামাযও কি আমার দায়িত্বে আছে ? তিনি বললেন, তোমার ওপর আর কোন নামায ফরজ নেই। কিন্তু, হাঁ নিজের পক্ষ থেকে পড়তে চাইলে পড়তে পারো। তারপর সে রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, রমযানের রোযা। সে বললো, আরো কিছু ? বললেন, না। তবে, হাঁ নিজের তরফ থেকে কিছু রাখতে চাইলে রাখতে পারো। অতপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে যাকাতের কথা উল্লেখ করলেন। বললো, আমার দায়িত্বে কি যাকাত ছাড়াও কিছু দান করা ফরয ? বললেন, না। তবে, হাঁ নিজের পক্ষ থেকে কিছু দিতে চাইলে দেবে। এই সওয়াল-জওয়াবের পর তিনি (সা) তাকে ইসলামের অন্য আহকামও শিখালেন। সেই ব্যক্তি যখন রওয়ানা দিল তখন একথা বলছিল, আল্লাহর কসম, তা থেকে বেশীও করবো না এবং তার থেকে কমও করবো না। (আমার পক্ষ থেকে কিছু বাড়াবোও না এবং আল্লাহ তায়ালা আমার ওপর যা ফরয করেছেন তাতে কমও করবো না)। তিনি বললেন, যদি সে ঠিক বলে থাকে তাহলে সফল হয়েছে।"

(বুখারী কিতাবুল হায়েল)

ওহোদের যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট হযরত তালহার (রা) বর্ণিত হাদীস মাগাযিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। সহীহ বুখারীতে হযরত তালহা (রা) থেকে একটি ফিকাহর মাসয়ালাও বর্ণিত আছে।

আবদুর রহমান বিন ওসমান তাইমী থেকে বর্ণিত আছে যে, "আমরা তালহা (রা) বিন উবায়দুল্লাহর সাথে ছিলাম এবং ইহরাম বেঁধেছিলাম। তালহার (রা) জন্য হাদিয়া হিসেবে পাখীর গোশত এলো। তিনি সে সময় ঘুমিয়েছিলেন। আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সেই গোশত খেলো এবং কেউবা খেলো না। তালহা (রা) যখন ঘুম থেকে জাগলেন তখন যারা গোশত খেয়েছিল তাদের মত সমর্থন করলেন এবং বললেন আমরা রাসূলের (সা) (এ ধরনের হাদিয়া) সাথে এ ধরনের গোশত খেয়েছি।" মহানবীর (সা) প্রতি হযরত তালহার (রা) ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাঁর নিকট থেকে যা কিছু শুনতেন তা জীবনের জপমালা বানিয়ে নিতেন এবং তার ওপর আমলের চেষ্টা করতেন। একবার হুজুরের (সা) একটি ইরশাদ মুবারক ভুলে

গিয়েছিলেন। ফলে খুব পেরেশান হলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে পেরেশান ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখতে পেলেন। কি ব্যাপার, কারোর সঙ্গে ঝগড়া হয়নি তো ? তিনি বললেন, না। ব্যাপার হলো, আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছিলাম যে, কোন বান্দা যদি মৃত্যুর সময় একটি কালেমা যবান দিয়ে উচ্চারণ করে তাহলে রুহ কবজের কষ্ট দূর হয়ে যাবে এবং তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যাবে। এই কালেমা আমি ভুলে গেছি। এ জন্য আমি পেরেশান হয়ে পড়েছি।

হযরত ওমর ফারুক (রা) বললেন, তুমি কি এই কালেমা থেকেও বেশী মর্যাদাবান কালেমা জানো যা হুজুর (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত তালহা (রা) এই কালেমা শুনে খুশী হয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, এই সেই কালেমা। (মুসনাদে আহমদ হাম্বল)

সাইয়েদেনা হযরত তালহার (রা) চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা, কঠোর অবস্থায় ধৈর্য ধারণ রাসূল প্রেম, আত্মোৎসর্গীকৃত মনোভাব, বীরত্ব, আল্লাহর পথে ব্যয়, খিদমতে খাল্ক, মেহমানদারী এবং সুন্দর আচরণ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ দিকই ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সুন্দর আচরণের সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। হযরত উম্মে আবান (রা) বিনতে উতবা বিন রাবিয়াকে অনেক শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি শাদীর পয়গাম প্রেরণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত তালহাও (রা) ছিলেন। উম্মে আবান (রা) হযরত তালহা (রা) ছাড়া বাকী সকলের পয়গাম এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, আমি তালহার (রা) সুন্দর চরিত্র ও গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফ আছি। তিনি হাসতে হাসতে বাড়ী আসেন। যখন বাইরে যান তখন ঠোঁটে থাকে মুচকি হাসি। কিছু চাইলে নির্দ্বিধায় দিয়ে দেন এবং চুপ থাকলে চাওয়ার অপেক্ষা করেন না। নিজেই দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রগামী হন। যদি কোন কাজ করে দেই তাহলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভুল হয়ে গেলে ক্ষমা করে দেন। (কানযুল উম্মাল)।

মশহুর সাহাবী হযরত কাব বিন মালিক আনসা তাবুকের যুদ্ধে শরীক হননি। হুজুর (সা) মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে তার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার নির্দেশ দিলেন। যখন তাঁর তাওবা কবুল হলো এবং তিনি রাসূলের (সা) সাথে মুলাকাতের জন্য মসজিদে এলেন তখন হযরত তালহা (রা) যারপর নাই আনন্দিত হলেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে হযরত কাবের (রা) সাথে উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন এবং তাওবা কবুলের মোবারকবাদ দিলেন। বস্তুত আর কেউই এমনকি হযরত কাবের (রা) নিজের কওমও (আনসার) এমন অসাধারণ খুশী ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি। এ জন্য তাঁর উপর হযরত তালহার (রা) খুলুসিয়াত ও মুহাব্বাতের এত গভীর প্রভাব পড়লো যে, সারা জীবন তিনি তা ভুলতে পারেননি। সহীহ বুখারীতে স্বয়ং হযরত কায়াব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে ঃ

"তালহা (রা) বিন উবায়দুল্লাহ আমার দিকে দৌড়ে এলো। আমার সঙ্গে মুসাফিহা করলো এবং মুবারকবাদ দিল। আল্লাহর কসম, তিনি ছাড়া মুহাজিরদের মধ্য থেকে কেউ উঠে আমার নিকট এলো না এবং আমি তালহার (রা) এই আচরণ কখনো ভুলবো না।"(কিতাবুল মাগাযি, তাবুকের যুদ্ধ)

ফাজায়েল ও প্রশংসার দিক থেকে হযরত তালহা (রা) খুব উঁচু মর্যাদায় সমাসীন। তিনি শুধুমাত্র আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতমই ছিলেন না, বরং ওহোদের যুদ্ধে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবেও জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। সকল যুদ্ধেই রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। বাইয়াতে রিদওয়ানের সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং 'আসহাবিশশাজারাহর' মধ্যে পরিগণিত হন। রাসূলের (সা) নিকট থেকে খায়ের, ফাইয়াজ ও জাওয়াদ লকবসমূহে বিভূষিত হন। সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) হিরা পাহাড়ের ওপর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আবুবকর (রা), ওমর (রা), আলী (রা), ওসমান (রা), তালহা (রা) এবং যোবায়েরও (রা) ছিলেন। পাথর (চাটান অথবা পাহাড়) হেলতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, থেমে যা। তোর ওপর নবী, সিদ্দিক ও শহীদ আছে।" (কিতাবুল ফাজায়েল)

এসব বুজর্গের মধ্যে যারা সে সময় রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ছাড়া অবশিষ্ট সকল বুজর্গ (হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা এবং হযরত যোবায়ের) শাহাদাতের মর্যাদায় সমাসীন হন। সকল নেতৃস্থানীয় সাহাবী (রা) হযরত তালহার (রা) গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং প্রকাশ্যে তাঁর প্রশংসা করতেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, উষ্ট্রের যুদ্ধের পূর্বে হযরত আলী (রা) হযরত তালহার (রা) বিরোধিতা সম্পর্কে জানতে পেরে বললেন, এ সময় পর্যন্ত আমি চার ব্যক্তির বিরোধিতার খবর পেয়েছি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে নেক ও দানশীল হলেন তালহা (রা)। (উসুদুল গাব্বাহ)

তিনি যখন উষ্ট্রের যুদ্ধে শাহাদাত পেলেন তখন হযরত আলী মুরতাজা (রা) যুদ্ধের পর তাঁর লাশের নিকট তাশরীফ নিলেন। চেহারার উপর থেকে মাটি পরিষ্কার করলেন এবং বললেন আবু মুহাম্মাদ! এটা আমার জন্য খুবই কষ্টদায়ক যে, তোমাকে তারা খচিত আসমানের নীচে ধূলি ধূসরিত অবস্থায় দেখতে পাবো। তারপর বললেন, হায়! আমি যদি এই ঘটনার বিশ দিন পূর্বে ইন্তিকাল করতাম। একথা বলে আমীরুল মু'মিনীন (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা কেঁদে দিলেন এবং খুব কাঁদলেন।

হযরত জাফর তাইয়্যার (রা)

বিশ্বনবী (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পর প্রথম তিনবছর অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। নবুয়তের চতুর্থ বছরের প্রথম দিকে যখন এই নির্দেশ অবতীর্ণ হলো ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ـ الحجره : ٩٤

"কাজেই হে নবী, যে জিনিসের হুকুম তোমাকে দেয়া হচ্ছে তা জোরে-শোরে উচ্চ কণ্ঠে বলে দাও এবং শিরককারীদের বিন্দুমাত্র পরোয়া করো না।"(আল হিজর ঃ ৯৪)

এই আয়াত নযিলের পর হুজুর (সা) লোকদেরকে প্রকাশ্যভাবে হকের দিকে আহবান শুরু করলেন। ভাগ্যবান আত্মার মানুষরা হক দাওয়াত পেতেই কালবিলম্ব না করে দাওয়াতে সাড়া দিলেন। কিন্তু সেই সব মানুষ যাদের স্বভাব-প্রকৃতিই কুফর ও শিরকের ওপর গড়ে উঠেছিল তারা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেল। তারা সেই সব মানুষ ছিল যারা হুজুরকে (সা) সাদেক বা সত্যবাদী এবং আমানতদার বলতে কোন কুণ্ঠা করতো না। কিন্তু যখন রহমতে আলম (সা) তাদেরকে হকের দিকে আহবান জানালেন, তখন তারা প্রকাশ্যে শত্রু হয়ে গেল এবং হকপন্থীদের রক্ত পিপাসু বনে গেল। এই হতভাগারা তাওহীদ-পন্থীদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের এমন এমন নির্মম কাহিনী সৃষ্টি করলো যে, মানবতা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তাতে হকপন্থীদের জন্য মক্কায় জীবন কাটানোই কঠিন হয়ে পড়লো। এক বছর তো কোনমতে কাটলো। কিন্তু যখন কট্টর কুরাইশদের নির্যাতন চরম পর্যায়ে পৌঁছলো তখন রহমতে আলম (সা) নবুয়তের পাঁচ বছর পর রজব মাসে নিজের মজলুম জান নিছারদেরকে বললেনঃ

"তোমরা মক্কা থেকে হিজরত করে হাবশা চলে যাও। এটাই তোমাদের জন্য ভালো হবে। সেখানে এমন একজন বাদশাহ আছে যে কারোর ওপর জুলুম হতে দেয় না। তা ভালো বা কল্যাণের ভূমি। তোমরা সেখানে অবস্থান কর। ইতিমধ্যে আল্লাহ তায়ালা এই মুসিবত দূর করার কোন পরিস্থিতি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করে দেবেন।"

হুজুরের (সা) ইঙ্গিত পেয়ে ১১ জন পুরুষ ও চার মহিলার সমন্বয়ে গঠিত হকপন্থীদের একটি কাফেলা সর্বপ্রথম মক্কার মাটিকে বিদায় জানান এবং সুদীর্ঘ (জল ও স্থল) সফরের পর হাবশা গিয়ে উদ্বাস্তুর জীবন গ্রহণ করেন। এই কাফেলার রওয়ানার পরও দু'এক জন করে প্রায়ই হিজরত করে হাবশা যেতে থাকেন। নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছরে ৮০ থেকে বেশী পুরুষ এবং ১৮-১৯ জন মহিলা

সমন্বয়ে গঠিত হকপন্থীদের অন্য একটি কাফেলা হাবশা হিজরত করেন। এমনিভাবে হাবশায় মুসলমানদের সংখ্যা বেশী হয়ে গেল এবং সেখানে তাঁরা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটাতে লাগলো। মক্কার মুশরিকরা যখন শুনতো যে হাবশায় মুসলমানরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করছে তখন তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতো। অবশেষে তারা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নাজ্জাশী বাদশাহর নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিল। এই প্রতিনিধি দলটি সেখানে গিয়ে বাদশাহকে সেখান থেকে মুসলমানদেরকে বের করে দেয়ার জন্য উৎসাহ দেবে। বস্তুত এই প্রস্তাব অনুযায়ী তারা আমর ইবনুল আছ এবং আবদুল্লাহ বিন আবি রবিয়া (আবু জেহেলের বৈপিত্রীয় ভাই)-কে অনেক মূল্যবান উপঢৌকন (যার মধ্যে মক্কার উত্তম ফিনিশড লদার দিল) সহ হাবশা রওয়ানা করলো।

কুরাইশ প্রতিনিধিদল হাবশা পৌছে সর্বপ্রথম নাজ্জাশীর বড় বড় আমলাদের মধ্যে প্রাণ খুলে উপঢৌকন বন্টন করলো এবং তোষামোদের কথা বলে তাদেরকে নিজেদের সমর্থক বানিয়ে নিল। তারা কুরাইশ প্রতিনিধি দলের সাথে পাক্কা প্রতিশ্রুতি দিল যে, তারা বাদশাহর সামনে তাদের দাবীর সমর্থন জানাবে এবং মুসলমানদেরকে হাবশা থেকে বের করে দেয়ার পক্ষে জোর মত প্রকাশ করবে। তারপর আমর ইবনুল আছ ও আবদুল্লাহ বিন আবি রাবিয়া উভয়েই নাজ্জাশীর দরবারে হাজির হলো এবং অনেক মূল্যবান উপঢৌকন তার খিদমতে পেশ করে আরজ করলো ঃ

"জাঁহাপনা! আমাদের কওম কুরাইশের কতিপয় ব্যক্তি নিজের বাপ-দাদার দ্বীন পরিত্যাগ করে ও স্বদেশ ছেড়ে এখানে চলে এসেছে। তারা জাঁহাপনার দ্বীনও গ্রহণ করেনি। বরং একটি নতুন দ্বীন উদ্ভাবন করেছে। এ জন্য আমাদের কওমের বুজর্গরা আমাদেরকে হুজুরের খিদমতে এই নিবেদনসহ প্রেরণ করেছে যে, জাঁহাপনা যেন তাদেরকে স্বদেশ ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন।"

বাদশাহ তখনো তাদের কথার কোন জবাব দেননি। এমন সময় আমলারা চারদিক থেকে তাদের দাবীর সমর্থন জানাতে শুরু করলো এবং বাদশাহকে আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকে অবশ্যই দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো। তারা বললো, জাঁহাপনা! আশ্রয় গ্রহণকারীদের ব্যাপারে তাদের কওম ও স্বদেশের মানুষ আমাদের চেয়ে বেশী জানে এবং তাদের দোষত্রুটি তারাই ভালো অবহিত।

নাজ্জাশী ছিলেন একজন সুন্দর প্রকৃতি ও স্বভাবের এবং ন্যায় মেযাজের শাসক। তাঁর ওপর তাদের কথার কোন প্রভাব হলো না। তিনি বললেন ঃ

"এভাবে তো আমি তাদেরকে এদেশ থেকে বের করবো না। কারণ, তারা আমার ওপর আস্থা এনেছে এবং আমার আশ্রয়ে এসেছে। আমি তাদেরকেও এই প্রতিনিধি দলের বর্ণনা কতটুকু সত্য সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস না করে কিভাবে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি ?"

তারপর তিনি হাবশার মুহাজিরদেরকে নিজের দরবারে ডেকে পাঠালেন। কুরাইশের প্রতিনিধি দল এবং মুহাজিররা একই সময় দরবারে হাজির হলো। কুরাইশ প্রতিনিধিরা বাদশাহকে দেখেই সিজদায় অবনত হয়ে পড়লো। কিন্তু মুহাজিরদের কেউই সিজদা করলেন না। বাদশাহ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তোমরা এটা কি করেছ। নিজের কওমের দ্বীনও ছেড়ে বসেছ। আমার দ্বীনও গ্রহণ করোনি এবং দুনিয়ার অন্য কোন দ্বীনেও দাখিল হওনি। শেষে তোমরা এ কোন ধরনের নতুন দ্বীন উদ্ভাবন করেছ ?"

নাজ্জাশীর কথা শুনে মুহাজিরা পরস্পরের প্রতি তাকালো এবং তাঁদের মধ্যেকার ২৫-২৬ বছরের এক অত্যন্ত সুদর্শন যুবক সামনে অগ্রসর হলেন। তাঁর কপাল সৌভাগ্যের দ্যূতিতে ঝলমল করছিল এবং চেহারা ঈমানের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল। তিনি খুব গম্ভীর আওয়াজে হাবশার বাদশাহকে এই বলে সম্বোধন করলেন ঃ

"হে বাদশাহ ! আমরা জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত একটি জাতি ছিলাম। মূর্তি পূজা করতাম। মৃত জীব-জন্তু খেতাম। লজ্জাহীনতার কাজ করতাম। আত্মীয়তার বিচ্ছেদ ঘটাতাম। প্রতিবেশীর সাথে করতাম অসদাচরণ। আমাদের মধ্যে যে মজবুত ও শক্তিশালী হতো সে দুর্বলদের খেয়ে ফেলতো। আমরা এই অন্ধকারের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিলাম। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের মধ্যে স্বয়ং আমাদের থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করেন। এই রাসূলের নসব, সত্যবাদিতা, আমানতদারী এবং পবিত্রতা সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে জানি। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ডেকেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা যেন আল্লাহকে একক হিসেবে মানি এবং তাকেই ইবাদাত করি। মূর্তি ও পাথর পূজা যেন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করি। এসব মূর্তি ও পাথরকে আমাদের বাপ-দাদারা ইবাদাত করতো। তিনি আমাদেরকে সত্য বলা, আমানতদারী, আত্মীয়দের খেয়াল রাখা, প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ, হারাম কাজ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদেরকে বেহায়াপনা, মিথ্যা কথা বলা, ইয়াতিমের মাল খাওয়া এবং পবিত্র মহিলাদের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ থেকে বিরত রেখেছেন। তিনি আমাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করা এবং কাউকে তার সাথে অংশীদার না করার

তালকিন দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে নামায পড়ার, যাকাত দানের এবং রোযা রাখার নির্দেশও দিয়েছেন। আমরা এই ব্যক্তিত্বের ওপর সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছি এবং তার সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছি এবং যে দ্বীন তিনি আল্লাহর তরফ থেকে এনেছেন তার আনুগত্য করেছি। আমরা শুধু আল্লাহর ইবাদাত করে থাকি এবং কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার করি না। তিনি যেসব বস্তু আমাদের জন্য হালাল বলে আখ্যায়িত করেছেন তাকে আমরা হালাল বলে জানি। ব্যাস, এই কথাতেই আমাদের কওম আমাদের ওপর বিগড়ে গেছে। তারা আমাদেরকে উত্যক্ত করা শুরু করলো। যাতে আমরা আল্লাহর ইবাদাতের পরিবর্তে পুনরায় মূর্তিদের পূজা করি এবং সেসব নাপাক বস্তু যাকে আমরা হালাল বানিয়ে রেখেছিলাম তাকে পুনরায় হালাল মনে করি। অবশেষে যখন তারা আমাদের ওপর কঠোরতা অবলম্বন ও নির্যাতন চালালো এবং আমাদেরকে স্বধর্মের ওপর আমল করা থেকে বিরত করার লক্ষ্যে দেশে জীবন ধারণই কঠিন করে তুললো, তখন আমরা (বাধ্য হয়ে) আপনার দেশে যাত্রা করি এবং সবকিছু পরিত্যাগ করে আপনাকে এবং আপনার প্রতিবেশীত্বকে পসন্দ করি ও আপনার আশ্রয়ে আসি—হে বাদশাহ! আমরা আপনার নিকট আশা করি যে, এখন এখানে আমাদের ওপর জুলুম হবে না।"

যুবকটির প্রভাবপূর্ণ বক্তৃতা শেষ হলো। দরবারে তখন পিনপতন নীরবতা। মনে হচ্ছিল যে, এই বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ দরবারীদের বুকে বিদ্ধ হয়ে গেছে। নাজ্জাশী যুবকটির প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ "সেই কালামের কোন অংশ কি তোমার স্মরণ আছে যা তোমাদের নবীর (সা) ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে বলে তোমরা বলে থাকো ?"

যুবক জবাব দিলো, "জ্বী, হ্যাঁ।"

বাদশাহ বললেন, "ঠিক আছে, তা আমার সামনেও পড় দেখি।"

যুবকটি অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ ভঙ্গিমায় সূরায়ে মারইয়াম পাঠ শুরু করলেন। তিনি কেবল প্রথম কয়েকটি আয়াতই পাঠ করেছিলেন। এমন সময় বাদশাহর ওপর ভাবাবেশ শুরু হয়ে গেল এবং তিনি এত কাঁদলেন যে, তার দাড়ি ভিজে গেল। তার পাদরীও এত কাঁদলো যে, তার সামনে যে সহিফা ছিল তাও ভিজে গেল। সে সময় বাদশাহর মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে এই বাক্য বের হয়ে গেল ঃ

"আল্লাহর কসম, এই কালাম এবং যে কালাম হযরত মূসা (আ) এনেছিলেন উভয়ই একই প্রস্রবণ থেকে উৎসারিত। আমি তোমাদেরকে অবশ্যই তাদের হাওয়ালা করবো না।"

তারপর তিনি কুরাইশের প্রতিনিধিদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"তোমরা এখান থেকে ফিরে যাও। আল্লাহর কসম, এটা কখনই হতে পারে না যে, আমি তাদেরকে তোমাদের হাওয়ালা করে দিব।"

এই পবিত্র ও নিভীর্ক যুবক যাঁর যাদুকরী বর্ণনা একটি বিরাট সাম্রাজ্যের শাসকের অন্তর বিগলিত করে ফেলেছিল এবং যিনি নিজের উদ্বাস্তু ভাইদের দিকে আগত অগ্নিশিখাকে ফিরিয়ে দিয়ে হাবশার সামগ্রিক পরিবেশ তাঁদের জন্য উপযুক্ত করে দিয়ে ছিলেন—তিনি ছিলেন হাশেমী বংশের দেদীপ্যমান প্রদীপ সাইয়েদেনা হযরত জা'ফর (রা) বিন আবি তালিব।

সাইয়েদেনা আবু আবদুল্লাহ জাফর (রা) বিন আবি তালিব মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর হসব নসব সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তিনি রহমতে আলমের (সা) চাচাতো ভাই এবং হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর বুজর্গ সহোদর ছিলেন। হযরত জা'ফর (রা) তাওহীদের দাওয়াতের প্রথম যুগের সেই সময় তাওহীদের ঝান্ডা উঁচু করে ধরার মর্যাদা লাভ করেছিলেন যখন কেবলমাত্র ৩১-৩২ জনের এই ভাগ্য হয়েছিল। ঘটনাটি এমনি ঘটেছিল, একদিন প্রিয় নবী (সা) হযরত আলীর (রা) সাথে নামায পড়ছিলেন। হযরত আবু তালিব নিজের ভাতিজার ও পুত্রের খুশু-খুজু অর্থাৎ একাগ্রতা দেখে খুব প্রভাবিত হলেন এবং জা'ফরকে (রা) বললেন, পুত্র, তুমিও চাচাতো ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে যাও। হযরত জা'ফর (রা) সঙ্গে সঙ্গে হুজুরের (সা) বামদিকে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযে তাঁর এমন আত্মিক মজা হলো যে, নিজের মন প্রাণ রাসূলে আ'রাবীর (সা) ওপর উৎসর্গ করে বসলেন এবং হুজুরের (সা) হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকামের গৃহে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করে ফেললেন। তাঁর স্ত্রী হযরত আসমা (রা) বিনতে আমিসও সেই সময়ই ঈমানের মর্যাদায় পূর্ণ হয়েছিলেন। নবুয়াতের চতুর্থ বছরের প্রথম দিকে হুজুর (সা) সাধারণ লোকদেরকে প্রকাশ্যে হকের পয়গাম শুনানো শুরু করলেন। তখন মক্কার মুশরিকদের ক্রোধ ও গোস্বার অগ্নিলাভা পূর্ণ শক্তিতে বিস্ফারিত হলো এবং তারা হকপন্থীদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের এক সীমাহীন ধারা শুরু করে দিল। হযরত জা'ফর (রা) ও তাঁর স্ত্রীও কাফেরদের নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। হযরত জা'ফরের (রা) আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি ছিল গভীর আকর্ষণ এবং কাফেররা তাঁর ইবাদাতে বাধা আরোপ করুক এটা তাঁর জন্য ছিল অসহনীয় ব্যাপার। নবুয়াতের পঞ্চম বছরের পর হাবশার মুহাজিরদের প্রথম কাফেলার রওয়ানার কিছু দিন পর হযরত জা'ফর (রা) একদিন প্রিয় নবীর (সা) খেদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন ঃ "হে

আল্লাহর রাসূল ! আপনি আমাকে এমন কোন দেশে চলে যাওয়ার অনুমতি দিন যেখানে নির্ভয়ে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তোমরাও হাবশা চলে যাও। সেটা শান্তির দেশ।"

বস্তুত হুজুরের (সা) ইরশাদ অনুযায়ী নবুয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের পর হযরত জাফর (রা) নিজের স্ত্রী সমভিব্যাহারে হাবশার মুহাজিরদের দ্বিতীয় কাফেলায় শামিল হয়ে হাবশা পৌঁছে গেলেন।

আল্লামা তাবারী, কাসতুলানী এবং অন্য আরো কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত জা'ফর (রা) হাবশা রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হুজুরের (সা) নিকট থেকে বিদায় নিতে এলেন। এ সময় তিনি তাঁকে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর নামে একটি পত্র দিলেন। পত্রে তাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পর এও লিখলেন যে, "আমি আমার চাচাতো ভাই জাফরকে অন্য কতিপয় মুসলমানদের সাথে তোমার নিকট প্রেরণ করছি। সে যখন তোমার নিকট আসবে তখন তার মেহমানদারী করবে।" পত্রের এই কয়েকটি ছত্র থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, হযরত জা'ফরের (রা) সাথে হুজুরের (সা) সম্পর্ক কত গভীর ছিল। তার কারণ হলো, হযরত জাফর (রা) পূর্ণ যৌবনকালে সব ধরনের ভয়ের মুখোমুখি সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর নবীর (সা) ফায়েজ লাভ থেকে কোন সুযোগই হাতছাড়া হতে দেননি। শুধুমাত্র নবুয়াতের প্রভাবের কারণেই তিনি ইলম ও ফজলের দিক থেকেই নয় বরং ইবাদাতের প্রতি শওক, যুহুদ ও আল্লাহভীতি এবং ত্যাগ ও পরমুখাপেক্ষী -হীনতার দিক থেকেও অত্যন্ত বুলন্দ মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন। এই গুণাবলীর জন্য হাবশার মুহাজিররাও তাঁকে অত্যন্ত ইজ্জত ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাঁর সঠিক মত ও বুদ্ধি এবং দুরদর্শিতার ওপর আস্থা রাখতেন। সুতরাং কুরাইশ প্রতিনিধিদল যখন নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে হকপন্থী উদাস্তুদের শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করলো তখন মুহাজিররা নিজেদের মুখপাত্র হিসেবে তাঁকেই নির্বাচিত করলেন এবং পুনরায় তিনি হকপন্থীদের মুখপাত্রের ভূমিকা এমন সুন্দরভাবে পালন করলেন যে, বিশ্ব হতবাক হয়ে গেল। হাবশার দরবারে তাঁর প্রভাবপূর্ণ বক্তৃতা মুহূর্তর মধ্যে বাতাসের গতি পরিবর্তন করে দিল। এই বক্তৃতা বা ভাষণ ইসলামের ইতিহাসের এমন এক অত্যুজ্জল অংশ যা পাঠ করে আজও নির্জীব অন্তরে ঈমানের উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে যায়।

কুরাইশ প্রতিনিধি দলের নাজ্জাশীর দরবারে প্রথম দিনের ব্যর্থতা তাদের আস্থা ও গর্বে প্রচন্ড ধাক্কা দিল। তবুও তারা নিরাশ হলো না এবং মুহাজিরদের ওপর আর একহাত নেয়ার সংকল্প গ্রহণ করলো। আমর ইবনুল আছ নিজের

সঙ্গীকে বললো, খোদার কসম ! কাল আমি এমন একটি কথা নাজ্জাশীকে বলবো যা তাদেরকে শেষ করে দেবে। তার কথাশুনে আবদুল্লাহ বিন রবিয়ার অন্তরে মুহাজিরদের জন্য দয়ার উদ্রেক হলো এবং সে বললো, "আমর, আরে বাদ দাও। তারা আমাদের বিরোধী হতে পারে। কিন্তু তবুও আমাদের সাথে তাদের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা আমাদের ওপর কিছু হকতো রাখে।"

আল্লাহর কি শান! সেই আমর ইবনুল আছ যিনি পরে ইসলামের একজন জানবাজ সিপাহী হয়েছিলেন। সে সময় স্বদেশী মুসলমানদের বিরোধিতায় এতোদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে, সে আবদুল্লাহ বিন রবিয়ার (রা) কথা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখান করলো এবং বললেন, "আল্লাহর কসম, আমিতো কাল নাজ্জাশীকে অবশ্যই বলবো যে, তারা ঈসা বিন মারইয়ামকে (আ) শুধুমাত্র মানুষ মনে করে।" সুতরাং পরের দিন সে অতি প্রত্যুষে নাজ্জাশীর নিকট পৌঁছলো এবং বললো ঃ

"জাঁহাপনা। এই লোকেরা আপনার পয়গাম্বর ঈসা (আ) ইবনে মারইয়ামের (আ) ব্যাপারে খুব খারাব কথা বলে থাকে। আপনি তাদেরকে একটু ডেকে জিজ্ঞেস করুন যে, তারা ঈসা (আ) ইবনে মারইয়ামকে (আ) কি মনে করে থাকে ?"

আমর ইবনুল আছের কথা শুনে নাজ্জাশী মুহাজিরদেরকে দ্বিতীয় বার ডেকে পাঠালেন। হযরত উম্মে সালমা (রা) সে সময় হাবশায় অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন, মুহাজিরদের জন্য সময়টা ছিল খুব কঠিন। কিন্তু তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যাকিছুই ঘটুক আমরা নাজ্জাশীর প্রশ্নের জবাবে হককথা ছাড়া কিছুই বলবো না। সুতরাং যখন তাঁরা নাজ্জাশীর দরবারে হাজির হলেন এবং সে প্রশ্ন করলো যে, তোমরা ঈসা (আ) বিন মারইয়ামের (আ) ব্যাপারে কি বলে থাকো ? এ সময় হযরত জা'ফর (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে নিশ্চিন্তে বললেন ঃ "হে বাদশাহ! আমরা তাঁর ব্যাপারে তাই বলি, যা আমাদের নবী (সা) আমাদেরকে বলেছেন। আমাদের নবী (সা) বলেন, তিনি আল্লাহর বান্দাহ এবং তার রাসূল এবং তার পক্ষ থেকে একটি রুহ ও একটি কালেমা আছে। যা আল্লাহ পবিত্র কুমারী সতি সাধ্বী মারইয়ামের (আ) ওপর ইলকা করেছেন।"

একথা শুনে নাজ্জাশী নিজের হাত মাটির দিকে প্রসারিত করলেন এবং একটি তংকা উঠিয়ে বললো, "আল্লাহর কসম, তুমি ঈসা (আ) বিন মারইয়ামের (আ) ব্যাপারে যা কিছু বলেছো তা এই তংকার সমানও বেশী কিছু বলোনি।"

নাজ্জাশীর কথা শুনে দরবারে উপস্থিত পাদরী বকাবকি করতে লাগলো। কিন্তু নাজ্জাশী বললো, "তুমি যতই বকাবকি কর, আল্লাহর কসম, যা বলা হয়েছে তাই সত্য কথা।" অতপর সে মুসলমানদেরকে বললো, "যাও, আমার দেশে তোমাদের সবধরনের নিরাপত্তা রয়েছে। যে তোমাদেরকে খারাব বলবে তার নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হবে। আমি যদি পাহাড় সমান সোনাও পাই তাহলে তার বিনিময়ে সামান্যতম বাড়াবাড়ীও সহ্য করতে পারি না।"

অতপর সে নিজের আমলাদেরকে কুরাইশ প্রতিনিধিদল প্রদত্ত উপঢৌকনাদি তাদেরকে ফেরত দানের নির্দেশ দিলেন। সে বললো, এসব উপঢৌকনের আমার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম যখন আমার দেশ আমাকে ফেরত দিয়েছিলেন তখন তিনিতো আমার নিকট থেকে কোন ঘুষ নেননি। এখন আমি আল্লাহর ব্যাপারে ঘুষ কেন নেব?

এমনিভাবে কুরাইশ প্রতিনিধি দলকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে হাবশা থেকে ফিরে যেতে হলো।

হাবশার হিজরত প্রসঙ্গে অন্য কতিপয় বর্ণনা হযরত জা'ফরের (রা) সত্য কথন ও নির্ভীকতার আরো কিছু ঘটনাও পাওয়া যায়। এক রেওয়ায়াতে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ বলেন যে, মুহাজিরদেরকে যখন নাজ্জাশী নিজের দরবারে তলব করলো তখন হযরত জা'ফর (রা) নিজের সঙ্গীদেরকে বললেন, আজ তোমাদের পক্ষ থেকে আমি কথা বলবো। সুতরাং সকলেই তাঁর পিছনে রওয়ানা দিল। হযরত জা'ফর (রা) দরবারে প্রবেশ করে সালাম করলেন এবং নিয়ম অনুযায়ী সিজদা করলেন না। তাতে দরবারীরা বিরক্ত হলো এবং বললো, "তুমি বাদশাহকে সিজদা কেন করনি?

হযরত জা'ফর (রা) বেধড়ক জবাব দিলেন ঃ "আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করি না।"

তারপর হযরত জা'ফর (রা) অত্যন্ত সুন্দরভাবে নাজ্জাশীর প্রশ্নসমূহের জবাব দিলেন। নাজ্জাশী তাঁর সুন্দর বক্তৃতায় এত প্রভাবিত হয়েছিল যে, সে পূর্ণ দরবারে বলেছিলেন ঃ "মারহাবা সেই সত্ত্বার, যার তরফ থেকে তোমরা এসেছ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তিনি সেই নবী যাঁর উল্লেখ ইন্‌জিলে এসেছে এবং যাঁর সম্পর্কে ঈসা (আ) মারইয়াম (আ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তোমাদের মন যেখানে চায় সেখানেই তোমরা নির্দ্বিধায় অবস্থান কর। আল্লাহর কসম, আমি যদি এই রাষ্ট্রের জঞ্জালে আবদ্ধ না হতাম তাহলে আমি তাঁর খিদমতে হাজির হতাম এবং তাঁর জুতা বহনের সৌভাগ্য লাভ করতাম।"

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে হযরত আবু মূসা আশয়ারীর বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং নাজ্জাশী হযরত জা'ফরকে (রা) জিজ্ঞেস করলো যে, তোমাকে কোন্ বস্তু আমার সামনে সিজদাবনত হতে নিষেধ করেছে।

তিনি নিঃসংকোচে জবাব দিলেন ঃ "আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করি না।"

তিবরানী (র) স্বয়ং হযরত জাফর (রা) বিন আবি তালিবের এই বর্ণনা নকল করেছেন, নাজ্জাশী ও আমাদের মধ্যে যখন সওয়াল-জওয়াব হলো তখন বাদশাহ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদেরকে কি কেউ এখানে বিরক্ত করে ? আমরা বললাম, "হা"। এতে বাদশাহ চারদিকে ঢোল-শহরত করার নির্দেশ দিলেন যে, কেউ মুসলমানদের উত্যক্ত করলে তার কাছ থেকে চার দিরহাম জরিমানা আদায় করে মজলুমকে দিতে হবে। অতপর সে জিজ্ঞেস করলো, "এই পরিমাণ জরিমানা কি যথেষ্ট ?" আমরা বললাম, না। ফলে সে জরিমানা দ্বিগুণ করে দিল। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, নাজ্জাশী হযরত জা'ফরের (রা) হাতে ইসলামের বাইয়াতও করেছিলেন।

এই ঘটনার পর মুসলমানরা অত্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে হাবশায় জীবন অতিবাহিত করতে লাগলো। কয়েক বছর পর (নবীর হিজরতের কিছুদিন পূর্বে) প্রায় ৪০ জন মুসলমান হাবশা থেকে মক্কা ফিরে গেলেন। কিন্তু হযরত জা'ফর (রা) মুসলমানদের একটি বড় দলের সাথে হাবশাতেই অবস্থান করতে লাগলেন। এমনকি তিনি উদ্বাস্তু জীবনের ১৩ বছর কাটিয়ে দিলেন। ইত্যবসরে মহানবী (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নেন এবং বদর ওহোদ এবং খন্দকের যুদ্ধ প্রভৃতিও শেষ হলো। ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে হুজুর (সা) খায়বারের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় হযরত জা'ফর (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরাও হাবশা থেকে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। হাফেজ ইবনে কাছির (র) "আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত জা'ফর (রা) হাবশা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বিদায়ী সালাম ও প্রথাগত অনুমতির জন্য নাজ্জাশীর সাথে দেখা করতে গেলেন। সে তাঁকে সওয়ারী এবং পাথেয় দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পয়গাম্বরে আরাবীর প্রতি তার সালাম পৌছানোর আবেদন জানালেন। সেই সাথে সে মহানবীকে (সা) একথাও বলতে বললেন যে, আমি একক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি তোমাদের সাথে এখানে যে আচরণ করেছি তাও যেন তাঁকে বলা হয় এবং এই আরজ করতে বললেন যে, তিনি যেন আমার মাগফিরাতের দোয়া করেন। তারপর সে হযরত জা'ফরকে (রা) আল্লাহ হাফেজ বলে বিদায় জানালেন।

হযরত জা'ফর (রা) নিজের সঙ্গীদের সাথে মদীনা মুনাওয়ারা পৌছলেন। তখন হুজুর (সা) খায়বারের যুদ্ধে তাশরীফ নিয়েছিলেন। সেই সব সাহাবীর এখন হুজুরের (সা) সাক্ষাত ছাড়া মদীনায় এক মুহূর্তও কাটানো মুশকিল ছিল। মহিলাদেরকে মদীনা রেখে সকল পুরুষ সোজা খায়বার পৌছলেন। সে সময় খায়বার বিজয় শেষ হয়েছিল এবং মুসলমানরা বিজয়ের উৎসব পালন করছিলেন। এমন সময় উদ্বাস্তু ভাইদেরকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে তাঁদের খুশী দ্বিগুণ হয়ে গেল। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা) হযরত জা'ফরকে (রা) দেখে মহাখুশী হলেন, আলিঙ্গন করে তাঁর কপালে চুমু খেলেন এবং বললেন ঃ

"খায়বার বিজয়েই আমি বেশী খুশী হয়েছি না জা'ফর আসার কারণে, তা আমি জানি না।"

তারপর হুজুর (সা) হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী অন্যান্য সকল সাহাবীর সাথে মুয়ানিকা করলেন এবং প্রত্যেককে আহলান সাহলান ওয়া মারহাবা বললেন।

হযরত আবু মূসা আশয়ারীও (রা) হাবশা থেকে হযরত জা'ফরের (রা) সঙ্গে এসেছিলেন। সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা যখন খায়বার বিজয়ের পর নবীর (সা) খিদমতে হাজির হলাম, তখন তিনি আমাদেরকে (হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী সাহাবীদেরকে) গনিমতের মালের অংশ দিলেন এবং অন্য কোন ব্যক্তিকে যারা এই লড়াইয়ে শরীক হয়নি তাদেরকে অংশ দেননি।

হযরত জা'ফর (রা) হুজুরকে (সা) নাজ্জাশীর সালাম পৌছালেন এবং মুহাজিরদের সঙ্গে তাঁর সদাচরণের কথাও বিস্তারিতভাবে জানালেন। অতপর তিনি নাজ্জাশীর সেই আবেদন হুজুরের (সা) নিকট পেশ করেলন যাতে তাঁর জন্য মাগফিরাত কামনার কথা বলা হয়েছিল। রহমতে আলম (সা) সেই সময়ই উঠলেন। ওজু করলেন এবং তিন বার এই দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ নাজ্জাশীকে ক্ষমা করো।" সকল মুসলমান হুজুরের (সা) দোয়ার সাথে উচ্চৈস্বরে 'আমীন' বললেন। তারপর হুজুর (সা) হযরত জা'ফর (রা) এবং অন্য মুসলমানদের সাথে মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন।

সপ্তম হিজরীর জিলকদ মাসে রহমতে আলম (সা) নিজের জান নিছারদের সঙ্গে ওমরাতুল কাজার জন্য মক্কা তাশরীফ নিলেন। এই পবিত্র সফরে হযরত জা'ফরও (রা) হুজুরের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। যেহেতু গত বছর হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় এই শর্ত স্থির করা হয়েছিলে যে, মুসলমান হাতিয়ার রেখে মক্কা

প্রবেশ করবে। এ জন্য মুসলমানরা নিজেদের সকল অস্ত্র মক্কা থেকে আটমাইল দূরে বাতান গ্রামে রেখে এসেছিলেন এবং একশ' সওয়ারের একটি দল তা হেফাজতের জন্য মোতায়েন করা হয়। অবশিষ্ট মুসলমান নিরস্ত্র অবস্থায় অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মক্কা প্রবেশ করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত জা'ফরও (রা) শামিল ছিলেন। প্রিয় নবী (সা) লাব্বাইক বলতে বলতে মসজিদে হারামে প্রবেশ করলেন। হাজরে আসওয়াদ চুমু দিলেন এবং তাওয়াফ করলেন। সাহাবায়ে কিরামও (রা) তাঁর অনুসরণ করলো। তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কুরাইশরা দাবী করলো যে, হুদায়বিয়ার চুক্তির শর্ত পূরণ হয়েছে। এ জন্য মুসলমানরা এখন মক্কা থেকে বের হয়ে যাক। হুজুর (সা) এই দাবী কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই মেনে নিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মক্কা খালি করে দিলেন। মক্কা থেকে চলে যাওয়ার সময় এক বিস্ময়কর প্রভাবে প্রভাবান্বিত দৃশ্য সামনে এলো। ওহোদের শহীদ হযরত হামযার (রা) এতিম মেয়ে ওমামা (রা) হে চাচা, হে চাচা এবং অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী ভাই, ভাই বলে ডাকতে ডাকতে হুজুরের (সা) দিকে দৌড়ালেন [হযরত হামযা (রা) হুজুরের (সা) চাচাও ছিলেন এবং দুধ ও খালাতো ভাইও ছিলেন। এই দিক থেকে উমামা (রা) তাঁর (সা) চাচার কন্যাও ছিলেন এবং ভাতিজীও] হযরত আলী (রা) তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং এনে হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার (রা) কাছে সোপর্দ করে দিয়ে বললেন, এ হলো তোমার চাচার কন্যা। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত জা'ফর (রা) এবং হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছাও পৃথক পৃথকভাবে উমামার (রা) দাবী পেশ করলেন। হযরত জা'ফর (রা) বলতেন যে, এহলো আমার চাচার কন্যা এবং তার আপন খালা [আসমা (রা) বিনতে আমিস] আমার স্ত্রী। হযরত যায়েদ (রা) বলতেন যে, হামযা (রা) হলেন আমার দ্বীনি ভাই। এ জন্য তার লালনপালনের দায়িত্ব আমার। এই গৌরব ও মুহাব্বাতের বিবাদ এমন সমাজে হচ্ছিল যে সমাজে ইসলামের পূর্বে মেয়ে শিশুদেরকে জীবিত দাফন করে ফেলা হতো। মহানবী (সা) সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে, উমামার (রা) অভিভাবকত্বের হকদার হলো জা'ফর (রা)। কেননা তাঁর গৃহে রয়েছেন উমামার (রা) খালা এবং খালা মায়ের মর্যাদার হয়ে থাকেন। সুতরাং হুজুরের (সা) ইরশাদ অনুযায়ী হযরত জা'ফর (রা) উমামা (রা) বিনতে হামযাকে (রা) নিজের গৃহে নিয়ে এলেন এবং স্ত্রীর [উমামার (রা) খালা] সোপর্দ করলেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সা) সুলতান ও আমিরদের নামে ইসলামের দাওয়াতের পত্রাদি প্রেরণ করলেন। এ সময় একটি তাবালগীপত্র হযরত হারিছ (রা) বিন উমায়ের ইয়াযদীর হাতে বসরার শাসকের নিকট পাঠালেন। এই

ব্যক্তি একটি আরব খান্দানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে এবং খৃস্টান রোমকদের পক্ষ থেকে বসরায় শাসন কাজ চালাচ্ছিল। হযরত হারিছ (রা) মাওতা নামক স্থানে পৌছলেন। তখন বালকার রইস শুরাহবিল বিন আমর গাসসানী তাঁকে শহীদ করে ফেললো। দূত হত্যা অত্যন্ত জঘন্য এবং অমানবিক অপরাধ ছিল। হুজুর (সা) তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনহাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী হযরত যায়েদ (রা) বিন হারেছার নেতৃত্বে পাঠালেন। এই বাহিনীতে হযরত জা'ফরও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় হযরত জা'ফর (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে এই আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার এটা আশা ছিল না যে, আপনি যায়েদকে (রা) আমার ওপর আমীর বানাবেন।"

হুজুর (সা) বললেন, "জা'ফর একথা রাখো। তুমি জানোনা যে, আল্লাহর নিকট উত্তম কি।"

বিশ্বনবী (সা) কিছু দূর পর্যন্ত ঐ বাহিনীর পেছনে পেছনে গেলেন এবং বিদায় জানানোর সময় বললেন যুদ্ধে যদি যায়েদ (রা) শহীদ হয়ে যায় তাহলে জাফর (রা) বাহিনীর আমীর হবেন। তিনিও শহীদ হয়ে গেলে আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা আনসারী নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন।"

এই ছোট বাহিনীর তৎপরতা সম্পর্কে বসরার শাসক জানতে পেলো। সে খুব জোরেশোরে এই বাহিনীর মুকাবিলার প্রস্তুতি নিলো এবং নিজের মিত্র গোত্রসমূহ মিলিয়ে একটি বিরাট বাহিনী একত্রিত করলো। ঘটনাক্রমে রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসও সেই এলাকায় তাঁবুতে অবস্থান করছিল। সে হাজার হাজার রোমক যোদ্ধাকে বসরার শাসকের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করলো। এমনিভাবে এক লাখ খৃস্টান আরব ও রোমক যোদ্ধা মুসলমানদের মুকাবিলায় এসে গেল। নিজেদের সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও মুসলমানরা সেই ভয়াবহ আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়লেন এবং মাওতার ময়দানে হক ও বাতিলের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো। মুসলমানরা জীবন দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু দুশমনের সংখ্যাধিক্য কোনক্রমেই কম হচ্ছিল না। যুদ্ধ যখন তুঙ্গে ঠিক সেই মুহূর্ত মুসলমান বাহিনীর আমীর হযরত যায়েদ (রা) বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত জা'ফর (রা) তাঁর শাহাদাতের সাথে সাথে সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলামের ঝাণ্ডা নিজের হাতে নিলেন এবং ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে তরবারী চালাতে চালাতে শত্রুব্যূহে ঢুকে পড়লেন। সে সময় তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিল একটি যুদ্ধগাথা। সেই যুদ্ধগাথার মর্মার্থ হলো। "জান্নাত কি সুন্দর! এবং তার নৈকট্য কতই না

প্রিয় ! এবং তার পানি খুব শীতল। রোমক তারা যাদের ওপর আজাবের সময় সন্নিকটবর্তী। এরা হলো কাফের এবং তাদের নসবনামায় গড়বড়ি আছে। আমার ওপর ফরজ ছিল যে, যখন তারা আমার সামনে আসবে তখন আমি তাদের ওপর আঘাত হানবো।"

কিন্তু তিনি আঘাতের ওপর আঘাত খেতে খেতে সামনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। সারা দেহ আঘাতে আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই অবস্থাতেও আল্লাহার যে দুশমন এই বাঘের সামনে আসছিল মুহূর্তের মধ্যেই সে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল। শেষে দুশমনরা তাঁর একটি হাত শহীদ করে ফেললো। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য হাত দিয়ে ঝান্ডা আকড়ে ধরলেন। অন্য হাতও কেটে গেল। এ সময় তিনি ইসলামের ঝান্ডা বুকের সাথে লাগিয়ে ধরলেন। এই অবস্থাতেই দুশমনের একটি বর্শা তাঁর সিনা পার হয়ে গেল এবং তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন তাঁর দেহের ওপর ৯০টির বেশী আঘাত ছিল। তাঁর শাহাদাতের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা ঝান্ডা তুলে নিলেন। তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ ঝান্ডা হাতে নিলেন এবং নিজের নজীর বিহীন বীরত্ব ও সামরিক নৈপুণ্যের বদৌলতে ইসলামী বাহিনীকে বাঁচালেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে জা'ফরের (রা) শাহাদাতের পর তাঁর লাশ আমি দেখলাম। তাতে ৯০টির বেশী আঘাত ছিল। এসব আঘাতের একটিও পিঠে ছিল না।

হাফেজ ইবনে কাছির (র), তিবরানী ও অন্য কতিপয় চরিতকার লিখেছেন যে, হযরত জা'ফর (রা) ছিলেন প্রথম সেই ব্যক্তি যিনি নিজের সওয়ারীর পশুর কুচ হকের পথে কেটেছিলেন।

সকল নেতৃস্থানীয় চরিতকার ও যুদ্ধ বিষয়ক ঐতিহাসিক মাওতার যুদ্ধ প্রসঙ্গে এই রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করেছেন যে, যে সময় মাওতার ময়দানে মুসলমান ও রোমকদের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছিল সে সময় বিশ্বনবী (সা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) একটি দলের মধ্যে মসজিদে নববীতে বসেছিলেন। হঠাৎ করে তিনি বলে উঠলেন ঃ

"যায়েদ ঝান্ডা হাতে নিল এবং সে শহীদ হয়ে গেল। তারপর জা'ফর (রা) ঝান্ডা ধরলো এবং সেও শহীদ হয়ে গেল। অতপর আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা ঝান্ডা তুলে নিল এবং সেও শহীদ হলো। এরপর আল্লাহর তরবারী-সমূহের মধ্য থেকে এক তরবারী ঝান্ডা উঁচু করে ধরলো।"

যুদ্ধের ময়দানের চিত্র যেন রাসূলের (সা) ঠিক সামনেই ছিল। এই ঘটনার ভিত্তিতে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ সাইফুল্লাহ্ বা আল্লাহর তরবারী উপাধিতে খ্যাতি অর্জন করেন।

সে সময় আল্লাহ্ তায়ালা যুদ্ধের ময়দান তাঁর দৃষ্টির সামনে এনে দিয়েছিলেন অথবা জিবরাইল আমিন (আ) তাঁকে মুহূর্তে মুহূর্তে খবর পৌঁছাচ্ছিলেন ; ঘটনা যাই হোক এ ব্যাপারে সকল চরিতকার একমত পোষণ করেন যে, হুজুর (সা) হযরত যায়েদ (রা), হযরত জা'ফর (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার শাহাদাতের খবর মাওতার মুজাহিদদের প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই লোকদেরকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন। সহীহ্ বুখারীতে আছে যে, হুজুর (সা) যে সময় নিজের মাহবুব জান নিছারদের শাহাদাতের খবর লোকদেরকে শুনালেন তখন তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রুরধারা ঝরছিল। আল্লামা ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, সে সময় হুজুর (সা) দাঁড়িয়ে প্রথম হযরত যায়েদ (রা), জা'ফর (রা) এবং আবদুল্লাহর (রা) গুণাবলী বর্ণনা করলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ্ যায়েদকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্ জা'ফরকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্, আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাকে মাফ করুন।"

হযরত জা'ফরের শাহাদাতের ঘোষণা দানের পর (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী তার পর্বে) হুজুর (সা) হযরত জা'ফরের (রা) গৃহে তাশরীফ নিলেন। সে সময় তাঁর স্ত্রী হযরত আসমা (রা) বিনতে আমিস আটা প্রস্তুত করে বাচ্চাদেরকে গোসল করিয়ে কাপড় পরিধান করাচ্ছিলেন। হুজুর (সা) বললেন, জা'ফরের (রা) সন্তানদেরকে আমার নিকট আনো। তিনি তাদেরকে হাজির করলেন। এ সময় হুজুর (সা)-এর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে পড়লো। তিনি তাদেরকে আদর করলেন। হযরত আসমা (রা) অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। জাফরের ব্যাপারে কোন খবর এসেছে কি ?"

হুজুর (সা) বললেন, হ্যাঁ, সে শহীদ হয়ে গেছে।

একথা শুনে হযরত আসমা (রা) চিৎকার দিয়ে উঠলেন। তাঁর কান্নাকাটির আওয়াজ শুনে মহল্লার মহিলারা তাঁর চারপাশে সমবেত হলেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তারপর মহানবী (সা) নিজের গৃহে গেলেন এবং আজওয়াজে মুতাহ্হিরাতকে বললেন, জা'ফরের বাচ্চাদের জন্য খাবার রান্না কর। আজ তার হুঁশ নেই। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, সাইয়েদাতুন নিসা হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রা) হযরত জা'ফরের (রা) শাহাদাতের খবর শুনে কাঁদতে কাঁদতে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। হুজুর (সা) বললেন ঃ "অবশ্যই জা'ফরের মত ব্যক্তির ব্যাপারে ক্রন্দনকারীনীদের কাঁদা উচিত।"

আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) লিখেছেন, হুজুর (সা) হযরত ফাতিমাকে (রা) বললেন যে, জা'ফরের (রা) বাচ্চাদের জন্য খাবার তৈরী কর। কেননা আজ আসমা (রা) শোকে দুঃখে অস্থির রয়েছে।

তৃতীয় দিন হুজুর (সা) পুনরায় হযরত জা'ফরের (রা) গৃহে তাশরীফ নিলেন এবং হযরত আসমাকে (রা) সবরের পরামর্শ দিলেন।

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে হযরত জা'ফরের (রা) পুত্র আবদুল্লাহ (রা) (সে সময় সে অল্পবয়স্ক ছিল) বর্ণনা করেন যে, আমার পিতার শাহাদাতের পর রাসূলে আকরাম (সা) আমাকে ও আমার ভাইদেরকে নিয়ে মসজিদে নববীতে তাশরীফ নিলেন এবং দরদ ও দুঃখ ভরা আওয়াজে মুসলমানদেরকে হযরত জা'ফরের (রা) শাহাদাতের খবর শুনালেন। অতপর তিনি আমাদেরকে নিজের সঙ্গে খাবার খাওয়ালেন। তিন দিন পর্যন্ত আমরা সেখানেই খাবার খেলাম এবং হুজুর (সা) আমাদের গৃহে নিয়মিত তাশরীফ আনতে লাগলেন।

হযরত জা'ফরের (রা) শাহাদাতের কিছু দিন পর হুজুর (সা) একদিন লোকদেরকে বললেন যে, জিবরাইল (আ) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা জা'ফরকে তাঁর কেটে যাওয়া দু'টি হাতের বিনিময়ে দু'টি নতুন বাহু দান করেছেন। এই নতুন বাহু সহযোগে সে জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে। অন্য আরেক রেওয়ায়াতে আছে, হুজুর (সা) বলেছেন, আমি জা'ফরকে জান্নাতে ফেরেশতাদের মত উড়তে দেখেছি। হুজুরের (সা) সেই ইরশাদ অনুযায়ী হযরত জা'ফর (রা) 'তাইয়ার' লকবে খ্যাত হয়ে যান। অন্য কতিপয় রেওয়ায়াতে তাঁর লকব তাইয়ারের পরিবর্তে 'জুল-জানাহাইন'ও বর্ণনা করা হয়েছে।

সাইয়েদেনা হযরত জা'ফর (রা) অত্যন্ত সুন্দর ও সুদর্শন এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা লিখেছেন যে, চেহারা সৌষ্ঠব ও অবয়বের দিক থেকে তিনি মহানবীর (সা) সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রাখতেন। শুধু সুরতেই নয় বরং সীরত ও কর্মনৈপুণ্যের দিক থেকেও তিনি নবী চরিত্রের এক সুন্দর উদাহরণ ছিলেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, স্বয়ং নবী করিম (সা) বলতেন, "জা'ফর তুমি সুরত ও সীরত উভয় দিক থেকেই আমার সাদৃশ্য রাখো।"

হযরত জা'ফর (রা) যদিও বিত্তবান ছিলেন না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বিরাট পাত্র দান করেছিলেন এবং তিনি নিজের প্রয়োজনের চেয়ে আসহাবে সুফফা ও অন্য গরীব মিসকিনের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতেন।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) (যিনি অন্যতম আসহাবে সুফফা ছিলেন) বলেন যে, জা'ফর (রা) বিন আবি তালিব মিসকিনদের জন্য খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি আমাদেরকে নিজের বাড়ী নিয়ে যেতেন এবং ঘরে যা থাকতো আমাদেরকে খাওয়াতেন। এমন কি ঘর থেকে মধু অথবা ঘি'র পাত্র বের করে নিয়ে আসতেন এবং (যখন তা শূন্য হয়ে যেতো) তা ভেঙ্গে ফেলতেন। পাত্রে যা লেগে থাকতো আমরা তা চেটে খেতাম।

হযরত জা'ফরের (রা) এই গরীব প্রীতি দেখে বিশ্বনবী (সা) তাঁকে "আবুল মাসাকিন" (মিসকিনদের অভিভাবক) বলতেন।

হাবশায় অবস্থানকালে হযরত আসমা (রা) বিনতে আমিসের গর্ভে হযরত জা'ফরের (রা) তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন ঃ আবদুল্লাহ (রা), মুহাম্মাদ (রা) এবং আওন (রা)। হযরত জা'ফর (রা) হাবশা থেকে ফিরে এসে নিজের যুবক পুত্র আবদুল্লাহকে (রা) হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। হুজুর (সা) মুচকি হেসে তাঁর বাইয়াত নিলেন এবং দোয়া করলেন। হযরত জা'ফরের শাহাদাতের পর হুজুর (সা) হযরত আবদুল্লাহর (রা) ওপর অসাধারণ স্নেহ প্রদর্শন করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) 'ইসাবা' গ্রন্থে লিখেছেন যে, একদিন হুজুর (সা) হযরত আবদুল্লাহর (রা) হাত ধরে দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! আবদুল্লাহকে জা'ফরের (রা) সঠিক স্থলাভিষিক্ত বানাও। তার বাইয়াতে বরকত দাও এবং আমি দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় স্থানেই জাফর পরিবারের অভিভাবক।"

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) ও তাঁর ভাই এতিম হয়ে গেলে মহানবী (সা) তাদের লালন পালন করতেন। হুজুরের (সা) ওফাতের পর এই দায়িত্ব তাদের আপন চাচা হযরত আলী (রা) নিজের কাঁধে তুলে নেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জা'ফর (রা) জওয়ান হলে হযরত আলী (রা) নিজের প্রাণপ্রিয় কন্যা যয়নবকে (রা) তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, কোন কোন সময় আমি চাচার [হযরত আলী (রা)] নিকট কিছু চাইলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করতেন। কিন্তু আমি যখন নিজের পিতাকে [জা'ফর (রা)] মাধ্যম দিয়ে কিছু চাইতাম তখন অবশ্যই কিছু না কিছু দিয়ে দিতেন। হযরত জা'ফরের (রা) বংশধারা হযরত আবদুল্লাহর (রা) মাধ্যমেই অব্যাহত ছিল। অন্য পুত্ররা সন্তানহীন অবস্থায় মারা যান।

হযরত জা'ফর (রা) হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছু দিন পরই শাহাদাত লাভ করেন। এ জন্য তাঁর হাদীস বর্ণনার সুযোগ হয়নি। অবশ্য ইবনে

আসাকির (র) তাঁর মুখ দিয়ে এক দীর্ঘ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এই বর্ণনায় তিনি নিজের হাবশা অবস্থান এবং সেখান থেকে মদীনা আগমনের ঘটনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হযরত জা'ফরের (রা) ইলম ও ফজল, সমঝ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ঈমানী আবেগ এবং সত্য কথনের উচ্চতর মানের আন্দাজ সেই বক্তৃতা থেকে খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায়, যা তিনি হাবশায় বাদশাহর দরবারে করেছিলেন। তারপর তিনি বিজ্ঞতার সাথে বাদশাহর প্রশ্নসমূহের জবাব দিয়েছিলেন। ফলে হাবশার বাদশাহর ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল এবং উদ্বাস্তু মুসলমানরা বছরের পর বছর হাবশায় শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন অতিবাহিত করতে পেরেছিলেন।

হযরত উমায়ের (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে সাহাবায়ে কিরাম (রা) দেখলেন যে, এক সবুজ সতেজ টগবগে কিশোর মুজাহিদদের ব্যুহসমূহের মধ্যে এদিক-ওদিক লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের দৃষ্টি তার ওপর পড়লো। তিনি তাকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং বললেন, "প্রাণের ভাইটি আমার ! এটা তুমি কি করছো ? কিশোর জবাব দিল, "ভাইয়া ! আমি আল্লাহর পথে লড়াই করতে চাই। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা আমাকে শাহাদাত নসিব করবেন। কিন্তু আশংকা হলো, প্রিয় নবী (সা) আমাকে ছোট মনে করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি যদি না দেন।"

হযরত সায়াদ (রা) কিশোরটির কথা শুনে চুপ মেরে গেলেন। হুজুর (সা) যখন নিজের জান নিছারদের ব্যুহ পরিদর্শন করলেন তখন কিশোরটির আশংকা সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। হুজুর (সা) তাঁকে বললেন, "বেটা ! তোমার বয়স এখনো যুদ্ধ করার মত হয়নি। এ জন্য তুমি ফিরে যাও।" হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে কিশোরটি কাঁদতে লাগলো এবং বার বার নিবেদন করে বলতে লাগলো যে, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাকে যুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুমতি অবশ্যই দেবেন। হয়তো আমি আল্লাহর পথে কাজে এসে যেতে পারি।"

মহানবী (সা) কিশোরটির ঈমানী জোশ ও শাহাদাতের আকাংখায় প্রভাবান্বিত হলেন এবং তাকে যুদ্ধে শরীক হওয়ার শুধুমাত্র অনুমতিই দিলেন না বরং নিজের পবিত্র হাতে তাঁর তরবারীও বেঁধে দিলেন।

এই ভাগ্যবান কিশোর যাঁর অন্তরে শাহাদাতের এমন আকাংখা ছিল, তিনি হলেন হযরত উমায়ের (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস। তিনি কুরাইশের বনু যোহরাহ খান্দানের প্রদীপ তুল্য ছিলেন এবং ইরাক বিজয়ী বীর হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের আপন ছোট ভাই ছিলেন। তার নসবনামা হলো ঃ

উমায়ের (রা) বিন মালিক (আবু ওয়াক্কাস) বিন ওয়াহিব বিন আবদি মান্নাফ বিন যুররাহ বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কা'ব বিন লুব্বী বিন গালিব বিন ফাহার।

নবুওয়াতের পর প্রথম যুগে যেসব পবিত্র নফসের মানুষ ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত উমায়েরের (রা) বড় দুই সহোদর হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস ও হযরত

আমের (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসও ছিলেন। উমায়ের (রা) সে সময় খুব কম বয়সী ছিলেন। কিন্তু যখন কিছু বুদ্ধি হলো, তখন বড় ভাইয়ের অনুসরণ করে তিনিও তাওহীদের পথে চলা শুরু করলেন এবং আল্লাহর পথে মাথা কাটানোর জন্য উদগ্রীব সময় কাটাতে লাগলেন। মক্কায় যখন হকপন্থীদের ওপর কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন চরম পর্যায়ে পৌছলো তখন মহানবী (সা) সাহাবীদেরকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। হযরত উমায়েরও (রা) ভাইদের সাথে হিজরত করে মদীনা পৌছলেন। নবীর (সা) হিজরতের কয়েক মাস পর হুজুর (সা) যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলেন তখন হযরত উমায়েরকে (রা) আওস সরদার হযরত সায়াদ (রা) বিন মায়াজ আশহালীর ছোট ভাই হযরত আমর (রা) বিন মায়াজের ইসলামী ভাই বানালেন।

রহমতে আলম (সা) বদরের যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন হযরত উমায়েরকে (রা) জিহাদের আকাংখায় অস্থির করে তুললো এবং তিনিও হুজুরের (সা) সফরসঙ্গী জান নিছারদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর অল্প বয়স্কতার প্রেক্ষিতে প্রিয়নবী (সা) তাকে যুদ্ধের অনুমতি দানের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন জিহাদের আকাংখা ও শাহাদাত কামনার আবেগে কান্নাকাটি শুরু করলেন তখন হুজুর (সা) তাঁকে লড়াইয়ে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়ে দিলেন। এমনিভাবে তিনি যেন সারা বিশ্বের নেয়ামতসমূহ লাভ করলেন। তরবারী চালাতে চালাতে দুশমনের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন এবং দীর্ঘক্ষণ যাবত লড়াই চালালেন।

কাফেরদের নামকরা অশ্বারোহী আমর বিন আবদি দাদ ; সে ছিল এক হাজার আরব বাহাদুরের সমান, সেও এই যুদ্ধে মুশরিকদের দলে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে হযরত উমায়েরের (রা) ওপর হামলা চালালো এবং ইসলামের এই তরতাজা যুবককে রক্তাক্ত তরবারী দিয়ে কেটে ফেললো (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) এমনিভাবে এই সবুজ সতেজ যুবক নিজের কাংখিত লক্ষ্যে পৌছে গেলেন। হযরত উমায়ের (রা) নিজের শাহাদাতের খুন দিয়ে ইতিহাসের পাতায় যে চিত্র এঁকে দিয়েছেন তা মিল্লাতের নওজোয়ানদের চিরকাল আলোর মশাল হিসেবে গণ্য হবে।

হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রা

আবু আমর আমের (রা) বিন ফুহায়রা ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রা) বৈপিত্রীয় ভাই তোফায়েল বিন আবদুল্লাহর গোলাম। বাহ্যিক অবয়বের দিক থেকে তিনি ছিলেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ হাবশী। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর স্বভাব বা প্রকৃতিকে এমন নূরানী ছাঁচে ঢালাই করেছিলেন যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন মক্কায় যেই রাসূলে আরাবী (সা) তাওহীদের প্রদীপ জ্বাললেন তখনই তিনি সেই প্রদীপের পতঙ্গ হয়ে গেলেন এবং হুজুরের (সা) দ্বারে আরকামে তাশরীফ নেয়ার পূর্বেই ঈমানের বৈভবে পূর্ণ হয়ে গেলেন।

মুশরিকরা এটা কি করে সহ্য করতে পারবে যে, একজন অসহায় গোলাম তাদের সামনে তাওহীদের কথা বলবে। তাদের ক্রোধ ও গোস্বার তুফান পূর্ণ শক্তির সাথে গিয়ে বিস্ফারিত হলো হযরত আমেরের (রা) ওপর। এমন কোন নির্যাতন ছিল না যা সেই হতভাগারা এই মরদে হকের ওপর চালায়নি। কখনো তাঁকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হতো। কখনো গরম বালি ও কাঁটার ওপর দিয়ে হেঁচরে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো। আমের (রা) যদিও কৃশকায় ছিলেন, কিন্তু তাঁর সিনায় ছিল ইস্পাতের হৃদয়। তিনি অত্যন্ত অটলতা ও ইসতিকলালের সাথে সকল মুসিবত বরদাশত করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর কদম হক পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি।

ঘটনাক্রমে একদিন সাইয়েদেনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁকে কাফেররা কাঁটা বিদ্ধ করছে এবং তাঁর দাড়ি ধরে থাপ্পড় মারছে—এমন অবস্থায় দেখতে পেলেন।সিদ্দিকে আকবার (রা) তাঁর ওপর এই জুলুম সহ্য করতে পারলেন না এবং তিনি সেই সময়ই তাঁকে কিনে আযাদ করে দিলেন। তারপর আমের (রা) ছিলেন। নবীর (সা) আস্তানায়। রাত-দিন শুধু একই চিন্তায় বিভোর থাকতেন যে, কি করে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

হিজরতের সময় রহমতে আলম (সা) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ছাওর গুহায় এলেন। এ সময় সিদ্দিকে আকবার (রা)-এর পরিবারের লোকজন ছাড়া হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রাও এই ভয়াবহ গোপন বিষয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। মহানবী (সা) ও সিদ্দিকে আকবারের (রা) নিকট তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, যে কোন অবস্থায় তাঁর ওপর আস্থা স্থাপন করা যায়। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রা সারা দিন (হযরত আবু বকরসিদ্দিকের) বকরী চরাতেন এবং সন্ধ্যায় তাদেরকে গুহার

মুখে নিয়ে আসতেন। সেখানে তাদের দুধ দুইয়ে বিশ্বনবী (সা) সিদ্দিকে আকবারকে খাওয়াতেন। তিন রাত ও তিন দিনের পর যখন বিশ্বনবী (সা) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ছাওর গুহা থেকে রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রাও তাদের সফরসঙ্গী হন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাকে নিজের উটের পেছনে বসালেন এবং এমনিভাবে হিজরতের সফরে তিনি মহানবীর (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। ইবনে সায়াদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, এই পবিত্র কাফেলা যখন কুবা এসে উপস্থিত হলো, তখন হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রাকে হযরত সায়াদ (রা) বিন খাইছুমা আনসারী নিজের মেহমান বানালেন।

মদীনা আগমনের কয়েক মাস পর হুজুর (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কায়েম করলেন। এ সময় হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রাকে হযরত হারিছ (রা) বিন আওসের ইসলামী ভাই বানান।

মক্কা এবং মদীনার আবহাওয়াতে অনেক তারতম্য ছিল। এ জন্য মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের প্রথমে মদীনার আবহাওয়া খাপ খায়নি। তাদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থদের মধ্যে হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর অসুস্থতা এত কঠিন আকার ধারণ করলো যে, তিনি জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়লেন। এই সময় তিনি বার বার একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন। তার মর্মার্থ হলো ঃ

আমি মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছি। অবশ্যই বুযদিলের মৃত্যু তার ওপরে।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের শক্তি অনুযায়ী চেষ্টা করে। যেমন, গরু নিজের শিং দিয়ে নিজের নাক হেফাজত করে।"

সহীহ বুখারীতে আছে, মহানবী (সা) মুহাজিরদের অসুস্থতার খবর পেয়ে দোয়া করলেন ঃ

হে আল্লাহ ! মদীনাকে আমাদের জন্য তুমি মক্কার মত অথবা তার থেকেও বেশী সুন্দর করে দাও এবং তাকে রোগ থেকে পবিত্র করে দাও।"

প্রিয় নবী (সা) দোয়া কবুল হলো মুহাজিররা সুস্থ হয়ে গেলেন এবং হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রাও রোগ শয্যা থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রা দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা, ভক্তি ও আল্লাহভীতি, কুরআনের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও রাসূল প্রেমের দিক থেকে একটি উদাহরণ

তুল্য মর্যাদা রাখতেন। রিসালাতের আলোকচ্ছটা তাঁর মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে এমনভাবে আলোকিত করেছিল যে, তিনি আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে গিয়েছিলেন। রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল এবং তাঁর সাধারণ ইঙ্গিতেই নিজের জীবন হক পথে কুরবানী করবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়। এ সময় হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রা তাতে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন এবং বাতিল পূজারীদের বিরুদ্ধে খুব বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

পরের বছর ওহোদের যুদ্ধেও প্রিয় নবীর (সা) সফরসঙ্গী হয়ে ছিলেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে মহানবী (সা) আবু বারা কিলাবীর দরখাস্তে ৭০ সাহাবীর একটি দল নজদের দিকে রওয়ানা করলেন। সেই দলের অধিকাংশ সদস্য আসহাবে সুফফার মধ্যে ছিলেন এবং কুররার (কুরআন পড়নেওয়ালা) লকবে মশহুর হয়েছিলেন। হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রাও সেই পবিত্র দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই সাহাবীরা যখন বিরে মাউনা নামক স্থানে পৌছলেন তখন বনু কিলাবের সরদার আমের বিন তোফায়েল গাদ্দারী করলো এবং রায়াল ও জাকাওয়ান গোত্রের মুশরিকদেরকে সঙ্গে নিয়ে সেই পবিত্র সাহাবীদের ওপর হামলা করেছিল। অথচ তাঁরা তাদের হেদায়াত ও মুক্তির পথ বলতে এসেছিলেন।

হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়াতাজ জুমরী ছাড়া সকল মরদে হক মুশরিকদের তরবারীর আঘাতের শিকার হলেন এবং শাহাদাতের পোশাক পরিধান করে জান্নাতে পৌছে গেলেন। হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রাকে জাব্বার বিন সালাম কিলাবী নামক এক ব্যক্তি শহীদ করে। যখন সে পূর্ণ শক্তিতে নিজের বর্শা হযরত আমরের (রা) পিছনে মারলো তখন তিনি পড়ে যেতে যেতে বললেন, 'ফুযতুওয়াল্লাহু' অর্থাৎ আল্লাহর কসম আমি সফল হয়েছি। সে সময় হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রার লাশ তড়পিয়ে আসমানের দিকে উত্থিত হলো এবং দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। জাব্বার বিন সালমা এই দৃশ্য দেখে প্রচন্ডভাবে বিস্মিত হলো এবং কুফুরের অন্ধকার তার অন্তর থেকে দূরীভূত হয়ে গেল।

ইবনে সায়াদের (রা) বর্ণনা হলো যে, জাব্বার বিন সালমা এই ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়াতা জুমরীকে মুশরিকরা জীবিত গ্রেফতার করে নিয়েছিল এবং তারপর আমের বিন

তোফায়েলের মায়ের মানতপূর্ণ করার জন্য তাঁকে মুক্তি দেয়। সে তাঁর সঙ্গে নিয়ে সাহাবাদের হত্যাস্থানে গেল এবং একটি লাশের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলো, এই লাশ কার ? হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া জবাব দিলেন আমের (রা) বিন ফুহায়রার। আমের বিন তোফায়েল বললো, আমি তাঁর হত্যার পর দেখলাম যে তাঁকে আসমানের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। এমনকি আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে লটকিয়ে রাখা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তারপর তাঁর লাশ জমিনের ওপর রেখে গেলেন।

উসুদুল গাব্বাহ্ গ্রন্থে হযরত উরওয়াহর (র) বয়ান উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, বিরে মাউনার শহীদদের মধ্যে হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রার লাশ অনুসন্ধান করা হলো। কিন্তু পাওয়া গেল না। তাতে লোকেরা ধারণা করলো যে, তাঁর লাশ ফেরেশতারা উঠিয়ে নিয়ে গেছে। মহানবী (সা) এই হৃদয়বিদারক ঘটনার খবর শুনে খুব দুঃখ পেলেন এবং তিনি চল্লিশ দিন পর্যন্ত ফজর নামাযের পর হত্যাকারীদের জন্য বদ দোয়া করেছিলেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, শাহাদাতের ঘটনার পর আমের (রা) বিন তোফায়েল কালাবী হযরত আমর (রা) উমাইয়া জুমরীকে জিজ্ঞেস করলো যে, তুমি কি তোমার সকল সাথীকে চেন ? তিনি বললেন, হাঁ। সকলকেই চিনি। সুতরাং আমের বিন তোফায়েল হযরত আমরকে (রা) সঙ্গে নিয়ে শহীদদের লাশের মধ্যে ঘুরতে লাগলো। হযরত আমরের (রা) নিকট প্রত্যেক শহীদের নাম ও নসব জিজ্ঞেস করা শেষ হলো ; তখন সে হযরত আমরকে (রা) জিজ্ঞেস করলো, তাদের মধ্যে কেউ কম আছে অথবা সবার লাশ মওজুদ আছে।

হযরত আমর (রা) বললেন, তাঁদের মধ্যে আমের (রা) বিন ফুহায়রার লাশ নেই। আমের বিন তোফায়েল জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের মধ্যে সে কেমন ব্যক্তি ছিল ? হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া বললেন ঃ তিনি আমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে আফজাল এবং আমাদের নবীর (সা) অন্যতম প্রাথমিক যুগের সাহাবী ছিলেন।

একথা শুনে আমের বিন তোফায়েল জাব্বার বিন সালমার দিকে ইশারা করে বললো যে, সে তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করেছিল। যখন বর্শা তার দেহ থেকে টান দিয়ে বের করে তখন এক ব্যক্তি নিহত ব্যক্তিকে উঠিয়ে আকাশের দিকে নিয়ে গেল। তারপর আমি তাকে দেখিনি। হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, তিনি হলেন আমের (রা) বিন ফুহায়রা।

আমের (রা) বিন ফুহায়রার হত্যাকারী জাব্বার বিন সালমা থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি যখন আমের (রা) বিন ফুহায়রাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করি তখন তিনি বলে উঠলেন, 'ফুযতু ওয়াল্লাহি'। আমি এই কথার মর্ম বুঝতে পারলাম না। সুতরাং আমি জাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান কালাবীর নিকট গেলাম। তিনি ছিলেন রাসূলের (সা) পক্ষ থেকে বনু কিলাবের রাজস্ব আদায়কারী। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, 'ফুযতু ওয়াল্লাহি' বলে নিহত ব্যক্তি কি বুঝাতে চেয়েছিল। জাহহাক (রা) বলেন, তার মর্মার্থ ছিল এই যে, এভাবে শাহাদাত পেয়ে আমি জান্নাত লাভ করেছি এবং আমি জীবনের লক্ষ্যে সফল হয়েছি। অতপর জাহহাক (রা) আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিলাম। কিন্তু আমার ইসলাম গ্রহণের আসল কারণ সেই ঘটনা যা আমি আমের (রা) বিন ফুহায়রার শাহাদাতের পর স্বচক্ষে দেখেছিলাম।

শাহাদাতের সময় হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রার বয়স ছিল বিভিন্ন মত অনুযায়ী ৩৪ অথবা ৪০ বছর। তিনি কোন সন্তান রেখে যাননি। তার জীবন সর্বকালেই হকপন্থীদের জন্য আলোকবর্তীকা হয়ে থাকবে।

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা)
–মাহবুবে রাসূল (সা)

একাদশ হিজরীতে রহমতে দো আলম (সা) নিজের ওফাতের কিছু দিন পূর্বে সীরিয় সীমান্তের দিকে প্রেরণের জন্য একটি বাহিনী তৈরী করলেন। সাতশ' মুজাহিদ সমন্বয়ে গঠিত এই বাহিনীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহ, হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত সাইদ (রা) বিন যায়েদ ছাড়া আরো অনেক মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কিরাম (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা সকলেই শাহাদাতের আবেগে পূর্ণ ছিলেন। কিন্তু যখন মহানবী (সা) সেই বাহিনীর নেতৃত্বের জন্য আঠারো উনিশ বছরের এক যুবককে নির্বাচিত করলেন তখন কিছু ব্যক্তি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন যে, একজন নওজোয়ান মুজাহিদকে প্রথম যুগের মুহাজিরদের ওপর অফিসারীর দায়িত্ব কি করে দেয়া হলো। হুজুর (সা) তাঁদের বিস্ময় প্রকাশের খবর জানতে পেরে অসুস্থতা সত্ত্বেও মাথায় পট্টি বেঁধে পবিত্র আবাসস্থল থেকে বাইরে তাশরীফ আনলেন এবং মিম্বরে বসে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেনঃ

"হে মানুষেরা ! তোমরা এই অভিযানের নেতার ব্যাপারে যা কিছু বলেছ তা আমি শুনেছি। এটা কোন নতুন কথা নয়। এর পূর্বে তোমরা তার পিতার ব্যাপারে এমন কথাই বলেছিলে। আল্লাহর কসম, সেও অফিসারীর যোগ্য ছিল। তারপর তার পুত্রও অফিসারীর যোগ্য। সে আমার খুব প্রিয় ছিল এবং এও সকল ধরনের উত্তম ধারণার যোগ্য। এ জন্য তোমরা তার সাথে উত্তম আচরণ করবে। সে তোমাদের উত্তম মানুষদের অন্যতম।"

হুজুরের (সা) পবিত্র ইরশাদ লোকদেরকে হতভম্ব করে ফেললো এবং তারা চেঁচিয়ে বলে উঠলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার সিদ্ধান্তে রাজী আছি এবং এই নওযোয়ানের নেতৃত্ব সকলেই মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে।" এই সৌভাগ্যবান যুবক যাঁর ব্যাপারে সাইয়েদুল মুরসালিন ফখরে মওজুদাত খাইরুল আনাম (সা) পূর্ণ সমাবেশে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, সে অফিসারের যোগ্য এবং সব উত্তম ধারণার উপযুক্ত ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলমান। তিনি ছিলেন হযরত উসামা (রা) বিন যায়েদ (রা)।

সাইয়েদেনা হযরত উসামা (রা) বিন যায়েদ (রা) জালিলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর কুনিয়ত আবু মুহাম্মাদও ছিল।

আবার আবু যায়েদও। তিনি বনু কাজায়ার শাখা বনু কালাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

হযরত উসামার (রা) পিতা হযরত যায়েদ (রা) বিন হারেছা সেই একক সাহাবী যাঁর নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত যায়েদ (রা) মহানবীর (সা) আযাদকৃত গোলাম, মুখে ডাকা পুত্র এবং সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী চার ব্যক্তিত্বের একজন ছিলেন। তাঁর জীবন উৎসর্গের আবেগ ও অন্য গুণাবলীর ভিত্তিতে হুজুর (সা) তাঁকে এত ভালোবাসতেন যে, তিনি "হিব্বে রাসূলুল্লাহ'র [রাসূলের (সা) প্রিয়] লকবে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত উসামার (রা) মাতা বারকাতা (রা) যিনি ইতিহাসে নিজের কুনিয়ত উম্মে আইমান নামে খ্যাত। তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) শৈশবকালে খাইয়েছিলেন। এ জন্য হুজুর (সা) তাঁকে খুবই তাজিম ও শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁকে 'আমিন' বলে সম্বোধন করতেন।

আল্লামা ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন, হযরত উসামা (রা) নবুয়তের সপ্তম বছরের পর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। মাতা-পিতা উভয়েই রিসালাত (সা) প্রদীপের পতঙ্গ ছিলেন এবং সাইয়েদুল আনাম (সা) তাঁকে নিজের পরিবারের সদস্য হিসেবে মনে করতেন। এ জন্য হযরত উসামা (রা) প্রথম দিন থেকেই ইসলামের বরকত পূর্ণ পরিবেশে লালিত-পালিত হন। হাফেজ ইবনে হাজার (র)-এর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি ইসলাম ছাড়া আর কিছুই জানতেন না।

নবুয়তের চতুর্দশ বছরে বিশ্বনবী (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নেন। সে সময় হযরত উসামার (রা) বয়স প্রায় সাত বছর ছিল। তিনি মাতা হযরত উম্মে আইমানের (রা) সঙ্গে মক্কাতেই মুকিম রলেন। অবশ্য তাঁর পিতা হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরের শেষদিকে হুজুরের (সা) ইঙ্গিতে হিজরত করে মদীনা চলে গিয়েছিলেন। নবীর (সা) হিজরতের কয়েক মাস পর হুজুর (সা) হযরত যায়েদকে (রা) মক্কা প্রেরণ করলেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা) এবং হুজুরের (সা) দুই কন্যা হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রা) ও হযরত উম্মে কুলছুম (রা) ছাড়া হযরত উম্মে আইমান (রা) ও হযরত উসামাকেও (রা) নিজের সঙ্গে মদীনা নিয়ে গেলেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, হযরত উসামা (রা) রাসূলের (সা) সাথেই হিজরতের মর্যাদা লাভ করেন। কিন্তু এই রেওয়ায়াত সঠিক নয়। হিজরতের সফরে হুজুরের (সা) সফর সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা শুধু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত আমের (রা) বিন ফুহায়রারই লাভ হয়েছিল। রিসালাতের প্রথম যুগের যুদ্ধসমূহের সময় হযরত উসামা (রা) অল্প বয়স্ক ছিলেন। তিনি এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণের আকাংখী ছিলেন। কিন্তু অল্প বয়স্ক

হওয়ার কারণে হুজুর (সা) অনুমতি দেননি। তবুও তাঁর স্নেহের ছায়া হযরত উসামার (সা) ওপর সবসময়ই ছিল। হুজুরের (সা) দৌহিত্র হযরত হাসান (রা) তৃতীয় হিজরীতে এবং সাইয়েদেনা হযরত হোসাইন (রা) চতুর্থ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের পূর্বের বছর হযরত আয়েশা সিদ্দিকাও (রা) নবীর (সা) হারেমে এসেছিলেন। এরা সকলেই হুজুরের (সা) খুব প্রিয় ছিলেন। কিন্তু তিনি (সা) নিজের মুহাব্বাত ও স্নেহে হযরত উসামাকেও (রা) সবসময় শরীক করতেন। তিনি যদিও ১০-১১ বছরের হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নবীর (সা) গৃহে স্বাধীনভাবে যাতায়াত করতেন। হুজুর (সা) কখনো কখনো স্নেহ বশত তাঁর সাথে কৌতুকও করতেন। তাবকাতে ইবনে সায়াদে আছে, একবার হযরত উসামা (রা) নবী (সা) গৃহে বসেছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হুজুর (সা) হযরত উসামার (রা) দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে দিলেন এবং হযরত আয়েশাকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আয়েশা, এ যদি মেয়ে হতো তাহলে আমি তাকে খুব করে গহনা পরাতাম এবং খুব করে সাজাতাম। তাতে তার রূপ ও সৌন্দর্যের শোহরত হতো এবং বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ তার সম্পর্কের জন্য পয়গাম প্রেরণ করতো।"

একবার হযরত উসামা (রা) দরজার চৌকাঠ লাফ দিয়ে পার হতে গিয়ে পড়ে গেলেন এবং তাঁর মাথা থেকে রক্ত পড়তে লাগলো। হুজুর (সা) হযরত আয়েশা সিদ্দিকাকে (রা) তার রক্ত পরিষ্কার করে দেয়ার কথা বললেন। তিনি রক্তে দুর্গন্ধ অনুভব করলেন। এ সময় তিনি স্বয়ং উঠে তা পরিষ্কার করে দিলেন এবং ক্ষতের ওপর নিজের মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন।

মুসনাদে আহমদে স্বয়ং হযরত উসামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (সা) আমাকে ধরতেন এবং নিজের রানের ওপর বসাতেন। তারপর হযরত হাসান (রা) বিন আলীকে (রা) ধরতেন এবং নিজের বাঁ রানের ওপর বসাতেন। অতপর আমাদের দু'জনকে মিলিয়ে দোয়া করতেন।

"হে আল্লাহ! আমি এই দু'জনের ওপর রহম করে থাকি। তুমিও তাদের ওপর রহম কর।"

সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুজুর (সা) ওজু করতেন। এ সময় হযরত উসামার (রা) অধিকাংশ সময় পানি ঢেলে দেয়ার সৌভাগ্য লাভ ঘটতো। হুজুর (সা) অধিকাংশ সময় সফরেও তাঁকে সঙ্গে রাখতেন।

বনু মুসতালিকের যুদ্ধের সময় ইফকের দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। তাতে আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং অন্য কতিপয় লোক হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রা) ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল। এই তোহমত আরোপে স্বাভাবিকভাবেই হুজুর (সা) দুঃখ পেয়েছিলেন। যদিও উম্মুল মু'মিনীনের নিরাপরাধ হওয়াটাই যথার্থ ছিল। তবুও অপবাদ রটনাকারীদের মুখ বন্ধ করার জন্য তদন্ত প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তিনি এই প্রসঙ্গে কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা সাহাবীর (রা) সাথে পরামর্শ করলেন। তাদের মধ্যে ১২ বছর বয়স্ক উসামাও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেহেতু নবীর (সা) আবাসগৃহে তিনি নিজের বাড়ীর মত আসা-যাওয়া করতেন। এ জন্য তাঁর রায় বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার ছিল। হযরত উসামা (রা) অত্যন্ত সত্যবাদী ছিলেন। তিনি খুব জোরেশোরে হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রা) পবিত্র হওয়া এবং উঁচু মর্যাদার সাক্ষ্য দিলেন। সাথে সাথে হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন যে, আপনি একটুও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং অপবাদ রটনাকারীদের মিথ্যার পর্দা ছিড়ে ফেলবেন।

হযরত উসামার (রা) কিয়াস সঠিক বলে প্রমাণিত হলো এবং সূরা তাওবার আয়াত নাযিল হলো। যাতে উম্মুল মু'মিনীনের (রা) পবিত্রতার স্বীকৃতি দেয়া হলো।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, নবীর (সা) নিকট হযরত উসামার (রা) যে বৈশিষ্ট্য ছিল তার ভিত্তিতে মুনাফিকরা তাঁকে খুব হিংসা করতো এবং তাঁর নসবে তোহমত আরোপ করতো। হুজুর (সা) পর্যন্ত তাদের কথাবার্তা পৌঁছতো। তাতে তিনি খুব দুঃখ পেতেন। সেই যুগে একদিন আরবের এক মশহুর মুখের ভাব দেখে স্বভাব বর্ণনাকারী মাযরাজ মাদালজী (অথবা আসলামী) হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলো। সে সময় হযরত উসামা (রা) নিজের পিতা হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছার সাথে এক চাদরের নীচে শুয়েছিলেন। উভয়ের পা অবশ্য চাদরের বাইরে ছিল। মাযরাজ পা দেখে বললো, এই পা একে অন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। একথা শুনে হুজুর (সা) খুব খুশী হলেন। হাসতে হাসতে হযরত আয়শার (রা) নিকট তাশরীফ নিলেন এবং বললেন, তুমি শুনে থাকবে যে মাযরাজ ঠিক এক্ষুণি উসামা (রা) ও যায়েদের (রা) পা দেখে বললো যে, এরা একে অপর থেকে সৃষ্টি। হাদীসের ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন যে, হুজুরের (সা) খুশী হওয়ার কারণ এইটাই ছিল যে, মাযরাজ যা বলেছিল তাতে হিংসাকারীদের মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেননা তাদের কাছে স্বভাব বর্ণনাকারীদের কথা ইলহামের মর্যদা রাখতো। নচেৎ হুজুরের (সা) শান বা মর্যাদা তার থেকে অনেক বুলন্দ ছিল।

হযরত উসামার (রা) বয়স ১৪ বছর হলে হুজুর (সা) তাঁকে যয়নব (রা) বিনতে হানজালার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা হলো না এবং উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তারপর হুজুর (সা) তাঁর শাদী হযরত নুয়াইম বিন আবদুল্লাহর আন-নাহহাম আদবীর কন্যার সঙ্গে দিলেন। তাঁর গর্ভে ইবরাহীম বিন উসামা (রা) জন্মগ্রহণ করেন। একবার হযরত দাহিয়া কালবী (রা) কাতান কাপড় হুজুরকে (সা) হাদিয়া হিসেবে দিলেন। তিনি তা হযরত উসামাকে (রা) দিয়ে দিলেন। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কাতান কেন পরিধান করো না। তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তা স্ত্রীকে দিয়ে দিয়েছি।" তিনি বললেন, "ঠিক আছে। তাহলে তুমি তাকে বলে দিও যে, নীচে যেন সিনা বন্ধ পরিধান করে। নচেৎ শরীর দেখা যাবে।" একবার জি এযেন শিরক অবস্থায় একটি মূল্যবান হুল্লা প্রেরণ করলো। তিনি (সা) বললেন, আমি মুশরিকের হাদিয়া কবুল করি না। কিন্তু আমি এখন তোমার নিকট থেকে মূল্য দিয়ে নিচ্ছি। সুতরাং ৫০ দিনার দিয়ে কিনে নিলেন এবং তা একদিন পরিধান করে হযরত উসামাকে (রা) দিয়ে দেন।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে খায়বার জয় হলো। তখন হুজুর (সা) হযরত উসামার (রা) জন্য ভাতা ঠিক করে দিলেন। এই ভাতা ছিল সেই জমির এক অংশের ফল ও উৎপাদিত ফসল। খায়বার বিজয়ের পর হুজুর (সা) সেই জমি ফায় হিসেবে পেয়েছিলেন। এই জমির ব্যবস্থাপনার জন্য উসামা (রা) প্রায়ই সেখানে যেতেন।

হযরত উসামার (রা) বয়স ১৫ বছর হলে হুজুর (সা) তাঁকে এক বিশেষ অভিযানের আমীর বানিয়ে হুরকা (হুরকাতে জাহিনাতে) প্রেরণ করেন। ইতিহাসে এই অভিযান সারিয়্যায়ে হুরকা (হুরকাত) নামে মশহুর রয়েছে। এই অভিযানে অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি একটি ভুল করে বসেছিলেন। সারা জীবন তিনি তাতে আফসোস ও লজ্জা প্রকাশ করতেন। সহীহ বুখারীতে স্বয়ং তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে হুরকা প্রেরণ করলেন। সকালে দুশমনের সাথে মুকাবিলা হলো। এ সময় তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। আমি এবং অন্য একজন আওতায় এসে গেল তখন কালেমায়ে শাহাদাত পড়তে লাগলো। ফলে আমার সাথী হাত গুটিয়ে নিল। কিন্তু আমি তাকে হত্যা করে ফেললাম। আমরা যখন মদীনা ফিরে এলাম এবং হুজুর (সা) এই ঘটনা জানতে পেলেন তখন তিনি আমাকে বললেন, "উসামা, তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ। অথচ সে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ছিল।"

আমি আরজ করলাম ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! সে শুধু মাত্র জীবন বাঁচানোর জন্য এমন করেছিল।"

হুজুর (সা) আমার ওজর প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বারবার এই ইরশাদ পুনর্ব্যক্ত করতে লাগলেন যে, তুমি এক ব্যক্তিকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়া সত্ত্বেও কতল করে ফেলেছ। তাতে আমি এত লজ্জিত হলাম যে, মনে মনে বলতে লাগলাম ঃ "হায় ! আমি যদি আজকের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করতাম।"

এই সারিয়্যাহ বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী সাত অথবা আট হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উসামার (রা) হাতে নিহত ব্যক্তির নাম ছিল মিরদাস বিন নাহিক।

অষ্টম হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে মক্কা বিজয় হলো। তখন হযরত উসামার (রা) রহমতে আলমের (সা) ঘোড়ার পেছনে চড়ার মহান মর্যাদা লাভ হয়েছিল। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুজুর (সা) মক্কা মুয়াজ্জামা বিজয়ের পর বাইতুল্লাহ প্রবেশ করলেন। তখন হযরত উসামা (রা) হুজুরের (সা) সওয়ারীর (উটনী) ওপর তাঁর পেছনে বসেছিলেন এবং হযরত ওসমান (রা), হযরত তালহা (রা) ও হযরত বিলাল (রা) তাঁর পাশে ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর হুজুর (সা) সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য মক্কা মুয়াজ্জামায় অবস্থান করলেন। এ সময় এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল। সহীহ বুখারীতে আছে যে, বনু মাখযুমের এক মহিলা (কতিপয় রেওয়ায়াতে যার নাম বলা হয়েছে ফাতিমা বিনতে আসওয়াদ) চুরির অপরাধ করে বসলো [ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী সে কারোর গহনা চুরি করেছিল অথবা হুজুরের (সা) আবাসস্থল থেকে একটি চাদর চুরি করেছিল] এবং তাকে ধরা হলো। বনু মাখযুমের লোকজন ঘাবড়ে গিয়ে হযরত উসামার (রা) নিকট পৌছলেন এবং তাঁর নিকট দরখাস্ত করলো যে, তিনি যেন রাসূলের (সা) নিকট সেই মহিলার জন্য সুপারিশ করেন। হযরত উসামা (রা) তাদের কথা মেনে নিলেন এবং হুজুরের (সা) কাছে সেই মহিলার ব্যাপারে রেয়ায়েত করার আশা করলেন। হযরত উসামাকে (রা) হুজুর (সা) খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু আল্লাহর হদের ব্যাপার ছিল। এ জন্য হযরত উসামার (রা) কথা শুনে হুজুরের (সা) পবিত্র চেহারা মলিন হয়ে গেল এবং তিনি বললেন ঃ "উসামা, তুমি কি আমার নিকট আল্লাহর কায়েমকৃত হদের ব্যাপারে (রেয়ায়েত বা কনসেশনের) কথা বলো ?"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত উসামা (রা) কেঁদে উঠলেন এবং আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমার জন্য মাগফিরাত কামনা করুন।" সন্ধ্যা হলে হুজুর (সা) খুতবা দানের জন্য দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর হামদ ও ছানার পর বললেন ঃ

"পূর্বেকার লোকেরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছিল যে, যখন তাদের মধ্যেকার কোন শরীফ ব্যক্তি (আমীর) চুরি করতো তখন তাকে ছেড়ে দিত এবং যখন তাদের মধ্যকার কোন সাধারণ মানুষ চুরি করতো তখন তার ওপর হদ জারি করতো। সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের (সা) জীবন রয়েছে মুহাম্মাদের (সা) কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করতো তাহলে আমি তার হাত কেটে দিতাম।"

সুতরাং সেই মহিলার ওপর হদ জারী করা হলো এবং তার হাত কেটে দেয়া হলো। তারপর তার জীবনে সম্পূর্ণ বিপ্লব এসে গেল এবং সে অত্যন্ত পরহেজগারী ও দৃঢ়তার সাথে নিজের তাওবাকে বাস্তবায়ন করলেন।

একাদশ হিজরীতে প্রিয় নবী (সা) নিজের ওফাতের কিছু দিন পূর্বে হযরত উসামাকে (রা) সেই বাহিনীর অফিসার নিয়োগ করলেন। এই বাহিনী নিয়োগেরও উদ্দেশ্য ছিল। একতো মাওতার যুদ্ধের (অষ্টম হিজরীতে) প্রতিশোধ গ্রহণ। এই যুদ্ধে হযরত উসামার (রা) পিতা হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা ছাড়া হযরত জা'ফর (রা) বিন আবি তালিব, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা এবং আরো কয়েকজন সাহাবী শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছিলেন। দ্বিতীয়ত সিরিয়া সংলগ্ন সীমান্ত ফিতনা-ফাসাদ থেকে মাহফুজ রাখা। কিছু মানুষ তাঁর নেতৃত্বের জন্য বিস্ময় প্রকাশ করলে হুজুর (সা) তা অপসন্দ করলেন এবং তিনি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও বাইরে তাশরীফ এনে অত্যন্ত জোরদার ভাষায় হযরত উসামার (রা) নেতৃত্বের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করলেন। তারপর তিনি নিজের পবিত্র হাত দিয়ে হযরত উসামাকে (রা) ঝান্ডা প্রদান করলেন এবং বাহিনীকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেই বাহিনী মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে জুরুফ নামক স্থানে তাবু ফেললেন। সেই সময় হুজুরের (সা) অসুস্থতা কঠিন রূপ ধারণ করলো। হযরত উসামা (রা) খবর পেয়ে অস্থির চিত্তে তক্ষণি মদীনা ফিরে এলেন এবং হুজুরের (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর মুবারক কপালে চুম্বন দিলেন। হুজুর (সা) চুপচাপ ছিলেন। তবুও তিনি দোয়ার জন্য দস্তে মুবারক উঠালেন এবং হযরত উসামার ওপর রাখলেন। তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হলেন এবং জুরুফ চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। সে সময় তিনি কিছুটা সুস্থবোধ করছিলেন। তিনি হযরত উসামাকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি ফিরে গিয়ে সৈন্য বাহিনীকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তখনো জুরুফ থেকে রওয়ানা হয়ে পারেনি। এ সময় মদীনায় হুজুরের (সা) অসুস্থতা গুরুতর রূপ ধারণ করলো। হযরত উসামার (রা) মাতা হুজুরের (সা) পাশেই ছিলেন। তিনি হাশেমী খান্দানের অনেক ব্যক্তির শেষ সময় দেখেছিলেন।

হুজুরের (সা) অসুস্থতায় এমন কিছু লক্ষণ পেলেন যাতে তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, হুজুর (সা) এই নশ্বর জগত থেকে বিদায় নিচ্ছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একব্যক্তিকে এই পয়গাম দিয়ে হযরত উসামার (রা) নিকট প্রেরণ করলেন যে হুজুর (সা) আমাদের থেকে বিচ্ছেদের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তুমি কালবিলম্ব না করে মদীনা ফিরে এসো। হযরত উসামা যেই এই হৃদয়বিদারক খবর পেলেন তখনই তিনি অন্য কতিপয় সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে জুরুফ থেকে মদীনা মুনাওয়ারা এসে পড়লেন। হুজুর (সা) ওফাত পেলেন। এ সময় হযরত উসামার (রা) ওপর যেন কিয়ামত নেমে এলো! তবুও খুব ধৈর্য ধারণ করলেন এবং অত্যন্ত তৎপরতার সাথে হুজুরের (সা) কাফন ও দাফনের কাজে শরীক হলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত উসামা সেই সব সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যাঁরা রাসূলে পাকের পবিত্র দেহ কবরে নামানোর সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। হুজুরের (সা) ওফাতের খবর শুনে সমগ্র বাহিনী জুরুফ থেকে মদীনা এসে গিয়েছিল এবং এই অভিযান মুলতবী হয়ে গেল।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক খিলাফতের মসনদে আসীন হলেন। তিনি বাইয়াতের দ্বিতীয় দিনেই উসামা বাহিনীকে প্রস্তুতিসহ মনযিলে মকসুদের দিকে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। খলিফাতুর রাসূলের (সা) পক্ষ থেকে ঘোষক ঘোষণা দিলেন, "উসামা বাহিনীর তৈরী হয়ে যাওয়া উচিত। তাকিদ দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এই অভিযানে যাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে তাদের কেউই যেন মদীনায় না থাকে এবং সকলেই স্ব স্ব তাঁবুতে জুরুফে গিয়ে একত্রিত হয়।"

বাহিনী জুরুফে একত্রিত হওয়া ও রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন স্থান থেকে আরব গোত্রসমূহের ধর্মদ্রোহী হয়ে যাওয়ার খবর অব্যাহতভাবে আসতে লাগলো। এসব খবরে সাধারণ মুসলমানরা খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। মহানবীর (সা) তিরোধানের হৃদয়বিদারক দুঃখ তখনো তাজা ছিল। এই অবস্থায় তাঁরা দেখলো যে, ধর্মদ্রোহীদের সংখ্যা বিরাট এবং উসামা বাহিনীর সংখ্যা সেই তুলনায় খুবই কম। এ অবস্থায় তারা উসামা বাহিনীকে মদীনাতেই থাকার কথা চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। হযরত আবদুল্লাহর বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে যে, সে সময় মুসলমানদের অবস্থা ছিল বকরীর সেই পালের মত যে পাল বৃষ্টির মধ্যে শীতে খোলা মাঠে রাখাল ছাড়া থাকে।

এসব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কতিপয় বুজর্গ সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিদমতে আরজ করলেন যে, যাঁরা উসামার (রা) বাহিনীর সঙ্গে যাচ্ছেন তাঁরা মুসলমানদের বাছাই করা ব্যক্তি। এদিকে ধর্মদ্রোহিতা যে

দ্রুতগতিতে আরবে সম্প্রসারিত হচ্ছে তাও আপনি খুব ভালোভাবে জানেন। এই অবস্থায় মদীনা থেকে উসামা বাহিনীর গমন হবে ঐক্যকে বিশৃংখলায় পার্যসিত করার নামান্তর। এই অভিযান পরবর্তী কোন সময়ের জন্য মুলতবী রাখাটাই উত্তম হবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ছিলেন আস্থা ও অটলতার শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব। যে অভিযান রওয়ানার জন্য স্বয়ং রাসূলে করিম (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই অভিযান বন্ধ করাটাকে তিনি কোনক্রমেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি জবাব দিলেন, "সেই সত্ত্বার কসম, যার কব্জায় আমার জীবন রয়েছে। আমি যদি এটাও ধারণা করতাম যে, হিংস্রজন্তু আমাকে থাবা দিয়ে যাবে তবুও রাসূলের (সা) নির্দেশ পালনে উসামা (রা) বাহিনী অবশ্যই প্রেরণ করতাম। বস্তিতে যদি আমি ছাড়া এক ব্যক্তিও অবশিষ্ট না থাকতো তবুও আমি উসামা (রা) বাহিনীকে অবশ্যই পাঠাতাম।"

তারপর সাধারণ সমাবেশে সেই বিষয়ে এক প্রভাবপূর্ণ ভাষণ দিলেন এবং সৈন্য প্রস্তুতির তাকিদ দিলেন। সুতরাং হযরত বুরাইদা (রা) বিন হাসিব আসলামী ঝান্ডাসহ জুরুফ পৌছে গেলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যও যেখানে একত্রিত হলো। এই অভিযানে যেতে হযরত উসামার (রা) কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আশংকা ছিল। তিনি মনে করেছিলেন, তার গমনের পর দুশমন মদীনার ওপর হামলা করে বসবে। এ জন্য তিনি জুরুফ থেকে হযরত আবু বকরের (রা) নিকট পয়গাম প্রেরণ করলেন। তাতে তিনি বললেন যে, রওয়ানার পর দুশমন মদীনার ওপর হামলা করে বসতে পারে বলে তার ভয় রয়েছে। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে এই অভিযান মুলতবী করে সৈন্যসহ মদীনা চলে আসতে পারি।

রাসূলের (সা) খলিফা তাঁকেও সেই জবাব দিলেন যা অন্যদেরকে দিয়েছিলেন। ইত্যবসরে আনসাররা হযরত ওমর ফারুকের (রা) মাধ্যমে হযরত আবু বকর সিদ্দিককে (রা) একটি পয়গাম প্রেরণ করলেন। তাতে বলা হলো যে, আপনি যদি সৈন্য বাহিনী রওয়ানা করতেই চান তাহলে উসামার (রা) পরিবর্তে অন্য কোন অভিজ্ঞ সাহাবীকে (রা) আমীর নিয়োগ করুন। হযরত ওমর ফারুক (রা) আনসারদের পয়গাম হযরত আবু বকর সিদ্দিককে (রা) শুনালেন তাতে তিনি ক্রোধে অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"ইবনে খাত্তাব, উসামাকে (রা) স্বয়ং রাসূলে আকরাম (সা) আমীরে লশকর নিয়োগ করেছেন। কিন্তু তুমি আমাকে এই পয়গাম দিচ্ছ যে, তার পরিবর্তে অন্য কাউকে আমীর নিয়োগ করবো।"

এই জবাবের পর তিনি স্বয়ং জুরুফ তাশরীফ নিলেন এবং বাহিনীকে রওয়ানার নির্দেশ দিলেন। সৈন্য বাহিনী রওয়ানা হলো। এ সময় হযরত উসামা (রা) ঘোড়ার ওপর সওয়ার ছিলেন এবং সিদ্দিকে আকবার (রা) পদব্রজে সাথে সাথে চলছিলেন। তাঁর ঘোড়ার লাগাম হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের হাতে ছিল। হযরত উসামা (রা) আরজ করলেন, "হে খলিফাতুর রাসূল! আপনিও সওয়ার হোন অথবা আমাকে পায়ে হেটে চলার অনুমতি দিন।" ইরশাদ হলো, "না আমার সওয়ার হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। না তোমার পায়ে হেটে যাওয়ার দরকার আছে। আমার পায়ে যদি কয়েক মুহূর্তের জন্য আল্লাহর পথে মাটি লাগে তাহলে আমার মর্যাদা কতদূর বৃদ্ধি পাবে। গাজী আল্লাহর পথে যে পা রাখে তার বিনিময়ে সাতশ' নেকী আমলনামায় লিখা হয়ে থাকে। সাতশ' গুনা মাফ হয় এবং সাতশ' দরজা বুলন্দ করা হয়।"

তারপর সিদ্দিকে আকবার (রা) উসামা (রা) বাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে ১০টি নসিহত করছি। তা ভালোভাবে স্মরণ রেখো। খিয়ানত করবে না। ধোঁকা দেবে না। আমীরের নাফরমানী করবে না। কোন লোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটবে না। কোন শিশু, বৃদ্ধ অথবা মহিলাকে হত্যা করবে না। কোন ফলবান বৃক্ষ কাটবে না। অথবা জ্বালাবে না। বকরী, গাভী অথবা উট খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া জবেহ করবে না। তোমরা এমন মানুষ পাবে যারা ইবাদাতখানাতে নির্জনত্ব অবলম্বন করে আছে। তাদের সাথে বাদানুবাদ করবে না। তোমরা এমন মানুষও পাবে যারা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য তোমাদের সামনে পেশ করবে। এ খাবার খেয়ে (আল্লাহকে ভুলে যেও না) আল্লাহর শুকর আদায় করবে এবং তোমরা এমন এক জাতিও পাবে যাদের মাথার চুল মাঝখানে মুন্ডন করা থাকবে। তাদেরকে চাবুক মারবে। এখন আল্লাহর নাম নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাও। আল্লাহ তোমাদেরকে দুশমনের অস্ত্র ও প্লেগ থেকে রক্ষা করুন।"

এই ভাষণ শোনার পর উসামা (রা) বাহিনী মনযিলে মাকসুদ পানে রওয়ানা হয়ে গেল। সে সময় রাসূলের (সা) ওফাতের পর মাত্র ১৯ দিন অতিবাহিত হয়েছিল। হযরত উসামা (রা) সিরিয়ার ভূমিতে দূর পর্যন্ত বিজয় সূচক হামলা করতে করতে আবনী (খানুজ যাইত) পর্যন্ত পৌছে গেলেন এবং কিছুদিন দামেস্কের নিকট আল-মুযযা নামক স্থানে অবস্থানের পর মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে এলেন। এই অভিযানে ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী ৪০ দিন অথবা তা থেকে কিছু বেশী সময় ব্যয় হয়েছিল। প্রত্যাবর্তনের পূর্বে হযরত উসামা (রা) বিজয়ের সুসংবাদ মদীনা প্রেরণ করেন। তাতে মুসলমানদের মধ্যে খুশীর বন্যা বয়ে গেল। কেননা এই বিজয় শুধু মাওতার যুদ্ধের জবাবই ছিল না বরং সিরিয়া পাদানত করার পটভূমিও ছিল।

উসামা (রা) বাহিনী খুব শানশওকতের সাথে মদীনা ফিরে এলো। তখন আগে আগে হযরত বুরাইদা (রা) বিন হাছিব ঝান্ডা উড়িয়ে আসছিলেন এবং তার পিছনে হযরত উসামা (রা) সৈন্য বাহিনীকে সাথে নিয়ে মাওতার শহীদ নিজের পিতা হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছার ঘোড়া সাবহার ওপর সওয়ার হয়ে আসছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) মুহাজির ও আনসারের সঙ্গে মদীনার বাইরে বেরিয়ে সেই বিজয়ী বাহিনীকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানালেন। হযরত উসামা (রা) মদীনায় প্রবেশ করেই মসজিদে নববীতে গেলেন এবং দু'রাকায়াত নামায পড়লেন। তারপর বাড়ী গেলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ১৯ বছর।

হযরত উসামা (রা) মহানবীর (সা) খুবই প্রিয় ছিলেন। এ জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং অন্য সাহাবায়ে কিরামও (রা) তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন যে, একাদশ হিজরীর জিলকদ মাসে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) মুরতাদ বিদ্রোহী গোত্রদেরকে উৎখাতের জন্য আল-আবরাক তাশরীফ নিলেন। তখন তিনি মদীনায় হযরত উসামাকে (রা) নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত উসামাকে (রা) এত বেশী ভালোবাসতেন যে, নিজের সন্তানদের চেয়ে তাঁকে অগ্রাধিকার দিতেন। ইবনে আছির 'উসুদুল গাব্বাতে' লিখেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের খিলাফতকালে সকল সাহাবীর (রা) ভাতা ঠিক করেন। এ সময় হযরত উসামার (রা) ভাতা তিন হাজার এবং নিজের পুত্র হযরত আবদুল্লাহর (রা) ভাতা আড়াই হাজার নির্ধারণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) অভিযোগ করলেন যে, আমি কোন যুদ্ধে উসামা (রা) থেকে কখনো পিছনে ছিলাম না এবং আপনি তার পিতা যায়েদ (রা) থেকে পিছনে ছিলেন না। কিন্তু আমার ভাতা আপনি তাঁর থেকে কম নির্ধারণ করেছেন।

হরত ওমর ফারুক (রা) জবাব দিলেন, "সে রাসূলের (সা) নিকট তোমার চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল এবং তাঁর পিতা তোমার পিতার চেয়ে রাসূলের (সা) বেশী প্রিয় ছিলেন।"

এই ঘটনার পর হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও সবসময় হযরত উসামাকে (রা) খুব শ্রদ্ধা করতেন। এমনকি তাঁর সন্তানদেরকেও খুব ভালোবাসতেন। হযরত উসামার (রা) ওফাতের কয়েক বছর পর একদিন তিনি মসজিদে নববীর (সা) এক কোণায় এক পবিত্র সুরতের এক যুবককে দেখলেন এবং অযাচিতভাবে তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি

হলো। পাশেই আবদুল্লাহ বিন দিনার (র) বসেছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই যুবকটি কে ? এক ব্যক্তি বললেন ঃ "আবু আবদুর রহমান আপনি কি তাকে চিনেন না। এ হলো উসামা (রা) বিন যায়েদের পুত্র মুহাম্মাদ (র)।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) একথা শুনে ঘাড় নীচু করলেন এবং হাত দিয়ে মাটি তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। তারপর বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) যদি তাকে দেখতেন তাহলে তাকেও ভালোবাসতেন।

হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে (শেষার্ধ) ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তখন হযরত উসামা (রা) নির্জনত্ব অবলম্বন করলেন। তা সত্ত্বেও সবসময় অন্তরে দেশ ও মিল্লাতের কল্যাণ কামনায় উন্মুখ থাকতেন। এ জন্য মাঝে মধ্যে হযরত ওসমানকে (রা) একাকী উত্তম পরামর্শ দিতেন। কিন্তু বাস্তবত ও প্রকাশ্যে কোন তৎপরতায় অংশ নেননি। হযরত ওসমান গনির (রা) শাহাদাতের পরও তিনি সেসব সংঘর্ষ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন যা হযরত আলী (রা) ও আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

হযরত উসামার (রা) ওফারেত সময় নিয়ে মতবিরোধ আছে। কোন রেওয়ায়াতে তাঁর মৃত্যুকাল ৫৪ হিজরী বলা হয়েছে। আবার কোন রেওয়ায়াতে ৫৮ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মৃত্যুর সময় তিনি জুরুফে মুকিম ছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারাতে দাফন করা হয়।

হযরত উসামার (রা) দু'টি বিয়ের কথা ওপরে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়াও তিনি জীবনে কয়েকজন মহিলাকে বিয়ে করেন। তাঁদের নাম হলো, দুররাহ.বিনতে আদি (তাঁর গর্ভে মুহাম্মাদ ও হিন্দা জন্ম গ্রহণ করেন), উম্মে হাকাম বিনতে উতবা, ফাতেমা (রা) বিনতে কায়েস [তাঁর গর্ভে জাবির, যায়েদ ও আয়েশা (র) জন্ম গ্রহণ করেন], বিনতে আবি হামদান সাহমী, বুরযাহ বিনতে রাবয়ী [তাঁর গর্ভে হাসান (র) ও হোসাইন (র) জন্মগ্রহণ করেন]।

বিশ্বনবীর (সা) ইন্তেকালের সময় হযরত উসামার (রা) বয়স কেবলমাত্র ১৮ অথবা ১৯ বছর ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি নবীর (সা) ফয়েজ লাভের যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেছিলেন। এ জন্য ইলম ও ফজলের দিক থেকে অনেক উঁচু মর্যাদায় আসীন ছিলেন। তাঁর থেকে ১২৮টি হাদীস বর্ণিত আছে। এসব হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আব্বাস (রা), আবু ওসমান নাহদী, আবু ওয়ায়েল এবং খাজা হাসান বসরীর (র) নাম উল্লেখযোগ্য।

ফাজায়েল ও আখলাকের দিক থেকে হযরত উসামার (রা) মর্যাদা অনেক উঁচুতে। মহানবীর (সা) প্রশিক্ষণ তাঁকে একজন উদাহরণযোগ্য মর্দে মু'মিন

বানিয়ে দিয়েছিল। নিজের প্রতিটি কথা ও কাজে হুজুরের (সা) উসওয়ায়ে হাসানা সামনে রাখতেন। এ জন্য মানুষও তাঁর আমলকে নিজেদের জন্য নমুনা হিসেবে মনে করতেন।

আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল। তিনি বছরের পর বছর ধরে হুজুরের (সা) ইবাদাত দেখেছিলেন। এ জন্য বেশী বেশী ইবাদাত করাকে অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন। শেষ বয়সেও যখন তাঁর দেহের শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল তখনো সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। একদিন তাঁর গোলাম বললেন, এই রোযা তো ফরজ নয়। এ জন্য আপনি এই বার্দ্ধক্যের সময়ও তা পালন কেন করেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ দু'দিন রোযা রাখতেন।

হযরত উসামার (রা) মা হযরত উম্মে আইমানের (রা) ব্যাপারে কতিপয় চরিতকার লিখেছেন যে, তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) খিলাফত-কালে ওফাত পান। কিন্তু ইবনে সায়াদ (র) মুহাম্মাদ বিন সিরিন (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতকালেও জীবিত ছিলেন এবং হযরত উসামা (রা) তাঁর সন্তুষ্টি ও মনঃতুষ্টির জন্য সামান্যতম অবহেলাও করতেন না। একবার তিনি হযরত উসামার (রা) নিকট খেজুর বৃক্ষের মাথি খাওয়ার ফরমায়েশ করলেন। সে সময় খেজুর বৃক্ষের মূল্য ছিল খুব চড়া এবং এক একটি বৃক্ষের দাম ছিল এক হাজার দেরহাম। হযরত উসামা (রা) একটি বৃক্ষের মাথি বের করলেন। লোকজন বললো, এত মূল্যবান বৃক্ষ আপনি কেন বরবাদ করছেন? তিনি জবাব দিলেন, মা'র ফরমায়েশ পূরণ করছি। তিনি যা ইচ্ছা করেন, আমি যেভাবেই হোক তা পূরণের জন্য চেষ্টা করে থাকি।

হযরত শামমাছ (রা) বিন ওসমান মাখযুমী

ওসমান বিন শুরাইদ (বিন হারমী বিন আমের বিন মাখযুম) মাখযুমী কুরাইশের অন্যতম বিত্তবান মানুষ ছিলেন এবং মক্কার সরদার রবিয়া বিন আবদি শামছের জামাতা ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে পুত্র সন্তান দান করলে তার নাম নিজের নাম অনুসারে ওসমানই রাখে। কিন্তু আল্লাহ পাক এই নবজাতকের এত রূপ দিয়েছিলেন যে, লোকজন তাকে শামমাছ (সূর্যালোক) বলে ডাকতে লাগলো। এমন কি কারোর তার আসল নাম স্মরণই রলো না।

শামমাছের তখন শৈশবকাল। এ সময় স্নেহময় পিতার ছায়া তার ওপর থেকে উঠে গেল। মাতা সুফিয়া বিনতে রবিয়ার ওপর কিয়ামত আপতিত হলো। কিন্তু শামমাছের (রা) মামা উতবা বিন রবিয়া বিধবা বোন ও ইয়াতিম ভাগনের মাথার উপর স্নেহের হাত রাখলো এবং তাঁকে ওসমান বিন শুরাইদের অভাব খুব কমই অনুভূত হতে দিল। শামমাছ মামা এবং মায়ের ছায়াতলে যৌবনে পদার্পণ করলেন। তাঁর ছিল কালো চমকপূর্ণ চুল, মতির মত স্নিগ্ধ সাদা দাঁত, রং ছিল গোরা, নাক লম্বা, প্রশস্ত চোখ, চেহারা ছিল অতি সুন্দর। তাঁর সুরত দেখে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত। মা ও মামা উভয়েই শামমাছের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল এবং তারা তাকে অত্যন্ত আদর ও যত্নে লালিত পালিত করেন। একবার মক্কায় এক সুদর্শন খৃস্টান (অথবা অগ্নি উপাসক)-এর আগমন ঘটলো। লোকদের মধ্যে তার রূপের চর্চা হতে লাগলো। এ সময় উতবা একদিন নিজের ভাগনের (শামমাছ)-কে তার পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিল এবং লোকদেরকে বললো, একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো যে, আমার ভাগনের রূপ ও সৌন্দর্য বিদেশীর থেকে বেশী কিনা? উভয়কে একত্রে দেখে মক্কাবাসীর চোখ খুলে গেল। শামমাছের রূপ ও সৌন্দর্যের সামনে বিদেশীর রূপের কোন পাত্তাই ছিল না। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, ওসমান বিন ওসমান সেই দিন থেকেই শামমাছ উপাধিতে মশহুর হয়ে যান। এ উপাধি এত মশহুর হলো যে, লোকজন তার আসল নামই ভুলে গেল।

শামমাছের (রা) বয়স তখন ১৯ কিম্বা ২০ বছর ছিল। রহমতে আলম (সা) দাওয়াতে হক প্রদানের কাজ শুরু করলেন। আল্লাহ তায়ালা শামমাছকে রূপের সাথে গুণ বা সুন্দর চরিত্রও দান করেছিলেন। তাঁর কানে যেই মাত্র তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছলো তৎক্ষণাৎ তিনি নির্ভাবনায় সেই দাওয়াতে সাড়া

দিলেন। মা-ও অত্যন্ত নেকবখত মহিলা ছিলেন। তিনিও সৌভাগ্যবান পুত্রের সাথে ইসলামের নিয়ামতে পূর্ণ হয়ে গেলেন। উতবা বিন রবিয়া বোন ও ভাগনেকে খুব করে বুঝালো। তাঁদেরকে বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ না করার পরামর্শ দিল। কিন্তু তাঁরা উভয়েই যে সরল ও সঠিক পথে রওয়ানা দিয়েছিলেন তা থেকে মুখ ফিরালেন না। তা থেকে মুখ ফিরানো তারা কোন অবস্থাতেই সহ্য করলেন না।

সময়টা ছিল খুবই ভীতিকর। হকের দাওয়াত কবুল করার অর্থই ছিল মুসিবতের জালে আটকে পড়ার নামান্তর। কুরাইশের মুশরিকরা মুসলমানরা শান্তিতে কাটাক তা কোনক্রমেই বরদাশত করতে পারতো না। ইসলামের দাওয়াতের যতই বিস্তৃতি ঘটতে লাগলো তাদের ক্রোধ-বহ্নি আরো তীব্র হতে লাগলো। জুলুম-নির্যাতনের সকল ধরনের অস্ত্র ও মাধ্যম তারা হকপন্থীদের ওপর পরীক্ষা করেছিল। তাদের নির্যাতনের হাত থেকে সুফিয়া (রা) বিনতে রবিয়া এবং শামমাছও (রা) রক্ষা পেলেন না। কাফেরদের নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন রাসূলে আকরাম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) হাবশার দিকে হিজরতের অনুমতি দিয়ে দিলেন। হযরত শামমাছও (রা) মা'সহ অন্যান্য মুসলমানের মত হিজরত করে হাবশা চলে গেলেন এবং কয়েক বছর সেখানে অবস্থান করে উদ্বাস্তু জীবনের মুসিবত সহ্য করতে থাকলেন।

হাবশার মুহাজিরদের মধ্যকার একটি দল হযরত জাফর তাইয়ার (রা) বিন আবি তালিবের সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধ পর্যন্ত হাবশাতেই ছিলেন। অবশ্য ইবনে ইসহাকের (রা) রেওয়ায়াত অনুযায়ী চল্লিশ জন মুসলমান বিভিন্ন সময়ে মহানবীর (সা) মদীনা হিজরতের পূর্বে মক্কা ফিরে আসেন। এই প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে হযরত শামমাছ (রা) এবং তাঁর মা'ও ছিলেন। কিন্তু মক্কা ফিরে আসার অল্প দিন পরই মদীনা হিজরতের অনুমতি দেয়া হলো। হযরত শামমাছ (রা) তখন মা'সহ মদীনায় হিজরত করলেন। এমনিভাবে তাঁরা দুই হিজরতকারীর মর্যাদা পেয়ে গেলেন।

হযরত শামমাছ (রা) মদীনা মুনাওয়ারাতে হযরত মুবাশ্‌শির (রা) বিন আবদুল মানযার আনসারীর মেহমান হলেন। হিজরতের কয়েক মাস পর মহানবী (সা) যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলেন তখন হযরত শামমাছকে (রা) গাসিলুল মালায়েকা হযরত হানজালা (রা) বিন আবি আমের আনসারীর ইসলামী ভাই বানালেন।

দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন হযরত শামমাছ (রা) সেই তিনশ' তের জন জীবন উৎসর্গকারীর মধ্যে শামিল

ছিলেন—যাঁরা কুফুরীর ভীতিপ্রদ আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে ময়দানে নেমে পড়েছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে তাঁর আপন দুই মামা উতবা বিন রবিয়াহ এবং শাইবা বিন রবিয়াহ বিরোধী ব্যূহে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু হযরত শামমাছের (রা) নিকট হক পথে পার্থিব আত্মীয়তার সম্পর্ক কোন তাৎপর্যই বহন করতো না। তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে এমন আবেগ ও আত্মহারা হয়ে যুদ্ধ করলেন যে, জানবাজীর হক আদায় করে ছাড়লেন।

তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত ওহোদের যুদ্ধেও অত্যন্ত আবেগ ও উচ্ছাসের সঙ্গে অংশ নেন এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি হঠাৎ ভুলের কারণে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে এবং রাসূলের (সা) নিকট শুধুমাত্র কয়েকজন জাননিছার রয়ে গিয়েছিলেন। এ জান নিছারদের মধ্যে হযরত শামমাছও (রা) ছিলেন। কাফেররা বারংবার প্রিয় নবীর (সা) উপর হামলা করছিলো এবং তাঁর জান নিছাররা তাদেরকে তরবারীর আঘাতে পিছু হটিয়ে দিচ্ছিলেন। মহানবীকে (সা) ভীতিজনক অবস্থায় দেখে হযরত শামমাছের (রা) দেহে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠলো। তিনি রাসূলের (সা) ডাইনে-বামে, আগে ও পিছে ঘুরছিলেন এবং তাঁর তরবারী নিরাপত্তাহীন বিদ্যুত হয়ে কাফেরদের উপর আপতিত হচ্ছিল। সে সময় তিনি দুনিয়া ও তার মধ্যে কি ঘটছে সে সম্পর্কে ছিলেন বেখবর। একমাত্র ধ্যান ছিল যে, কোন মুশরিক যেন রহমতে আলমের (সা) নিকট পৌঁছতে না পারে।

হুজুর (সা) যে দিকে দৃষ্টি ফেলতেন সেদিকেই শামমাছকে (রা) কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত দেখতেন। তিনি নিজেকে হুজুরের (সা) ঢাল বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং কাফেরদের প্রতিটি তরবারীর আঘাতকে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের শরীরের ওপর নিয়ে নিতেন। এই অবস্থায় আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। যুদ্ধশেষ হলে শহীদ ও আহতদের সন্ধান শুরু হলো। এ সময় শামমাছকে (রা) এই অবস্থায় পাওয়া গেল যে, তাঁর শরীরের কোন অংশই জখম ছাড়া ছিল না। কিন্তু তখনো তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিলো। হুজুর (সা) সাহাবাদেরকে (রা) নির্দেশ দিলেন যে, তাঁকে উঠিয়ে মদীনা নিয়ে যাও এবং চিকিৎসা করো। সুতরাং তাকে মদীনা আনা হলো। হযরত উম্মে সালমা মাখজুমিয়া (রা) তাঁর সেবা শুশ্রূষার দায়িত্ব পালন করলেন। কিন্তু হযরত শামমাছের (রা) অবস্থা চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল। শুধুমাত্র একদিন এবং একরাত জীবিত ছিলেন। এ সময় তিনি কিছু খাননি এবং পানও করেননি। অতপর তাঁর জীবন মহান স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হলো। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৪ বছর।

সন্তানদের মধ্যে ছিলেন এক পুত্র আবদুল্লাহ এবং এক কন্যা উম্মে হাবিব। এ দু'জনই সন্তানহীন অবস্থায় মারা যান। এ জন্য হযরত শামমাছের (রা) বংশধারা অব্যাহত থাকেনি।

হযরত শামমাছের (রা) শাহাদাতের পর তাঁর লাশ হুজুরের (সা) নির্দেশে ওহোদের ময়দানে আনা হলো এবং যে রক্তাক্ত কাপড়ে তিনি শাহাদাত পেয়েছিলেন সেই কাপড়েই ওহোদের শহীদানদের সাথে দাফন করা হলো (অন্য এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী তার দাফন হয় জান্নাতুল বাকীতে)।

হযরত হাশিম (রা) বিন উতবা

দিনটি ছিল দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমযান।

সেদিন মদীনার ৮০ মাইল দূরে বদরের ময়দানে এক ভয়াবহ দৃশ্য নজরে পড়ছিল। মক্কার মুশরিকরা বিরাট সাজ-সরঞ্জাম ও জাঁকজমকের সাথে হকপন্থীদেরকে দুনিয়া থেকে নাস্তানাবুদ করার জন্য এসেছিল। তাদের থেকে তিনভাগের এক ভাগ সাজ-সরঞ্জামহীন তাওহীদের ঝান্ডাবাহীদের হাতে জিল্লতিসূচক পরাজয় স্বীকার করেছিল। তাদের বড় বড় সরদার নিহত হয়েছিল এবং যুদ্ধের ময়দানে তাদের লাশ স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়েছিল। এরা ছিল তারা, যারা মক্কায় হকপন্থীদের জীবিত থাকাটা কষ্টকর করে দিয়েছিল এবং তাদেরকে স্বদেশভূমি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেছিল। আজ এখানে তাদের লাশ রক্তাক্ত মাটিতে শিক্ষণীয় উদাহরণ হিসেবে পড়েছিল। মহানবী (সা) যদি চাইতেন তাহলে তাদের লাশ চিল, শকুন ও জন্তু জানোয়ারের খোরাক বানানোর জন্য এমনিভাবে খোলা ময়দানে ফেলে রাখতেন। কিন্তু তাঁর দয়ার অন্তর এটা সহ্য করতে পারলো না। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে (রা) সেই সকল লাশ একত্রিত করে কোন উপযুক্ত স্থানে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) ময়দানে চক্কর মারলেন। এ সময় একস্থানে একটি বড় কূপ দেখতে পেলেন। কূপটি দীর্ঘ দিন যাবৎ অব্যবহৃত ছিল। তাঁরা সকল লাশ সেই কূপে নিক্ষেপ করলেন এবং মাটি ও পাথর দিয়ে তা ঢেকে দিলেন। তারপর হুজুর (সা) সেই সামষ্টিক কবরের নিকট তাশরীফ নিলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে ইরশাদ করলেন ঃ

"হে উতবা, হে শাইবা, হে আবু জেহেল, হে অমুক, হে তমুক! তোমরা কি আল্লাহর ওয়াদা সঠিক পেয়েছ? অবশ্যই আমার সঙ্গে যে ওয়াদা রাব্বুল ইজ্জত করেছেন তা পূর্ণ হয়েছে।"

যে সময় রাসূলের (সা) যবান দিয়ে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিল তখন সেখানে উপস্থিত হুজুরের (সা) সকল জান নিছারের চেহারায় শিক্ষাগ্রহণের ছবি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এক সাহাবীকে অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত মনে হচ্ছিল। তিনি ছিলেন একজন অর্ধবয়সী আকর্ষণীয় অবয়বের মানুষ। সামনের একটি দাঁত ছিল বেশী এবং একটি চোখ সামান্য টেরা ছিল। কিন্তু চেহারা ছিল মোহনীয় ও আকর্ষণীয় এবং কপাল সৌভাগ্যের আলোয় চকমক করছিল। তাঁকে দুঃখভারাক্রান্ত দেখে রহমতে আলম (সা) নিজের নিকট ডাকলেন এবং অত্যন্ত স্নেহভরে জিজ্ঞেস করলেন, "সম্ভবত তোমার পিতার

মৃত্যু তোমাকে দুঃখভারাক্রান্ত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে"—তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আমি আমার পিতার মৃত্যুতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নই। বরং আমার দুঃখ এ জন্য যে, আমার পিতার হক কবুলের সৌভাগ্য হয়নি এবং সে কুফুরীর ওপর মারা গেছে। অথচ সে একজন বিজ্ঞ ও সঠিক মতের মানুষ ছিল। তার চরিত্র ছিল সুন্দর। আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল যে, সে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে। কিন্তু যে অবস্থায় তার শেষ পরিণতি হলো তা দেখে আমার সকল আশা ও আকাংখা ধূলায় মিশে গেছে। আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের বৈভব থেকে মাহরুম থাকাটাই আমার দুশ্চিন্তা ও ব্যথিত হওয়ার কারণ।"

মহানবী (সা) তাঁর ঈমানী আবেগের প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে দোয়ায়ে খায়ের দিলেন। দ্বীনের প্রতি সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ প্রকাশ এবং ঈমানী আবেগ প্রদর্শনকারী এই সাহাবী ছিলেন মক্কার কুরাইশের নামকরা সরদার উতবা বিন রবিয়ার (বদরে নিহত) পুত্র হাশিম। ইতিহাসে তিনি আবু হুজায়ফা কুনিয়তে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

সাইয়েদেনা হযরত আবু হুজায়ফা (রা) হাশিম বিন উতবা (বিন রবিয়া বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই) মহান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি এমন এক পরিবারে চোখ খুলেছিলেন যে পরিবার ছিল কুফর ও শিরকের প্রাণকেন্দ্র। তাঁর পিতা উতবা বিন রবিয়া কুরাইশের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ছিল এবং নিজের কওমে খুব প্রভাব প্রতিপত্তি রাখতো। তার পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ শক্তি, দূরদর্শীতা এবং স্বীয় মতে অটল থাকার গুণাবলীও সকলেই স্বীকার করতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো যে, মহানবী (সা) যখন মক্কাবাসীকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন সে কানে তুলো গুজে দিল এবং সেই সব লোকের মধ্যে শামিল হয়ে গেল যারা দ্বীনে হকের বিরোধিতা করাটাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বানিয়ে নিল। তবুও তার সুন্দর স্বভাব ও প্রকৃতি আবু লাহাব, আবু জেহেল, উকবা বিন আবি মুঈত, উমাইয়া বিন খালফ, ওয়ালিদ বিন মুগিরা এবং আসওয়াদ বিন আবদি ইয়াগুছ প্রভৃতির মত খারাব মানুষের কাতারভুক্ত করেনি। তারা এমন মানুষ ছিল যে, হুজুরকে (সা) নির্যাতন করার জন্য চরম নীচতম পন্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধা করতো না। উতবা ও তার ভাই শাইবা ইসলামের শত্রু ছিল অবশ্যই কিন্তু তারা হুজুরকে (সা) নির্যাতন করার জন্য কোন নীচতম পন্থা অবলম্বন করেনি। উতবা নিজের পুত্রের লালন-পালন খুব বিত্ত বৈভবের আতিশয্যের মধ্যেই করেছিল। যখন সে যৌবনপ্রাপ্ত হলো তখন তার বিয়ে দিল কুরাইশের খতিব সোহায়েল বিন আমরের কন্যা সাহলার সাথে। হাশিমের বয়স যখন ৩০/৩২ বছর তখন

মক্কায় তাওহীদের আওয়াজ উত্থিত হলো। উতবা যদিও নিজের পুত্রকে স্বরঙে রঞ্জিত করার চেষ্টায় কোন ক্রুটি করেনি তবুও আল্লাহ তায়ালা সেই যুবককে সৎ স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি সবধরনের ভয়-ভীতির মুখে নির্ভাবনায় হক দাওয়াতের আহ্বানে সাড়া দিলেন। নেক বখত স্ত্রী সাহলা (রা) বিনতে সোহায়েলও তাঁকে সমর্থন করলেন এবং এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র জামায়াতে শামিল হয়ে গেলেন। পুত্র ও পুত্রবধুর ইসলাম গ্রহণে উতবা খুব মনোকষ্ট পেল এবং সে তাঁদের ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। পরিণাম এই হলো যে, তিনিও অন্যান্য মুসলমানের মত কুরাইশ মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতনের নিশানা হয়ে গেলেন। কাফেরদের জুলুম যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন মহানবী (সা) মজলুম মুসলমানদেরকে হাবশা হিজরতের পরামর্শ দিলেন। সুতরাং নবুওয়াতের পাঁচ বছর পর ১১ জন পুরুষ ও চারজন মহিলা মক্কার মাটিকে বিদায় জানিয়ে হাবশা রওয়ানা হলেন। এ সময় তাদের মধ্যে হযরত হাশিম (রা) এবং তাঁর স্ত্রী হযরত সাহলা (রা) বিনতে সোহায়েলও শামিল ছিলেন। কুরাইশ মুশরিকদের এটাও অসহ্য ছিল যে, হকপন্থীরা এমন কোন স্থানে চলে যাক যেখানে তাদের জুলুম-নির্যাতনের হাত সম্প্রসারিত হতে না পারে। তারা সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত মুসলমানদের পিছু ধাওয়া করলো। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শুয়াইবা বন্দরে তাঁরা হাবশাগমনকারী একটি নৌকা পেয়ে গেলেন এবং তাতে চড়ে তৎক্ষণাৎ খোলা সমুদ্রে প্রবেশ করলেন। এভাবে পিছু ধাওয়াকারী মুশরিকরা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলো।

মুহাজিররা হাবশা পৌঁছার পর কেবলমাত্র দু'তিন মাস অতিবাহিত হয়েছে। এমন সময় তাঁরা এক আশ্চর্য ধরনের খবর শুনতে পেলেন। কেউ তাঁদেরকে বললো যে, রাসূলে আকরাম (সা) ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে এবং এখন হকপন্থীরা কুরাইশের জুলুম-নির্যাতন থেকে মাহফুজ ও নিরাপদ হয়ে গেছে। মুহাজিররা এই খবর শুনে বিশ্ব নবীর (সা) নিকট পৌঁছার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। সুতরাং ইবনে সায়াদের (র) বক্তব্য অনুযায়ী তারা সকলেই এবং ইবনে ইসহাকের (র) মতে তাঁদের কতিপয় মক্কা ফিরে আসলেন। যাহোক, হাবশা থেকে প্রত্যাগমনকারীদের মধ্যে হযরত আবু হুজায়ফা (রা) ও হযরত সাহলাও (রা) ছিলেন। যখন তাঁরা মক্কার নিকট পৌঁছলেন তখন জানতে পেলেন যে, তাঁরা যা শুনেছেন তা স্রেফ গুজব। তাতে তাঁরা পারস্পরিক পরামর্শ করলেন যে, হাবশা ফিরে যাবেন অথবা মক্কা প্রবেশ করবেন। সকলে মিলে মত প্রকাশ করলেন যে, কুরাইশ নেতাদের কারো না কারোর আশ্রয় নিয়ে শহরে প্রবেশ করতে হবে। বস্তুত তাঁদের প্রত্যেকেই কুরাইশের কোন না কোন সরদারের আশ্রয় নিলেন এবং সকলেই শহরে প্রবেশ

করলেন। আল্লামা বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু হুজায়ফা (রা) এবং তাঁর স্ত্রী উমাইয়া বিন খালফের আশ্রয় নিয়ে মক্কা প্রবেশ করলেন। এসব সাহাবী (রা) এমনিভাবে স্বদেশে তো ফিরে এলেন এবং প্রিয় নবীর (সা) দর্শন লাভেও সফলকাম হলেন। কিন্তু তাঁরা দেখতে পেলেন যে, প্রতিকূল অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি এবং মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন ক্রমেই প্রচন্ড রূপ ধারণ করছে। ফলে হুজুর (সা) মজলুম মুসলমানদেরকে পুনরায় হাবশা হিজরতের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের শুরুতে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে প্রায় একশ'র মত মুসলমানের একটি কাফেলা হাবশা রওয়ানা হয়ে গেল। আবু হুজায়ফাও (রা) হযরত সাহলার (রা) সাথে সেই কাফেলায় শামিল ছিলেন। যেন এটা তাঁদের হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত ছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কয়েক বছর হাবশায় উদ্বাস্তুর জীবন কাটাতে লাগলেন। এই সময় তাঁদের পুত্র মুহাম্মাদ (রা) বিন আবি হুজায়ফা জন্মগ্রহণ করেন। আল্লামা ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, হাবশার মুহাজিরদের একটি জামায়াত হযরত জাফর (তাইয়ার) বিন আবি তালিবের সঙ্গে ৬ষ্ঠ হিজরী পর্যন্ত হাবশা রলেন এবং খায়বারের যুদ্ধের সময় ফিরে আসেন। অবশ্য ৩৩ জন পুরুষ ও ৮জন মহিলা সমন্বয়ে গঠিত একটি দল হুজুরের (সা) মদীনা হিজরতের কিছু দিন পূর্বে হাবশা থেকে মক্কা ফিরে আসেন। হযরত আবু হুজায়ফাও (রা) নিজের স্ত্রী ও পুত্রসহ সেই দলে শামিল হয়ে মক্কা ফিরে এলেন। কিছু দিন পর হুজুর (সা) মুসলমানদেরকে মদীনা হিজরতের অনুমতি দেন। তখন হযরত আবু হুজায়ফাও (রা) স্ত্রী-পুত্র এবং আযাদকৃত গোলাম (মুখে ডাকা পুত্র) হযরত সালেমকে (রা) সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা চলে যান। এমনিভাবে তিনি হক পথে তৃতীয়বার হিজরতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, মদীনায় হযরত উবাদ (রা) বিন বাশার আশহালী হযরত আবু হুজায়ফা (রা) এবং তার পরিবার পরিজনকে মেহমান বানালেন। রহমতে আলম (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণের পর কয়েক মাস অতিবাহিত হলে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত আবু হুজায়ফাকে (রা) তাঁর মেযবান হযরত উবাদ (রা) বিন বাশারেরই দ্বীনি ভাই বানিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদরের প্রান্তরে। এ সময় হযরত আবু হুজায়ফা (রা) সেই তিনশ' তের পবিত্র নামের অন্যতম ছিলেন যাঁরা সেই ঐতিহাসিক সময়ে বিশ্বনবীর (সা) সফর সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বিপক্ষে বাতিল পূজারীদের নেতৃত্ব হযরত আবু হুজায়ফার (রা) পিতা উতবা বিন রবিয়ার হাতে ছিল। তার সঙ্গে

ছিল তার দ্বিতীয় পুত্র ওলিদ, ভাই শাইবা এবং নাতি হানজালা বিন আবি সুফিয়ান। কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকার লিখেছেন যে, উতবার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল কোনভাবে যুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়া। সুতরাং সে হাকিম বিন হাযামকে পয়গামসহ আবু জেহেলের নিকট প্রেরণ করেছিল। এই পয়গামে সে জানিয়েছিল যে, চাচার পুত্রের [রাসূলে আকরাম (সা)] বিরুদ্ধে মুকাবিলা থেকে সরে দাঁড়ানোই উত্তম হবে। আবু জেহেল এই পয়গাম শুনে জ্বলে উঠলো এবং বলতে লাগলো যে, উতবার এক পুত্র (আবু হুজায়ফা) মুহাম্মাদের (সা) বাহিনীতে রয়েছে। এ কারণে সে লড়াই থেকে সরে থাকতে চায়। সে চিন্তা করছে যে, যুদ্ধে যদি সে মারা যায়!

হাকিম বিন হাযাম ফিরে গিয়ে উতবাকে আবু জেহেলের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো। তখন সে বললো, লড়াই হলে বুযদিলির কালিমা কে বহন করে, তা লোকজন দেখে নেবে। তারপর উতবা একটি লাল উটে চড়ে কুরাইশদের সামনে এক ওজস্বী ভাষণ দিলো। এই ভাষণে সে তাদেরকে লড়াই ছাড়া ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিল। কিন্তু আবু জেহেল ও অন্যান্য যুদ্ধপ্রিয় মুশরিক তার কথায় কোন আমল দিল না। যুদ্ধ শুরু হলে উতবা আবু জেহেলের অপবাদ খন্ডনের জন্য স্বীয় পুত্র আবু হুজায়ফাকে (রা) মুকাবিলার আহ্বান জানালো। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, স্বয়ং হযরত আবু হুজায়ফা (রা) ঈমানী আবেগে অস্থির হয়ে নিজের পিতাকে যুদ্ধের আহ্বান জানালেন। হযরত আবু হুজায়ফার সহোদরা হিন্দ বিনতে উতবাও পিতার সঙ্গে এসেছিল। সে সহোদরকে (আবু হুজায়ফা) পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়ের সামনে তরবারী হাতে দেখে ক্রোধে অস্থির হয়ে ভাইয়ের নিন্দায় একটি কবিতা আবৃত্তি করলো।

পিতা পুত্রের মুকাবিলার আহ্বানে সাড়া দেয়নি অথবা পুত্র পিতার যুদ্ধের ডাককে গ্রহণীয় বলে মনে করেননি—যাই হোক না কেন, উভয়ের মধ্যে মুকাবিলা হয়নি। অবশ্য উতবা হযরত হামযা (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবের হাতে মারা গিয়েছিল। তার মুশরিক পুত্র ওলিদ, ভাই শাইবা এবং নাতী হানজালাও যুদ্ধে নিহত হয়। যুদ্ধের পর বিশ্বনবী (সা) মুশরিকদের লাশ একটি অন্ধ কূপে দাফন করালে সেই ঘটনা সংঘটিত হয় যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে।

বদরের যুদ্ধে কুরাইশের যেসব ব্যক্তি মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হয়, তাদের মধ্যে রাসূলের (সা) চাচা হযরত আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবও ছিলেন। আব্বাস (রা) পর্দার অন্তরালে মুসলমান হয়েছিলেন অথবা আন্তরিকভাবে মুসলমানদের কল্যাণকামী ছিলেন এবং মুশরিকদের বাধ্য করানোর কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। প্রিয়নবী (সা) প্রকৃত

অবস্থা অবগত ছিলেন। এই ভিত্তিতে হুজুর (সা) লড়াইয়ের পূর্বে সাহাবায়ে কিরামকে (রা) হিদায়াত দিয়ে ছিলেন যে, বনুহাশেম এবং অন্য আরো কতিপয় লোককে জবরদস্তি করে আমাদের মুকাবিলায় আনা হয়েছে। নচেৎ তারা নিশ্চিতভাবে আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে চায়নি। এ জন্য যুদ্ধের সময় যদি হাশেমীদের কেউ তোমাদের হাতে আসে তাহলে তাকে হত্যা করবে না। আবুল বখতরী বিন হিশাম (যিনি শিবে আবি তালিবের অবরোধ ভাঙ্গার ব্যাপারে বিশেষভাবে অংশ নিয়েছিলেন)-কেও হত্যা করবে না এবং বিশেষ করে আমার চাচা আব্বাসকে হত্যা থেকে বিরত থাকবে। কেননা সে খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখানে এসেছে।

আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু হুজায়ফার (রা) ঈমানী আবেগ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল এবং তাঁর নিকট হকের মুকাবিলায় রক্ত ও বংশের সম্পর্ক এবং আত্মীয়তার কোন গুরুত্ব ছিল না। তিনি বিশ্বনবীর (সা) ইরশাদ ভালোভাবে বুঝতে না পেরে বলে উঠলেন ঃ

"এটা হক ও বাতিলের মুকাবিলা। আমরা যদি হকের খাতিরে নিজের পিতা, ভাই, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়কে ক্ষমা না করি তাহলে বনু হাশেমকে কেন ক্ষমা করবো। আল্লাহর কসম, আমি যদি আব্বাসকে পাই তাহলে তাঁকে তরবারীর খোরাক না বানিয়ে ছাড়বো না।"

হুজুর (সা) হযরত আবু হুজায়ফার (রা) এই বক্তব্যের খবর পেলেন। এ সময় তিনি হযরত ওমর ফারুককে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আবু হাফস! তুমি আবু হুজায়ফার কথা শুনেছ। আমার চাচার চেহারা কি হত্যার যোগ্য ?"

হযরত ওমর (রা) আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি অনুমতি দেন তাহলে আবু হুজায়ফার গর্দান উড়িয়ে দেই।"

কিন্তু রহমতে আলম (সা) হযরত ওমরকে (রা) এ ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখলেন। কেননা, হযরত আবু হুজায়ফা (রা) ছিলেন তাঁর অত্যন্ত একনিষ্ঠ জাননিছার সাহাবী।

হযরত আবু হুজায়ফার (রা) এই লজ্জা প্রকাশ দ্বীনের প্রতি তাঁর ইখলাস ও রাসূল প্রেমের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিল। যদিও রাসূলে করিম (সা) তাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, তবুও তাঁর অন্তরে সবসময় নিজের কথার কাঁটা বিধতো। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা একদিন তাঁর শাহাদাতের আকাংখাও পূরণ করে দিলেন।

বদরের পর হযরত আবু হুজায়ফা (রা) অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। একাদশ হিজরীতে বিশ্বনবী (সা) ওফাত পেলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন। এ সময় সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন জ্বলে উঠলো। সেই ভয়াবহ সময় হযরত আবু হুজায়ফা (রা) অত্যন্ত তৎপরতার সাথে খলিফাতুর রাসূলকে সমর্থন দিলেন। এবং মুরতাদদের উৎখাতের জন্য জীবন উৎসর্গের বাজী ধরলেন। ধর্মদ্রোহিতা প্রসঙ্গে সবচেয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধ "ইয়ামামার" যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। এটা ছিল লোহায় লোহায় টক্কর। এক দিকে ছিল কঠিন ধরনের আরবরা অন্য পক্ষেও ছিল আরব। কিন্তু এক পক্ষ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) জন্য লড়াই করছিল। আর অন্য পক্ষ মুসায়লামা কাজ্জাবের নেতৃত্বে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। হকপন্থীদের কাতারে হযরত আবু হুজায়ফাও (রা) মুখে ডাকা পুত্র হযরত সালেমের (রা) সাথে শামিল ছিলেন। উভয়ে যুদ্ধে জীবন উৎসর্গের এমন নমুনা পেশ করেছিলেন যে, অসংখ্য আঘাত খেয়ে উভয় জানবাজ সিপাহী শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতে পৌছে গেলেন। হযরত আবু হুজায়ফার (রা) বয়স সে সময় ৫৪ বছর ছিল। বদরের দিন থেকে যে শাহাদাতের আকাংখা তাঁর অন্তরে চেপে বসেছিল ন' বছর পর তা ইয়ামামার ময়দানে পূর্ণ হয়ে গেল।

হযরত আবু হুজায়ফা (রা) জীবনে তিনটি বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীদের নাম হলো : সাহলা (রা) বিনেত সোহায়েল (রা), ছাবিতা (রা) বিনতে ইয়ায়ার এবং আমেনা বিনতে আমর। সন্তানের মধ্যে দু'পুত্রের নাম পাওয়া যায়। মুহাম্মাদ (রা) বিন আবি হুজায়ফা (রা) হযরত সাহলার (রা) গর্ভ থেকে হাবশার জন্মগ্রহণ করেন এবং আছেম বিন আবি হুজায়ফা (রা) আমেনা বিনতে আমরের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ও আছেম উভয়েই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। এ জন্য হযরত আবু হুজায়ফার বংশধারা অব্যাহত থাকেনি।

হযরত আবু হুজায়ফা হাশিমের (রা) জীবনের পাতায় ইসলামে অগ্রগামিতা, হকপথে আত্মাৎসর্গের আকাংখা, ইখলাস ফিদদ্বীন, কুরবানীর আবেগ এবং ঈমানী জোশ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। গোলামদের প্রতি এত স্নেহশীল ছিলেন যে, যখন তাঁর স্ত্রী ছাবিতা (রা) বিনতে ইয়ায়ার নিজের গোলাম সালেমকে আজাদ করে দিলেন তখন তাঁরা হযরত সালেমকে (রা) নিজের মুখে ডাকা পুত্র বানিয়ে নিলেন এবং সে লোকদের মধ্যে সালেম (রা) বিন আবু হুজায়ফা নামে মশহুর হয়ে গেলেন।

কিন্তু যখন এই হুকুম নাযিল হলো অর্থাৎ লোকদেরকে তাদের পিতার নিসবত ধরে ডাকো তখন লোকেরা তাকে আবু হুজায়ফার (রা) আজাদকৃত গোলাম সালেম (রা) হিসেবে ডাকতে লাগলো।

মুসনাদে আবু দাউদে আছে যে, এই নির্দেশ নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু হুজায়ফার (রা) নিকট হযরত সালেমের (রা) নিজের বাড়ীতে স্বাধীনভাবে যাতায়াত অসহনীয় বলে মনে হতে লাগলো। কেননা, তিনি আশংকা করছিলেন যে, সালেমের (রা) এ ধরনের যাতায়াত আল্লাহর নির্দেশের খেলাফ হয়ে যায় কিনা! তিনি এই আশংকার কথা হযরত সাহলা (রা) বিনতে সোহায়েলের নিকট প্রকাশ করলেন। তখন তিনি হুজুরের (সা) খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সালেমকে নিজেদের পুত্র মনে করতাম এবং সে শৈশবকাল থেকে আমাদের বাড়ী আসা যাওয়া করে থাকে। কিন্তু এখন আবু হুজায়ফার (রা) নিকট তার আমাদের বাড়ী স্বাধীনভাবে যাতায়াত পসন্দনীয় নয়।"

হুজুর (সা) বললেন, "তাকে নিজের দুধ পান করিয়ে দাও। তাহলে সে তোমার মুহরিম হয়ে যাবে।"

মোটকথা, এমনিভাবে হযরত সালেম (রা) হযরত আবু হুজায়ফা (রা) ও হযরত সাহলার (রা) দুধ পুত্র হয়ে গেলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, এটা শুধু হযরত সালেমের জন্য বিশেষ অনুমতি ছিল। নচেৎ জওয়ান অবস্থায় দুধ পুত্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না।

হযরত আবু হুজায়ফা (রা) সরদার পুত্র সরদার ছিলেন এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তাঁর ঘরের বাঁদী ছিল। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ, উদ্বাস্তুর জীবন গ্রহণ এবং দারিদ্র ও বুভুক্ষার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। সত্য কথা হলো তার ব্যক্তিত্ব ছিল একটি আলোকবর্তিকা। হক পথে তাঁর জাননিছারী এবং দ্বীনে হকের প্রতি গভীর সম্পর্ক মুসলিম উম্মাহর জন্য চিরকালীন মশাল হয়ে থাকবে।

হযরত আমের (রা) বিন রবিয়াতাল আনযি

নাম আমের। কুনিয়ত আবু আবদুল্লাহ। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আমের বিন রবিয়া বিন কা'ব বিন মালেক বিন রবিয়া বিন আমের বিন সায়াদ বিন আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন রফিদাহ বিন আনায বিন ওয়ায়েল।

তাঁর খান্দান বনু আদির মিত্র ছিল। হযরত ওমর ফারুকের (রা) পিতা খাত্তাব বিন নোফায়েল আদি হযরত আমেরকে (রা) এত অধিক ভালো বাসতেন যে, সে তাঁকে নিজের পুত্র (মুখে ডাকা) বানিয়ে নিয়েছিল এবং লোকেরা তাঁকে আমের বিন খাত্তাব বলে ডাকতো। কিন্তু যখন কুরআনে করিমে ادعوهم لابائهم। (অর্থাৎ লোকদেরকে নিজের নসবি পিতার নসব ধরে ডাকো)—এই নির্দেশ নাযিল হলো তখন লোকেরা তাঁকে নিজের প্রকৃত পিতার সম্পর্কে আমের বিন রবিয়া বলে ডাকতে লাগলো।

হযরত আমের (রা) বিন রবিয়া মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি নবুওয়াতের সম্পূর্ণ প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তখনো রহমতে আলম (সা) দারে আরকামে তাশরীফ নেননি। তাঁর স্ত্রী লায়লা (রা) বিনতে আবি হাছমা আদবিয়াও অত্যন্ত ভাগ্যবতী মহিলা ছিলেন। তিনিও স্বামীর সঙ্গে ইসলামের নিয়ামতে পূর্ণতা প্রাপ্তা হন। ইসলাম গ্রহণের পর অন্যান্য সাবিকুনাল আউয়ালুনের মত এই উভয় স্বামী-স্ত্রীও মক্কার মুশরিকদের নির্যাতনের শিকার হন। মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন যখন সীমা অতিক্রম করে গেল তখন বিশ্বনবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) হাবশা হিজরতের অনুমতি দেন। সুতরাং নবুয়তের পাঁচ বছর পর নির্যাতিত মুসলমানদের ছোট্ট একটি কাফেলা মক্কা থেকে হাবশা রওয়ানা হন। এই কাফেলায় হযরত আমের (রা) বিন রবিয়াও নিজের স্ত্রী লায়লা (রা)-সহ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অনেক চরিতকার কম বেশী বাক্যের হেরফের বর্ণনা করেছেন যে, হযরত লায়লা (রা) উটের ওপর সওয়ার হচ্ছিলেন। ঠিক এমন সময় হযরত ওমর (রা) সেখানে এসে পড়লেন। তখন পর্যন্ত তিনি ঈমান আনেননি। তিনি হযরত লায়লাকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, উম্মে আবদুল্লাহ কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

তিনি জবাব দিলেন ঃ

"আমরা তোমাদের নির্যাতনে অস্থির হয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আল্লাহর সাম্রাজ্য ছোট্ট নয়। যেখানে আশ্রয় পাবো, সেখানে যাবো এবং যতক্ষণ

পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে দেবেন ততক্ষণ দেশ থেকে দূরেই থাকবো।"

হযরত ওমর (রা) তাঁর কথায় খুব প্রভাবিত হলেন এবং বললেন, "আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে থাকুন"। তিনি যখন একথা বলে চলে গেলেন তখন হযরত আমের (রা) বিন রবিয়াও এসে উপস্থিত হলেন। হযরত লায়লা (রা) তাঁকে এই ঘটনা শুনালে তিনি বললেন, "ওমর সেই সময় পর্যন্ত ঈমান আনবে না যতক্ষণ পর্যন্ত খাত্তাবের গাধা ইসলাম কবুল না করবে।"

হযরত লায়লা (রা) বললেন, "আমাকে দেখে ওমরের (রা) ওপর কঠিন ভাবাবেশ জারী হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন, তাঁর অন্তর ফিরিয়ে দিন।"

হযরত আমের (রা) বললেন, "ওমর (রা) ঈমান আনুক এটা কি তুমি চাও?" তিনি বললেন, "হাঁ!"

আল্লাহ তায়ালা হযরত লায়লার (রা) আকাংখা এমনিভাবে পূরণ করলেন যে, পরবর্তী বছরই হযরত ওমর (রা) ঈমান আনার মর্যাদা লাভ করলেন এবং ইসলামের শক্তিশালী বাহুতে পরিণত হলেন।

হযরত আমের (রা) ও হযরত লায়লা (রা) হাবশায় কেবলমাত্র তিনমাসই অতিবাহিত করেছিলেন। এমন সময় মক্কার মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের খবর মশহুর হয়ে গেল। হাবশার মুহাজিররা এই খবর শুনে তাঁদের একটি দল নবুয়তের পাঁচ বছর পর শাওয়াল মাসে হাবশা থেকে মক্কা রওয়ানা হয়ে এলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আমের (রা) ও তাঁর স্ত্রীও শামিল ছিলেন। মক্কার নিকট পৌঁছে এসব সাহাবী জানতে পেলেন যে, খবরটি মিথ্যা ছিল। কিন্তু তখন তাঁরা উল্টো পায়ে ফিরে যাওয়াটাকে ঠিক মনে করলেন না এবং সকলেই কুরাইশের কোন না কোন সরদারের আশ্রয়ে মক্কা প্রবেশ করলেন। হযরত আমের (রা) বিন রবিয়া এবং তার স্ত্রী আছ বিন ওয়ায়েল সাহমীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এই ঘটনার পর মুসলমানদের ওপর মুশরিকদের জুলুম নির্যাতন আরো কঠিনতর হয়ে উঠলো। তাতে হুজুর (সা) পুনরায় মজলুমদেরকে হাবশা হিজরতের নির্দেশ দিলেন। বস্তুত নবুওয়াতের ৬ বছর পর প্রথম দিকে প্রায় একশ' মজলুম হকপন্থীর একটি কাফেলা হাবশা হিজরত করলেন। হযরত আমের (রা) বিন রবিয়া ও হযরত লায়লা (রা) বিনতে আবি হাছমাও সেই কাফেলার অন্যতম ছিলেন। হাবশায় কয়েক বছর উদ্বাস্তুর জীবন অতিবাহিত করার পর হযরত আমের (রা) ও হযরত লায়লা (রা) অন্য কতিপয় মুসলমানের সাথে হুজুরের (সা) মদীনা হিজরতের কিছু দিন পূর্বে মক্কা ফিরে

এলেন এবং পুনরায় কিছুদিন পর রাসূলের (সা) অনুমতি পেয়ে মদীনায় স্থায়ীভাবে হিজরত করে গেলেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আমেরের (রা) স্ত্রী হযরত লায়লার (রা) এই মর্যাদা লাভ ঘটেছিল যে, তিনিই মুসলমান মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হিজরত করে মদীনা পৌছেছিলেন।

যুদ্ধসমূহ শুরু হলে হযরত আমের (রা) বিন রবিয়া বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত নবীর (সা) সকল যুদ্ধে মহানবীর সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাছাড়াও তিনি ছোট ছোট কয়েকটি অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন এবং তার পরিণাম স্বরূপ বড় বড় মুসিবত বরদাশত করেছিলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে স্বয়ং তাঁর যবানীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে অভিযানসমূহে প্রেরণ এবং অভাবের কারণে খাদ্য হিসেবে সামান্য খেজুর প্রদান করতেন। কোন অভিযানে যদি বেশী দিন ব্যয় হয়ে যেতো তখন এই খেজুর জনপ্রতি এক মুঠোর চেয়েও কম হতো। এমনকি একটি করেও খেজুর পাওয়া যেতো। কোন কোন সময় খেজুর সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যেতো এবং আমাদেরকে গাছের পাতা দিয়ে পেট ভরতে হতো।

মহানবীর (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আমের (রা) বিন রবিয়া শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মদীনায় মুকিম ছিলেন এবং অত্যন্ত নীরবতার সাথে জীবন অতিবাহিত করেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে খুব মান্য করতেন। নিজের খিলাফতকালে তিনি যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে তাশরীফ নিলেন। এ সময় তিনি নিজের সঙ্গে কতিপয় আনসার ও মুহাজিরকেও নিয়ে গেলেন। তাদের মধ্যে হযরত আমের (রা) বিন রবিয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) যে বছর হযরত ওসমান জুন্নুরাইনাকে (রা) নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে হজ্জের জন্য তশরীফ নিলেন তখন হযরত আমের (রা) বিন রবিয়াও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আমীরুল মু'মিনীন (রা) স্বয়ং তাঁকে নিজের সফরসঙ্গী নির্বাচন করেছিলেন।

হযরত আমেরের (রা) বেশীর ভাগ সময় আল্লাহর ইবাদাতে অতিবাহিত হতো। হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতের শেষ অধ্যায়ে ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এ সময় তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্জনত্ব গ্রহণ করেন এবং কোন ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার আশংকায় খুব কমই বাইরে বের হতেন। দিন-রাত ঘরের মধ্যে নামায, রোযা এবং আরো অন্যান্য দোয়া ও ওজিফাতে মশগুল থাকতেন। এক রাতে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখলেন যে, কোন এক ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করতে বলছে।

হযরত আমের (রা) ঘুম থেকে জেগে তেমনিভাবে অত্যন্ত খুশু ও খুজু অর্থাৎ বিনয়ের সাথে দোয়া করলেন এবং এমন নির্জনত্ব গ্রহণ করলেন যে, কেউ আর তাঁকে ঘর থেকে বাইরে বের হতে দেখেননি। এই অবস্থাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অসুস্থতাই মৃত্যুরোগ হিসেবে দেখা দিল এবং হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের শাহাদাতের কিছু দিন পর তিনি পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন। মদীনাবাসীর জানাই ছিল না যে, তিনি কবে অসুস্থ হন এবং কবে মারা যান। যখন একাকী তার জানাযাহ দেখলো তখন তাদের মূর্ছা যাওয়ার মত অবস্থা হলো এবং চারদিক থেকে মহানবীর (সা) এ জালিলুল কদর সাহাবীর শেষ আরামস্থলে পৌছানোর জন্য ভেঙ্গে পড়লেন।

ইসলামে অগ্রগমন, ইখলাস ফিদ্বীন, মুসিবত বরদাশত, রাসূল প্রেম, জিহাদের প্রতি শওক, ইবাদাতে আকর্ষণ এবং যুহুদ ও তাকওয়া হযরত আমের (রা) বিন রবিয়ার চারিত্রিক গুণাবলীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ। তিনি যেভাবে মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ ও ফিতনা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ছিলেন তা তার মহান চারিত্রের স্পষ্ট দলিল।

হযরত সোহায়েল (রা)
বিন বাইজা ফাহরী

সোহায়েল হলো নাম। আবু মূসা কুনিয়াত। কুরাইশের বনু ফাহর বিন মালেকের খান্দানভুক্ত ছিলেন। পিতার নাম ছিল ওয়াহাব। কিন্তু তিনি নিজের মা বাইজা বিনতে হাজদমের নিসবতে সোহায়েল (রা) বিন বাইজা নামে মশহুর হন। নসব নামা হলো ঃ

সোহায়েল (রা) বিন ওয়াহাব বিন রবিয়া বিন হিলাল বিন মালিক বিন জাব্বাহ বিন হারিছ বিন ফাহার বিন মালিক।

হযরত সোহায়েল (রা) সেই মহান মর্যাদাসম্পন্ন বুজর্গদের অন্তর্ভূক্ত যাঁরা দাওয়াতে হকের প্রথম তিন বছরের মধ্যে ঈমান আনায়নের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। নবুয়তের ৬ বছরের পর (৬১৫ খৃষ্টাব্দে) তিনি হক পথে স্বদেশ ভূমিকে বিদায় জানিয়ে হাবশায় উদ্বাস্তুর জীবন গ্রহণ করেন। কয়েক বছর বিদেশে কাটানোর পর নবীর হিজরতের কিছুদিন পূর্বে মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখান থেকে মদীনা হিজরত করেন।

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) প্রতি হযরত সোহায়েলের সীমাহীন ভালোবাসা ছিল এবং তিনি সবসময় হকপথে নিজের জীবন কুরবান করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। এ জন্য রহমতে আলম (সা) তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। যুদ্ধসমূহ শুরু হলে তিনি বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধে মহানবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সম্মান লাভ করেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই নিজের জীবন উৎসর্গের নিপুণতা প্রদর্শন করেন।

মুসতাদরাকে হাকিমে আছে, তাবুকের সফরে স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালিন (সা) তাঁকে নিজের সওয়ারীর ওপর বসিয়ে নিয়েছিলেন। এটা ছিল নিসন্দেহে মহান সৌভাগ্যের ব্যাপার। রাস্তায় হুজুর (সা) তাঁকে দু'তিন বার উচ্চৈস্বরে ডেকেছিলেন। তিনি প্রত্যেকবারই "লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলেছিলেন। অন্য সাহাবীও হুজুরের (সা) আওয়াজ শুনে তাঁর চার পাশে একত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ এক হওয়ার সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন এবং জান্নাত তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যাবে।"

তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর হযরত সোহায়েল (রা) পরপারের ডাক পেলেন এবং তিনি মহানবীর (সা) সামনেই নবম হিজরীতে ওফাত পেলেন। কোন সন্তান ছিল না। মহানবী (সা) মসজিদে নিজের মাহবুব জাননিছারের জানাযার নামায পড়ালেন।

সহীহ মুসলিমে (কিতাবুল জানায়েয) আছে, কয়েক বছর পর হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের জানাযা মসজিদে আনা হলে কিছু লোক আপত্তি করলো। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাই (রা) বললেন, লোকেরা কত তাড়াতাড়ি ভুলে যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সোহায়েল বিন বাইজার জানাযার নামায মসজিদেই পড়িয়েছিলেন।

হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব

নবীর (সা) হিজরতের তৃতীয় বছরে ওহোদের ময়দানে হক ও বাতিলের লড়াই সংঘটিত হলো। এই যুদ্ধে বিশ্ব এক বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করলো। দীর্ঘদেহী ও গমের রংয়ের এক নূরানী সুরতের মুজাহিদ কামিস ও যিরাহ থেকে মুখাপেক্ষীহীন খালি দেহে মক্কার মুশরিকদের ব্যূহের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে এই অবস্থায় দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন। সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে থামিয়ে দিলেন এবং বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে এই অবস্থায় দুশমনের নিশানা হতে দেব না।" একথা বলে নিজের যিরাহ খুলে সেই সাহাবীকে পরিয়ে দিলেন। সে সময় তো তিনি হযরত ওমর ফারুকের (রা) কথা মেনে নিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই যিরাহ খুলে ফেলে দিলেন এবং খালি বুকে হাতে তরবারী নিয়ে দুশমনের দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) পুনরায় দৌড়ে তাঁর নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি যিরাহ কেন খুলে ফেলেছেন? তিনি বজ্রকণ্ঠে বললেন, "ওমর আমার রাস্তা থেকে সরে যাও। তুমি যদি শাহাদাতের আকাংখী হয়ে থাকো তাহলে আমার অন্তরেও শাহাদাতের আগুন জ্বলছে। যিরাহতো সেই পরিধান করে যার নিকট জীবন প্রিয়। আমি তো নিজের জীবনকে হকপথে বিক্রি করে ফেলেছি।

হযরত ওমর ফারুক (রা) চুপ মেরে গেলেন এবং মাথানত করে নিজের ব্যূহে ফিরে এলেন। ওদিকে সেই ব্যক্তি খালি দেহেই দুশমনের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন এবং এমন আবেগ ও আত্মহারা হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন যে, বাহাদুররা পর্যন্ত সাবাশ বলে উঠলো—এই বাহাদুর ব্যক্তি যাঁকে শাহাদাতের আকাংখা কামিস ও যিরাহ থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দিয়েছিল—তিনি ছিলেন হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব।

সাইয়েদেনা হযরত আবু আবদুর রহমান যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব জালিলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি কুরাইশের "বনু আদি" বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব বিন নুফায়েল বিন আবদুল উযযা বিন রাবাহ বিন আবদুল্লাহ বিন কারত বিন যিরাহ বিন আদি বিন কা'ব বিন লুব্বী।

হযরত ওমর ফারুক (রা) ছিলেন তাঁর সতালো ভাই এবং বয়সে তাঁর ছোট ছিলেন। হযরত যায়েদের (রা) মায়ের নাম ছিল আসমা বিনতে হয়াহাব এবং তিনি ছিলেন বনু আসাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। হযরত ওমর (রা) খাত্তাব বিন

নুফায়েলের দ্বিতীয় স্ত্রী খাতমা বিনতে হিশাম বিন মুগিরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সতালো হওয়া সত্ত্বেও উভয় ভাইয়ের মধ্যে পূর্ণ ভালোবাসা ছিল। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই ভালোবাসাও অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাবকে আল্লাহ তায়ালা সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি সেই মহান মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের দলভুক্ত যারা নবুওয়াতের প্রথম তিন বছরে দাওয়াতে হকের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন এবং বছরের পর বছর ধরে মক্কার মুশরিকদের ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের পর প্রিয় নবী (সা) ইসলামের অনুসারীদেরকে মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে মদীনা মুনাওয়ারাতে হিজরত করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ সময় হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব মুহাজিরদের প্রথম কাফেলার সাথে হিজরত করে মদীনা এসেছিলেন। অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি মুহাজিরদের তৃতীয় কাফেলার সঙ্গে হিজরত এবং কূবাতে হযরত রিফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযারের বাড়ীতে অবস্থান করেন। কিছুদিন পরই প্রিয়নবীও (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করেন এবং এই প্রাচীন শহরের প্রাচীর নবীর (সা) শুভাগমনে ঝলমল করে উঠলো। হিজরতের ৬ষ্ঠ মাসে হুজুর (সা) হযরত আবু তালহা (রা) আনসারীর (খাদেমে রাসূল হযরত আনাস বিন মালিকের সতালো পিতা) বাড়ীতে আনসার ও মুহাজিরদেরকে একত্রিত করলেন এবং তাদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কায়েম করলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (সা) হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাবকে হযরত মায়ান (রা) বিন আদি আজলানী আনসারীর দ্বীনি ভাই বানালেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে বদর নামক স্থানে হক ও বাতিলের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হলো। তখন হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাবের "আসহাবে বদরের" মধ্যে শামিল হওয়ার মহান মর্যাদা লাভ ঘটেছিল। পরবর্তী বছর ওহোদের যুদ্ধের সময় তিনি গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন তার উল্লেখ ওপরে এসেছে। ওহোদের পর খন্দকের যুদ্ধে আত্মোৎসর্গের হক আদায় করেন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি হুদায়বিয়াতে বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার স্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করেন। মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন, আওতাস ও তায়েফের যুদ্ধ সংঘটিত হলে সেসব যুদ্ধেও তিনি সবসময় রহমতে আলমের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। বিদায় হজ্জেও (দশম হিজরীতে) হুজুরের (সা) সাথে ছিলেন। ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, বিদায় হজ্জের সময় একদিন প্রিয় নবী (সা) হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাবের সামনে এই হাদীস বর্ণনা করেন ঃ

"তুমি যা খাও তাই নিজের গোলামকে খাওয়াও। যা পরিধান কর তাই নিজের গোলামকে পরিধান করাও। যদি সে কোন ভুল করে বসে; ভুলটা এমন যে তুমি তা ক্ষমা করতে পারো না তাহলে তাকে বিক্রি করে ফেলো।"

মোটকথা রাসূলের (সা) যুগে এমন কোন মর্যাদা ছিল না যা হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব লাভ করেননি। তিনি খাইরুল বাশার বা উত্তম মানবের (সা) সেই জাননিছারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা হকের সমর্থনে সবসময় প্রস্তুত থাকতেন এবং কোন ধরনের চাপ, লোভ অথবা ভীতি তাঁদেরকে সেই কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতো না।

একাদশ হিজরীতে আল্লাহ তায়ালার রিসালাত সূর্য ডুবে গেলো। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। তখন একবারে সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা জ্বলে উঠলো। মক্কার কুরাইশ, মদীনার আনসার, তায়েফের বনু ছাকিফ এবং অন্য তিন-চারটি গোত্র ছাড়া আরবে এমন কোন কবিলা ছিল না যে, এই ফিতনায় কোন না কোনভাবে প্রভাবিত হয়নি। মুসলিম উম্মাহর জন্য সময়টি ছিল খুবই নাযুক এবং মুরতাদদের মুকাবিলায় সামান্য দুর্বলতা প্রদর্শনও ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারতো। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) পূর্ণ দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও মু'মিনসুলভ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি আকস্মিক দুর্ঘটনাসমূহের সামনে অটল পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং মুরতাদদের সকল দাবী সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তাদের নির্মূলের জন্য কোমর বাঁধলেন। এ প্রসঙ্গে হকের ঝান্ডাবাহী ও মুরতাদদের মধ্যে কয়েকটি রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এসব যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক তাবারী এই যুদ্ধ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "মুসলমানরা এর চেয়ে কঠিন যুদ্ধের সম্মুখীন কখনো হয়নি।"

চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন, হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব শুরুতেই ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা নির্মূলের জন্য জীবনের বাজী লাগিয়ে দেন এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) যখন মুসায়লামার প্রচন্ড যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর পেলেন তখন তিনি হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে মুসায়লামার সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন এবং তাঁর সাহায্যের জন্য শক্তিশালী সৈন্য পাঠালেন। এই বাহিনীতে আনসার সরদার হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস এবং মুহাজিরদের আমীর হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব ছিলেন।

ইয়ামামার নিকট আকরাবা নামক স্থানে মুসলমান ও মুসায়লামা বাহিনী সামনা-সামনি হলো। মুসায়লামা বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। আর এদিকে মুসলমানদের মোট সংখ্যা সব মিলিয়ে দশ হাজারের কাছাকাছি ছিল। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, এ সময় ইসলামী বাহিনীর ঝান্ডাবাহী ছিলেন হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব। যখন উভয় পক্ষ যুদ্ধের ব্যূহ রচনা সমাপ্ত করলো তখন সর্বপ্রথম মুসায়লামার পক্ষ থেকে নাহহারুর রিজাল বিন আনফুয়াহ ময়দানে বেরিয়ে এলো এবং সে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আহ্বান জানালো। সে ছিল এক জঘন্য মানুষ। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, সে রাসূলের (সা) যুগে ইয়ামামা থেকে হিজরত করে মদীনা চলে গিয়েছিল এবং মহানবীর (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর নিকট থেকে কুরআনে হাকিম ও দ্বীনী মাসয়ালার তালিম হাসিল করেছিল। যখন প্রয়োজনীয় তালিম হাসিল শেষ করলো তখন হুজুর (সা) তাকে ইয়ামামাবাসীর তালিমের জন্য নিয়োগ করলেন। এই হতভাগা ইয়ামামা পৌঁছে মুসায়লামা কাজ্জাবের সঙ্গে যোগ দিল এবং অত্যন্ত বেহায়ার মত মুসায়লামার মিথ্যা দাবীর এই ভাষায় সাক্ষ্য দিল যে, "আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহকে (সা) এই বলতে শুনেছি যে, মুসায়লামা আমার নবুওয়াতে শরীক রয়েছে।" যেহেতু নাহহার মহানবীর (সা) বরকতপূর্ণ খিদমতে ছিলেন এবং হুজুরের (সা) পক্ষ থেকেই মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগ হয়ে এসেছিলেন, সেহেতু হাজার হাজার মানুষ তার কথায় গুমরাহ হয়ে গেলো এবং তারা মুসায়লামার দাবী মেনে নিল। তারপর সে ময়দানে বের হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের আহ্বান জানালো। এ সময় হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং তীরের মত তার ওপর গিয়ে আছড়ে পড়লেন। নাহহার ছিল একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা। সে খুব সতর্কতার সাথে হযরত যায়েদের (রা) মুকাবিলা করলো। কিন্তু তার ঈমানী জোশের সামনে তার কোন কিছুই কার্যকর হলো না এবং সে হযরত যায়েদের (রা) হাতে মারা গেল। অতপর সাধারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মুসায়লামার কবিলা বনু হানিফা এমন প্রচন্ডভাবে হামলা চালালো যে, মুসলমানদের পা টলটলায়মান হয়ে উঠলো। কিন্তু ইসলামী বাহিনীর নেতারা মুরতাদদের হামলা প্রতিহত করার জন্য জীবনের বাজী লাগিয়ে দিলেন। আনসার সরদার হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়েস পিছু হটনেওয়ালাদের প্রতি উচ্চৈস্বরে আহ্বান জানিয়ে বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা! তোমরা নিজের নফসকে খারাব অভ্যাস শিখিয়েছ। হে আল্লাহ! আমি তোমার সামনে তাদের (ইয়ামামাবাসীদের) মাবুদ থেকে এবং তাঁদের (মুসলমান) এ তৎপরতায় (যা এখন করছে) ঘৃণা প্রকাশ করছি। হে মুসলমানরা ! দেখ, হামলা এভাবে করতে হয়।"

একথা বলে তরবারী চালাতে চালাতে তিনি বীরের মত দুশমনের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন। এক মুরতাদের আঘাতে তাঁর পা কেটে গেল। সেই কাটা পা নিয়েই তিনি এমন প্রচন্ডভাবে আঘাত হানলেন যে, শত্রুটির ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল এবং নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। মুসলমানরা পিছু হটতে হটতে যখন নিজেদের তাবুরও পিছনে হটে গেলেন তখন হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব ঈমানী আবেগে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মুসলমান! তাঁবু থেকে হটে কোথায় যাবে। আল্লাহর কসম, আজ আমি সেই সময় পর্যন্ত কথা বলবো না যতক্ষণ পর্যন্ত দুশমনকে পরাজিত না করবো। অথবা আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে ক্ষমা চাইবো। হে লোকেরা! মুসিবত বরদাশত কর। ঢাল হাতে তুলে নাও এবং দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়। হাঁ, হাঁ, অগ্রসর হও। হে মুসলমানরা! তোমরা আল্লাহর দল এবং তোমাদের শত্রু শয়তানের দল। সম্মান আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর দলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আমার উদাহরণ অনুসরণ কর। আমি যা করি, তাই তোমরা কর।

তারপর এই বলে, "হে আল্লাহ! আমি নিজের সাথীদের পিছপার জন্য তোমার নিকট ক্ষমা চাই।" হাতে তরবারী ধরে মুরতাদদের ওপর হামলা করে বসলেন এবং তাদের ব্যূহ ভেঙ্গেচুরে অনেক দূর চলে গেলেন। অবশেষে মুরতাদরা হামলা চালিয়ে তাঁর ওপর তরবারী বর্শার ও মেঘ বর্ষিয়ে দিল। এমনিভাবে বনু আদির এই বাঘ এবং হকের জানবাজ সিপাহী শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতে পৌঁছে গেলেন।

হযরত যায়েদের (রা) শাহাদাতের পর আবু হুজায়ফার (রা) আজাদকৃত গোলাম হযরত সালেম (রা) এবং অন্য আরো জানবাজ মুরতাদদের প্রতিহত করার চেষ্টায় নিজেদের জীবন কুরবান করে দিলেন। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে হযরত খালেদ (রা) বিন ওয়ালিদ নিজের বাহিনীকে নতুন করে সাজালেন এবং পুনরায় মুরতাদদের ওপর এমন জোরে হামলা চালালেন যে, তাদের পা টলে গেল। ইত্যবসরে মুসায়লামাও হযরত ওয়াহশী (রা) বিন হারব ও হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন যায়েদ আনসারীর হাতে নিহত হলো। তাতে মুরতাদদের সাহস সম্পূর্ণরূপে কমে গেল এবং তারা নিজেদের ১০ হাজার নিহতকে যুদ্ধের ময়দানে রেখে এদিক সেদিক ভেগে পালালো। ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা প্রায়ই শেষ হয়ে গেল। এই মহাফিতনা নির্মূলের জন্য হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব ও তাঁর মত অন্যান্য জানবাজ যে হিম্মত

বীরত্ব ও অটলতা প্রদর্শন করেছিলেন, নিসন্দেহে তা ইসলামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাবকে সীমাহীন ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসা শুধু এ জন্য ছিল না যে, যায়েদ (রা) তাঁর বুজুর্গ ভাই ছিলেন। বরং এ জন্যও যে আল্লাহ তায়ালা হযরত যায়েদকে (রা) উষ্ণ অন্তর দান করেছিলেন এবং তিনি সবসময় নিজের জীবন হকপথে কুরবান করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। সুতরাং তিনি যখন হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাবের শহীদ হওয়ার খবর শুনলেন তখন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কিন্তু অস্থিরতা প্রকাশের পরিবর্তে মুখ দিয়ে এই কথা বের হয়ে এলো ঃ

"যায়েদ দুই নেকীতে আমার থেকে এগিয়ে গিয়েছিল। এক হলো ইসলাম গ্রহণ এবং দ্বিতীয় হলো শাহাদাতের পেয়ালা পান।"

তা সত্ত্বেও এই দুঃখ এতো কঠিন ছিল যে, তা কোনক্রমেই ভোলার মত ছিল না। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলতেন "ভোরের মৃদু সমীরণ যখন প্রবাহিত হয় তখন তা থেকে যায়েদের (রা) খোশবু পেয়ে থাকি এবং তাঁর কথা স্মরণ হয়ে যায়।"

ইমাম হাকিম "মুসতাদরাকে" লিখেছেন, হযরত ওমর ফারুক (রা) যখন কোন মুসিবতের সম্মুখীন হতেন তখন বলতেন সবচেয়ে বড় মুসিবত ছিল যায়েদের (রা) বিচ্ছিন্নতা। তা বরদাশত করেছি এবং ধৈর্য ধারণ করেছি। এখন তা থেকে বেশী আর কি মুসিবত হতে পারে।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে একবার আরবের নামকরা কবি মুতাম্মাম বিন নবিরা তাঁর খিদমতে হাজির হলো। মুতাম্মামের ভাই মালিক বিন নুয়াইরাকে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) খিলাফতকালে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ ভুলের বশবর্তী হয়ে হত্যা করে ফেলেছিলেন। এই ঘটনায় সে এতো দুঃখ পেয়েছিল যে, সবসময় নিজের মাহবুব ভাইয়ের দুঃখে কাঁদতো এবং মরছিয়া বলতো। যেখানেই যেতো মানুষ তার চারপাশে একত্রিত হতো এবং তার নিকট থেকে মরছিয়া শুনতো। সে মরছিয়া পড়তে পড়তে নিজেও কাঁদতো এবং শ্রোতাদেরকেও কাঁদাতো। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "মুতাম্মাম, ভাইয়ের বিচ্ছিন্নতায় তুমি কেমন দুঃখ পাও?" সে আরজ করলো ঃ "আমিরুল মু'মিনীন, কোন এক কারণে আমার একটি চোখের অশ্রু শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভাইয়ের দুঃখে অশ্রু এমনভাবে প্রবাহিত হয়েছে যে, তা আজ পর্যন্ত আর বন্ধ হয়নি।

হযরত ওমর (রা) বলেন, "এটা দুঃখের চরম পর্যায়। কেউ কোন মৃত ব্যক্তির জন্য এমন দুঃখ প্রকাশ করে না।" অতপর তিনি মুতাম্মামের নিকট ভাইয়ের শোকে রচিত কোন মরছিয়া শুনানোর ফরমায়েশ দিলেন। সে রোরুদ্যমান কণ্ঠে এক হৃদয়বিদারক মরছিয়া পাঠ করলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) সেই মরছিয়া শুনে খুব প্রভাবিত হলেন এবং মুতাম্মামকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "আমি যদি এমন মরছিয়া বলতে পারতাম তাহলে নিজের ভাই যায়েদের (রা) মরছিয়া বলতাম।" মুতাম্মাম আরজ করলেন, "আমিরুল মু'মিনীন, আমার ভাই যদি আপনার ভাইয়ের মত (জিহাদের ময়দানে) শহীদ হতো তাহলে আমি অবশ্যই অশ্রু ফেলতাম না।"

হযরত ওমর (রা) বললেন, "তুমি আমাকে যেভাবে শোক জ্ঞাপন করেছ তার থেকে উত্তম শোক আর কেউ কখনো জ্ঞাপন করেনি।"

হযরত যায়েদ (রা) শাহাদাতের সময় দু' স্ত্রী ও দু' সন্তান রেখে গিয়েছিলেন। স্ত্রীদের নাম হলো লুবাবা ও জামিলা। লুবাবার গর্ভে জন্ম নিয়েছিল পুত্র আবদুর রহমান। আর জামিলার গর্ভে কন্যা আসমা জন্ম নিয়েছিল।

হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস হাদীসের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

হযরত আবু ফাকিহা ইয়াসার ইযদি (রা)

হযরত আবু ফাকিহা ইয়াসার ইযদি (রা) কুরাইশের আবদি দার খান্দানের গোলাম ছিলেন। অসহায় ও সাহায্য সহযোগিতাহীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বুকে বাঘের অন্তর ছিল। গরীবদের অভিভাবক এবং অসহায়দের ত্রাণকর্তা (সা) যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন আরবে তাওহীদের মশাল জ্বালালেন তখন আবু ফাকিহা (রা) নির্ভীকভাবে সামনে অগ্রসর হলেন এবং সেই মশাল বা প্রদীপের পতঙ্গ হয়ে গেলেন। তাঁর মালিক উমাইয়া বিন খালফ নিজের গোলামের এই সাহসিকতায় ক্রোধ বহ্নিতে জ্বলে উঠলো এবং সে অসহায় আবু ফাকিহার ওপর সীমাহীন জুলুম-নির্যাতন চালানো শুরু করলো। জালেম নিজেই তাঁকে নিত্য নতুন শাস্তির নিশান বানাতো এবং নিজের পরিবারের লোকদেরকেও তাঁর ওপর নির্যাতন চালানোর সাধারণ অনুমতি দিয়ে রেখেছিল। তারা যখন ইচ্ছা তখন তাঁর ওপর নির্যাতনের অনুশীলন চালাতো। এই জালেম উত্তপ্ত বালির ওপর দ্বিপ্রহরের সময় হযরত আবু ফাকিহাকে (রা) উপুর করে শুইয়ে দিত এবং পিঠের ওপর একটি ওজনদার পাথর রেখে দিত। তিনি সাহসিকতার সাথে এই শাস্তি সহ্য করতেন। এমনকি ভয়াবহ গরম এবং অসহনীয় কষ্টে বেহুশ হয়ে যেতেন। এত কষ্ট ও নির্যাতন সত্ত্বেও তার মুখ দিয়ে শির্‌কমূলক কোন কথা উচ্চারিত হতো না।

একদিন পাষাণ উমাইয়া হযরত আবু ফাকিহার (রা) উভয় পায়েই রশি বাঁধলো এবং তাঁকে নির্দয়ভাবে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেলো। সেটা ছিল দ্বিপ্রহরের সময়। সূর্য থেকে আগুন বর্ষিত হচ্ছিল। উমাইয়া আবু ফাকিহাকে (রা) উত্তপ্ত বালুর ওপর নিক্ষেপ করলো। উমাইয়া পুত্র সাফওয়ানও পিতার পিছনে পিছনে সেখানে পৌছলো এবং আবু ফাকিহাকে (রা) সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, "আমার পিতা তোর রব নয়?"

তাওহীদ প্রদীপের পতঙ্গ আবু ফাকিহা (রা) তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন ঃ

"অবশ্যই নয়। আমার রব হলেন আল্লাহ তায়ালা। যিনি সকলের স্রষ্টা ও মালিক এবং যিনি সকলকে রুজী দিয়ে থাকেন।"

এই জবাবে সাফওয়ান তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং সে হযরত আবু ফাকিহার (রা) গলা এত জোরে চেপে ধরলো যে তাঁর জিহবা বাইরে বেরিয়ে পড়লো এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে অনুভূতিহীন ও স্পন্দনহীন হয়ে পড়লেন।

সাফওয়ান ও উমাইয়া মনে করলো যে, কারবার শেষ। কিন্তু তখনো তাঁর মধ্যে জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। ঘটনাক্রমে সে সময় অসহায়দের বন্ধু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হযরত আবু ফাকিহার (রা) প্রতি হৃদয়-বিদারক নির্যাতনের দৃশ্য দেখলেন। তাতে তাঁর অন্তর ধরে এলো এবং তিনি তৎক্ষণাৎ আবু ফাকিহাকে (রা) উমাইয়া বিন খালফের কাছ থেকে কিনে আযাদ করে দিলেন। কিন্তু হযরত আবু ফাকিহা (রা) আজাদ হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় মুশরিকদের জুলুম নির্যাতনের হাত থেকে মাহফুজ ছিলেন না। সুতরাং হাবশার দ্বিতীয় হিযরতে তিনিও অন্যান্য মুসলমানের সাথে হাবশা গমন করেন। হক পথে মুসিবত সইতে সইতে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল এবং দৈহিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বদরের যুদ্ধের কিছু দিন পূর্বে তিনি পরপারের ডাকে সাড়া দেন। হযরত আবু ফাকিহা (রা) সেই সব অটল ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা চরম প্রতিকূল ও কঠিন অবস্থাতেও প্রকাশ্যে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতেন। ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা অনেক উচ্চে।

হযরত আবু কায়েস (রা) বিন হারিছ সাহমী

নাম ছিল আবু কায়েস। কুনিয়াত ছিল আবু কায়েসই। কুরাইশের বনু সাহাম খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ আবু কায়েস (রা) বিন হারিছ বিন কায়েস বিন আদি বিন সায়াদ বিন সাহাম।

তাঁর দাদা কায়েস বিন আদি কুরাইশের অন্যতম সরদার ছিল এবং পিতা হারিছ বিন কায়েসও মুশরিকদের মধ্যেকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিল। তারা এমন নীচ প্রকৃতির মানুষ ছিল যে, কুরআনে করিম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। হাফেজ ইবনে আবদুল বার "আল-ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখিছেন যে, সূরায়ে হিজরের এই আয়াতসমূহ এমনি ধরনের লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল।

الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ○ فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ ○

"যারা নিজেদের কুরআনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। অতএব, শপথ তোমার আল্লাহর নামে, আমরা অবশ্যই এসব লোককে জিজ্ঞেস করবো যে, তোমরা কি করছিলে ? কাজেই হে নবী, যে জিনিসের হুকুম তোমাকে দেয়া হচ্ছে তা জোরেশোরে উচ্চ কণ্ঠে বলে দাও এবং শির্ককারীদের বিন্দুমাত্র পরোয়া করো না। তোমার পক্ষ থেকে সে সব বিদ্রূপকারী সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরাই যথেষ্ট।"(আল হিজর ঃ ৯১-৯৫)

হারিছ বিন কায়েসের সাত পুত্র ছিল। তারা হলো আবু কায়েস, আবদুল্লাহ, সায়েব, তামিম, মা'বাদ, হাজ্জাজ ও সাঈদ। আল্লাহর কি কুদরত ! হারিছের মত ইসলামের শত্রুর ৬ পুত্র কায়েস (রা) আবদুল্লাহ (রা), সায়েব (রা), তামিম (রা), হাজ্জাজ এবং সাঈদের (রা) ইসলাম ও হিজরতের মর্যাদা লাভ ঘটেছিল। (মা'বাদের প্রসঙ্গে চরিতগ্রন্থসমূহ নীরব) হযরত আবু কায়েস (রা) দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে ঈমান আনয়ন করেন এবং নবুওয়াতের ৬ বছর পর হিজরত করে হাবশা চলে গিয়েছিলেন তাঁর ভাইও সঙ্গে ছিলেন। সেখানে কয়েক বছর অতিবাহিত করার পর ওহোদের যুদ্ধের পূর্বে মদিনা মুনাওয়ারা

চলে আসেন এবং ওহোদ, খন্দক, খাইবার, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তাবুকসহ সকল যুদ্ধে মহানবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সম্মান লাভ করেন।

রহমতে আলমের (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খলিফার মসনদে সমাহীন হলেন। এ সময় সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন জ্বলে উঠলো। এই ফিতনা নির্মূলের জন্য যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ও রক্তাক্ত যুদ্ধ ছিল "ইয়ামামার যুদ্ধ।" মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে এই লড়াই হয়েছিল। হযরত আবু কায়েসও (রা) মুজাহিদীনে ইসলামে শামিল ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে নিজের জীবন হক পথে কুরবান করে দিয়েছিলেন। তার ভাই আবদুল্লাহ (রা) সেই যুদ্ধে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। ইবনে সায়াদ (রা) বর্ণনা করেছেন হযরত আবু কায়েসের (রা) অন্য ভাইয়েরাও বিভিন্ন যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তামিম (রা) আজনাদাইনের যুদ্ধে, সায়েব (রা) ফাগালের যুদ্ধে, হাজ্জাজ (রা) ও সাইদ (রা) ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা সাহমী

সাইয়্যেদেনা হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে যখন মুসলমানদের বিজয়ের প্লাবন সিরিয়ায় প্রবেশ করলো তখন রোমকদের মুসলমান বিদ্বেষের নেশা এমন পর্যায় পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল যে, তারা যুদ্ধ বন্দীদেরকেও অত্যন্ত নৃশংসভাবে শহীদ করে ফেলতো। আরব ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, রোমকরা একটি বিরাট গাভী বানিয়ে রেখেছিল। তার পেটে যাইতুনের তেল রেখে নীচে আগুন জ্বালাতো। মুসলমান কয়েদী যদি খৃস্টধর্ম কবুল করে নিত তাহলে তাদের ছেড়ে দিত। আর যদি নিজের দ্বীন ছাড়তে অস্বীকৃতি জানাতো তাহলে তাদেরকে তেলে নিক্ষেপ করতো।

একবার সিরিয়ার এক যুদ্ধে ৮০/৮১ জন মুজাহিদ রোমকদের হাতে বন্দী হলো। এই মুসলমান কয়েদীদের মধ্যে বিরাট বপুর একজন সাহাবীও ছিলেন। তাঁর কপাল সৌভাগ্যের আলোয় ঝলমল করছিল এবং চেহারায় ছিল বিস্ময়কর ধরনের মহিমা। সিরীয় বাহিনীতে স্বয়ং রোমের বাদশাও ছিল। রোমকরা সেই সাহাবীকে (রা) গ্রেফতার করে বাদশাহর নিকট নিয়ে গেল। বাদশাহ তাকে খৃস্টধর্ম গ্রহণের দাওয়াত দিল। কিন্তু তিনি পরিষ্কারভাবে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বাদশাহ তাকে বললো যে, নিজের পরিণাম ভালোভাবে চিন্তা করে নাও। তুমি যদি অস্বীকার করতেই থাকো, তাহলে তোমাকে তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করা হবে। রাসূলের (সা) সেই সাহাবী বেধড়ক জবাব দিলেন যে, যাই কর না কেন আমি আমার দ্বীন পরিত্যাগ করবো না। এরপর রোমকরা তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য অন্য আরেক মুসলামন কয়েদীকে বাদশাহর নিকট আনলো। সে এই কয়েদীকেও ইসলাম পরিত্যাগের কথা বললো। কিন্তু সেই হকপন্থী বান্দাও স্পষ্ট অস্বীকার করে বসলো। তাতে রোমক জালেমরা তাকে তপ্ত তেলের মধ্যে নিক্ষেপ করলো এবং তিনি মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে ভুনা কাবাব হয়ে গেলেন। রাসূলের (সা) সেই সাহাবী (রা) নিজের মজলুম সঙ্গীর পরিণাম দেখে কাঁদতে লাগলেন। রোমকরা বললো, এখন মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে কাঁদছো কেন। এখনো সময় আছে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলে আমরা তোমাকে মুক্ত করে দিব।

রোমকদের কথা শুনে সেই সাহাবীর (রা) চোখে এক নূরানী চমক সৃষ্টি হলো এবং অত্যন্ত মহিমান্বিত কণ্ঠে বললেন, "আমি মৃত্যু ভয়ে কাঁদছি না বরং এজন্য কাঁদছি যে আল্লাহর পথে কুরবান করার জন্য আমার নিকট শুধু একটি

জীবন আছে। হায়! এক জীবনের পরিবর্তে যদি আমার প্রতিটি চুলের স্থানে এক একটি জীবন হতো এবং আমি সেই সব জীবন হক পথে বিলিয়ে দিতাম।" রোমকরা তাঁর ঈমানী শক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে গেল এবং এমন পোক্ত ঈমান সম্পন্ন মানুষকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য আরো অস্থির হয়ে পড়লো।

তারা রাসূলের (সা) সেই সাহাবীকে (রা) বললো, আমাদের বাদশাহর কপালে যদি চুমু দাও তাহলে আমরা তোমাকে এখনই মুক্ত করে দেব।

তিনি ক্রুশ পূজারী বাদশাহর কপালে চুমু দানেও অস্বীকৃতি জানালো। তারপর রোমকরা তাকে ধন-সম্পদ ও সুন্দরী মহিলার লোভ দেখালো কিন্তু তিনি সব প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করলেন। অবশেষে রোমক বাদশাহ্ কায়সার বললো যে, আমার কপালে চুমু দাও, তাহলে সকল মুসলমান কয়েদীকে মুক্ত করে দেয়া হবে। নিজের মুসলমান ভাইদের খাতিরে সেই সাহাবী (রা) কালবিলম্ব না করে সামনে অগ্রসর হলেন এবং বাদশাহর কপালে চুমু দিলেন। এমনিভাবে ৮০ জন মুসলমানের মূল্যবান জীবন বেঁচে গেল।

রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা) যখন মদীনা মুনাওয়ারা আসেন এবং আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুককে (রা) এই ঘটনা শুনালে তখন তিনি আনন্দের আতিশয্যে তার কপালে চুমু দিলেন এবং অন্য মুসলমানদেরকেও তার মাথায় চুমু দানের কথা বললেন।

দৃঢ়তা ও অটলতার এই পাহাড়, যাঁর নিষ্ঠা ও ত্যাগের প্রশংসা করেছিলেন আরব ও আজমের খলিফা সাইয়েদেনা ফারুকে আজম (রা) তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা সাহমী।

সাইয়েদেনা আবু হুজায়ফা আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা কুরাইশের শাখা বনু সাহামের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা বিন কায়েস বিন আদি বিন সায়াদ বিন সাহাম বিন ওমর বিন হামিস বিন কা'ব বিন লুব্বী।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফাকে আল্লাহ পাক সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি নবুয়াতের প্রথম যুগে সেই সময় তাওহীদের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন। যখন এ কাজ করাটা ছিল ভয়ংকর মুসিবত ডেকে আনার নামান্তর। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা)-ও অন্যান্য হকপন্থীর মত কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনের নিশানা হয়ে গেলেন। কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন যখন সীমা অতিক্রম করে গেল তখন নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা হুজুরের (সা) ইঙ্গিতে অন্য অনেক মজলুম

মুসলমানের সাথে হিজরত করে হাবশা চলে যান এবং সেখানে কয়েক বছর উদ্বাস্তুর জীবন কাটাতে লাগলেন। তিনি হাবশা থেকে কখন ফিরে এলেন ? ঐতিহাসিকরা তার ব্যাখ্যা দেননি। একটি মত হলো যে, তিনি বদরের যুদ্ধের পূর্বে ফিরে এসেছিলেন এবং তাঁর বদরের সাহাবীদের দলে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকার বলেছেন যে, বদরের যুদ্ধ ছাড়া তিনি নবীর (সা) অন্য সকল যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন এবং নিজের জানবাজির নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির (৬ষ্ঠ হিজরী) পর মহানবী (সা) যখন প্রতিবেশী দেশসমূহের শাসকদের নামে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রাদি প্রেরণ করেন তখন তার মধ্য থেকে একটি পত্র ইরানের বাদশাহর নামেও প্রেরণ করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুজুর (সা) পত্রটি হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফার নিকট সোপর্দ করে তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন তা বাহরাইনের গভর্নরের মাধ্যমে কিসরার নিকট পৌঁছে দেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা অত্যন্ত সুন্দরভাবে হুজুরের (সা) ইরশাদ তামিল করলেন এবং নবীর পত্র সকল ধরনের হেফাজতের সাথে বাহরাইনের শাসক পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। চরিতকাররা এটা পরিষ্কার করে বলেননি যে, বাহরাইনের শাসক এই পত্রসহ হযরত আবদুল্লাহ (রা) মাদায়েন প্রেরণ করেছিলেন অথবা নিজের কোন মানুষের হাতে তা রাজধানীতে প্রেরণ করেছিলেন। যা হোক, এই পত্র কিসরা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

রহমতে দো আলমের (সা) প্রতি হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফার সীমাহীন ভালোবাসা এবং রাসূলের (সা) মুখ দিয়ে নিসৃত সকল বাক্যের সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থাটা উদাহরণ তুল্য ছিল। সহীহাইনে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর প্রিয় নবী (সা) বাইরে তাশরীফ নিলেন এবং সাহাবীদেরকে জোহরের নামায পড়ালেন। যখন সালাম ফিরালেন তখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে কিয়ামতের কথা উল্লেখ করলেন। এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ করলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে। তারপর (আবেগময়ী অবস্থায়) বললেন, যে কিছু জানতে চায় সে যেন জিজ্ঞেস করে নেয়। আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো, তোমরা আমার নিকট যা জিজ্ঞেস করবে, আমি তোমাদেরকে তা বলবো। একথা শুনে লোকেরা খুব কাঁদলো। এদিকে তিনি বারবার বলছিলেন, জিজ্ঞেস করো। শেষে আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কে ? তিনি বললেন, তোমার পিতা হলো হুজাফা। তারপরও তিনি একই কথা বলতে

লাগলেন যে, জিজ্ঞেস করো, আরো জিজ্ঞেস করো। তখন ওমর (রা) হাঁটুর ওপরে বসে পড়লেন এবং বললেন, আমরা আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মদকে (সা) রাসূল মেনে সন্তুষ্ট হয়েছি। তাঁর কথা শুনে হুজুর (সা) চুপ মেরে গেলেন। তারপর বললেন, খবরদার! সেই সত্তার কসম যার কবজায় মুহাম্মদের (সা) জীবন রয়েছে। কেবলই প্রাচীরের দিকে জান্নাত ও জাহান্নাম উদাহরণ স্বরূপ আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। আমি ভালো ও মন্দের যেমন দৃশ্য আজ দেখেছি তা আর কখনো দেখিনি।

ইবনে শিহাব (রা) নিজের সনদসমূহে এই ঘটনার ওপর এইটুকুন বৃদ্ধি করেছেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফার মা আবদুল্লাহকে (রা) বললেন যে, তোমার মত অযোগ্য সন্তান আমি দেখিনি। তোমার নিকট একথার কি গ্যারান্টি ছিল যে, তোমার মা জাহেলী যুগের মহিলাদের মত কোন অপকর্ম করেনি। যদি এ ধরনের হতো তাহলে আজ তুমি সবার সামনে নিজের মাকে অপমানিত করতে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা বলেন, আল্লাহর কসম তিনি (সা) যদি আমাকে কোন হাবশী গোলামের সন্তান বলেও আখ্যায়িত করতেন তাহলে আমি নিজেকে তার সন্তানই মনে করতাম।

কতিপয় হাদীস ব্যাখ্যাকারী লিখেছেন, এই ঘটনার পটভূমি এই ছিল যে, হুজুর (সা) লোকদেরকে অহেতুক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও কতিপয় লোক প্রশ্ন থেকে বিরত রইলো না। তাতে নবী করীমের (সা) আবেগ এসে গেলো এবং তিনি সেই অবস্থাতেই মিম্বারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন যে, ঠিক আছে যার যা জানার থাকে তা জেনেই নাও। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা নিজের পিতার ব্যাপারে যে, প্রশ্ন করেছিলেন তার কারণ এই ছিল যে, কিছু মানুষ তার নসবের ব্যাপারে তোহমত লাগাতো।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলে আকরাম (সা) হযরত আবদুল্লাহ বিন হুজাফাকে কোন সারিয়াতে বা যুদ্ধে আমীর বানিয়ে প্রেরণ করেন এবং তার অধীন মুজাহিদদেরকে তাঁর নির্দেশ অমান্য না করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) কোন কথায় নিজের সঙ্গীদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং তাঁদেরকে লাকড়ী একত্রিত করে আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দিলেন। তাঁরা নির্দেশ পালন করলেন। এ সময় তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি?

তাঁরা জবাব দিলেন, "অবশ্যই দিয়েছেন।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তাহলে (আমি তোমাদেরকে আমীর হিসেবে নির্দেশ দিচ্ছি যে) এই আগুনে লাফিয়ে পড়।

প্রথমেতো সকলেই তা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু পুনরায় কিছু চিন্তা করে পরস্পরের প্রতি চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন যে, আমীরের আনুগত্য আমাদের ওপর আবশ্যক এবং কেউ বললো আমরা আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। এ জন্য আগুনে কেন লাফ দিবো।

ইত্যবসরে আগুন নিভে গেল এবং হযরত আবদুল্লাহর (রা) ক্রোধও উপশম হয়ে এলো। এসব মানুষ যখন প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে ফিরে এলো এবং সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করলো তখন হুজুর (সা) বললেন, "তোমরা যদি সেই আগুনে প্রবেশ করতে তাহলে আর কখনো বের হতে পারতে না। আমীরের আনুগত্য তো ন্যায় কাজের ব্যাপারেই হয়ে থাকে। যার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন।"

এই ঘটনার ব্যাপারে (যা নবম হিজরীতে সংঘটিত হয়) কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকার এই ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) নিজের সঙ্গীদের সাথে মজাক করেছিলেন। অর্থাৎ কৌতুক হিসেবে তিনি তাদেরকে আগুনে লাফিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয় যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) অত্যন্ত জিন্দাহ দিল মানুষ ছিলেন এবং প্রায়ই হাসি ও হাসানোর কথা বলতেন। ইবনে আসাকির (রা) যুহুরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার কতিপয় সাহাবী (রা) হুজুরের (সা) নিকট অভিযোগ করলেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা ব্যঙ্গ কৌতুকপূর্ণ কথা বলে থাকেন। তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। সে দিলে দিলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে (সা) ভালোবাসে।

প্রিয় নবীর (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) খিলাফতকালে ইরান ও সিরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলে হযরত আবদুল্লাহ বিন হুজাফাও (রা) সিরিয়া গমনকারী মুজাহিদদের মধ্যে শামিল হয়ে গেলেন এবং সিদ্দিকী ও ফারুকী শাসনামলে রোমকদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সিরিয়ার যুদ্ধসমূহের সময় একবার তিনি যে দৃঢ়তা, অটলতা এবং ঈমানী আবেগ প্রকাশ করেছিলেন তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এই ঘটনা আরব ঐতিহাসিকরা ধারাবাহিকতার সাথে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা মিসরের বিজয়সমূহেও হযরত আমর (রা) ইবনুল আছের সাথে মিলে

অংশ নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশেষভাবে "আইনে শামছের" কথা উল্লেখ করেছেন। স্থানটি হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফার হাতে জয় হয়। ইবনে আছির (রা) "উসুদুল গাব্বাহ"-তে লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) হযরত ওসমানের (রা) খিলাফত কালে মিসরে ওফাত পান এবং সেই মাটিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন হুজাফা ফযীলত ও কামালিয়াতের দিক দিয়ে খুব বুলন্দ মর্যাদার মানুষ ছিলেন। তাঁর থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে।

হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ উমুব্বী

মহানবীর (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগের ঘটনা। একদিন মক্কার এক কমনীয় যুবক হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) খিদমতে হাজির হলেন। সে সময় তার পা কাঁপছিল ও চেহারায় ছেয়েছিল দুশ্চিন্তা। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) সেই সুদর্শন যুবককে এই অবস্থায় দেখে বিস্মিত হলেন। কেননা সে কোন সাধারণ পরিবারের সদস্য ছিল না। বরং বনু আবদি শামসের সেই নামকরা সরদারের পুত্র ছিল যাকে মক্কাবাসী "জুততাজ" (মুকুটওয়ালা) লকব দিয়ে রেখেছিল এবং যার পাগড়ীর শান এমন ছিল যে, কেউ সেই রংয়ের পাগড়ী নিজের মাথায় রাখতে পারতো না। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কি ভাই, আজ এই সাত সকালে কেন আসতে হলো ?"

যুবকটি অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে জবাব দিল ঃ হে আবু বকর! রাতে আমি এক আজিব স্বপ্ন দেখেছি। সেই স্বপ্নের তাবির কি হবে তা আমার বুঝে আসছে না। সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমি আপনার নিকট এসেছি। সেই স্বপ্নের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলুন। মক্কায় আমি আপনার চেয়ে অভিজ্ঞ আর কাউকে দেখছি না—যিনি স্বপ্নের তাবির করতে পারেন।

সিদ্দিকে আকবার (রা) বললেন, "ভাতিজা, তুমি তো তোমার স্বপ্নই বর্ণনা করোনি। বলতো দেখি তুমি কি দেখেছ ?"

যুবকটি বললো, "আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, একটি গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি। সেই গর্তে আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলছিল। আমার পিতা পূর্ণশক্তি দিয়ে সেই গর্তে ফেলে দিতে চাইছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ (সা) বিন আবদুল্লাহ আমার জামার কলার খুব শক্তভাবে ধরে রেখেছেন এবং তিনি আমাকে সেই গর্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করছেন। এই দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থাতেই আমি নিদ্রা থেকে জেগে গেলাম। রাতের অবশিষ্ট অংশ আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছি এবং সকাল হতেই আপনার নিকট চলে এসেছি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) যুবকটির কথা শেষ হতেই বললেন, "প্রিয় ভাইটি আমার, আমার পরামর্শ হলো, মুহাম্মাদ (সা) যে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, তা তুমি এক্ষুণি কবুল কর। তোমার স্বপ্ন থেকে প্রকাশ পায় যে, এ কাজ করলে তুমি

অগ্নিকুণ্ডের গর্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে নিস্তার পাবে। অবশ্য তোমার পিতার কিসমতে এই সৌভাগ্য নেই। সে অবশ্যই সেই গর্তে পড়বে।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) একনিষ্ঠ পরামর্শ যুবকের অন্তরে গেঁথে গেল। সে সেখান থেকে উঠে সোজা প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন, "হে ইবনে আবদুল মুত্তালিব! আপনি কোন আদর্শের দাওয়াত দিয়ে থাকেন?"

হুজুর (সা) বললেন, "আমার দাওয়াত হলো, আল্লাহ এক এবং তিনিই ইবাদাতের যোগ্য। শুধু তাঁরই ইবাদাত করো এবং আমাকে তার রাসূল হিসেবে মানো। ঐসব পাথরের মূর্তি পূজা ত্যাগ কর। যারা কাউকে কোন কল্যাণ-অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে না। তারা তো একথাও জানে না যে, কারা তাকে পূজা করে এবং কারা করে না।" হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে যুবকটির চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তার মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বেরিয়ে এলো "হে আল্লাহর রাসূল! আমি একক আল্লাহর ওপর এবং আপনার রিসালাতের ওপর সত্য অন্তরে ঈমান আনছি। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে রাহে হকে অটল পাবেন।"

বিত্তবান পরিবারের এই যুবক যিনি সব ধরনের আরাম-আয়েশ সত্ত্বেও হক কবুলের ভীতিপূর্ণ রাস্তা গ্রহণ করেছিলেন এবং কঠিনতম পরিস্থিতিতেও বিশ্ব নবীকে (সা) আঁকড়ে ধরেছিলেন, তিনি হলেন হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ উমুব্বী।

সাইয়েদেনা হযরত আবু সাঈদ খালিদ (রা) বিন সাঈদ অত্যন্ত জালিলুল কদর সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। কুরাইশের বনু উমাইয়া খান্দানের সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

খালিদ (রা) বিন সাঈদ বিন আছ বিন উমাইয়া বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই।

আবদি মান্নাফে গিয়ে তাঁর বংশধারা রাসূলে আকরামের (সা) সঙ্গে মিলে যায়। হযরত খালিদের (রা) পিতা আবু উহাইহা সাঈদ বিন আছ অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও সৌর্যবীর্য সম্পন্ন সরদার ছিলেন এবং মক্কায় তার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, সে যে রংয়ের পাগড়ী বাঁধতো, মক্কায় আর কেউ সেই রংয়ের পাগড়ী বাঁধার সাহস পেতো না। এজন্য সে মানুষের মধ্যে "জুততাজ" বা পাগড়ীধারী উপাধিতে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। আবু উহাইহা যখন হযরত খালিদের (রা) ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পেলো তখন প্রচন্ড গোস্বায় ফেটে পড়লো। হযরত খালিদ (রা) পিতার

ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য কোথায়ও লুকিয়ে পড়লেন। আবু উহাইহা নিজের অন্য পুত্রদেরকে তাঁর সন্ধানে প্রেরণ করলো। তারা তাঁকে ধরে পিতার নিকট নিয়ে গেল। আবু উহাইহা খালিদকে (রা) প্রচন্ডভাবে গালাগাল করার পর এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করলো যে, তার হাতের বেত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মারতে মারতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো তখন বললো, মুহাম্মাদের (সা) দ্বীন পরিত্যাগ কর। নচেৎ তোমার উপায় নেই। কিন্তু খালিদ (রা) মনে প্রাণে ইসলামের অনুরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, "অবশ্যই নয়, অবশ্যই নয়। আমার জীবনও যদি চলে যায় তবুও আমি মুহাম্মাদকে (সা) কখনো পরিত্যাগ করবো না।" আবু উহাইহা খুব ভয় দেখালেন, ধমক দিলেন। কিন্তু তিনি সামান্যও টললেন না। তাতে পিতা তাঁকে পুনরায় মারলো এবং গালাগাল দিল। তারপর বললো, খালিদ তুই নিজের চোখে দেখছিস যে, মুহাম্মাদ (সা) সমগ্র কওম থেকে পৃথক পথ বেছে নিয়েছে। সে আমাদের মা'বুদদেরকে গালি দেয় এবং আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে থাকে। তোর কি লজ্জা হয় না যে, এসব ব্যাপারে তুই তাকে সমর্থন করছিস।

খালিদ নির্ভিকভাবে জবাব দিলেন, "আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ (সা) যা বলেন, আমি সব অবস্থাতেই তা পালন করবো।" আবু উহাইহা রেগে গিয়ে বললো, "নালায়েক কোথাকার! আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা। আমার গৃহে খাবার পাবি না।"

হযরত খালিদ (রা) অত্যন্ত ইতমিনানের সঙ্গে জবাব দিলেন, "আপনি আমার রিযিক বন্ধ করে দিলে আল্লাহ আমাকে রিযিক দিবেন।"

অতপর তিনি রহমত আলম (সা)-এর খিদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর সঙ্গেই থাকতে লাগলেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, একদিন মক্কার উপকণ্ঠে তিনি এক নিরিবিলি স্থানে নামায পড়ছিলেন। আবু উহাইহা এই খবর পেলো। সে তাঁকে ডেকে পুনরায় একবার বোঝানোর চেষ্টা করলো এবং নিজের পিতৃ ধর্মে ফিরে আসার উৎসাহ দিলো। কিন্তু তিনি জবাব দিলেন যে, আমৃত্যু পর্যন্ত আমি ইসলাম পরিত্যাগ করবো না।

এই জবাব শুনে আবু উহাইহা তাঁর মাথায় লাকড়ি দিয়ে আঘাত শুরু করলো। মারতে মারতে তা ভেঙ্গে গেল। তারপর সে হযরত খালিদকে (রা) কয়েদ করলো এবং তাঁর খানাপিনা বন্ধ করে দিল। হযরত খালিদ (রা) তিনদিন পর্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসায় মক্কার ভয়াবহ গরমে নির্জন কয়েদীত্বের মুসিবত সহ্য করলেন। চতুর্থ দিন সুযোগ পেয়ে পালিয়ে গেলেন এবং মক্কার উপকণ্ঠে কোথাও লুকিয়ে রলেন।

কিছুদিন পর (নবুয়তের ৬ বছর পর) ইসলাম অনুসারীরা যখন দ্বিতীয় কাফেলায় হাবশা যেতে লাগলেন তখন হযরত খালিদ (রা) মক্কা ফিরে এলেন এবং নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সেই কাফেলার সাথে হাবশা চলে গেলেন। চরিতকাররা হযরত খালিদের (রা) স্ত্রীর নাম উমাইনা লিখেছেন। আবার কেউবা লিখেছেন হুমাইনা। তিনি বনু খাযায়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং তিনিও নবুয়তের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই প্রায় তের বছর পর্যন্ত হাবশায় উদ্বাস্তুর জীবন কাটান। সেখানেই তাঁর পুত্র সাঈদ (রা) এবং কন্যা উম্মে খালিদ (রা) জন্মগ্রহণ করেন। পরে উভয়েরই সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। হযরত খালিদের (রা) হাবশা অবস্থানকালে উম্মে হাবিবা (রা) বিনতে আবি সুফিয়ান (রা) বিধবা হন। তখন প্রিয়নবী (সা) তাঁকে নাজ্জাশীর (হাবশার বাদশাহ) মাধ্যমে বিবাহের পয়গাম প্রেরণ করলেন। হযরত উম্মে হাবিবা (রা) হুজুরের (সা) পয়গাম আনন্দের সাথে কবুল করে নিলেন এবং হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদকে নিজের উকিল মনোনিত করেন। নাজ্জাশী হযরত জাফর (রা) বিন আবি তালিব ও অন্য মুসলমানদেরকে ডেকে স্বয়ং হযরত উম্মে হাবিবার (রা) গায়েবানা বিবাহ হুজুরের (সা) সঙ্গে পড়িয়ে দিলেন। এ সময় হযরত খালিদ (রা) অত্যন্ত সুন্দরভাবে হযরত উম্মে হাবিবার (রা) ওকালতির দায়িত্ব আঞ্জাম দেন এবং বিবাহের অনুষ্ঠানাদির পর মজলিশে অংশগ্রহণকারীদেরকে খাবার খাইয়ে বিদায় করেন। এই ঘটনার কিছু দিন পর হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ নিজের পরিবার-পরিজন এবং অন্য মুসলমানদের সঙ্গে হাবশা থেকে হিজরত করে মদীনা চলে আসেন। সময়টা ছিল ৬ হিজরীর শেষের দিকে অথবা সপ্তম হিজরীর শুরুর দিকে। সে সময় মহানবী (সা) খায়বারের যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ হাবশা থেকে প্রত্যাগমনকারী অন্য সকল মুসলমান মহিলাকে মদীনা রেখে জিহাদের উৎসাহে সোজা খায়বার পৌছলেন। তখন খায়বার বিজয় হয়েছে এবং মুসলমানরা বিজয় উৎসব পালন করছিলেন। উদ্বাস্তু ভাইদেরকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে খুশী দ্বিগুণ হয়ে গেল। হুজুর (সা) তাঁদেরকে আহলান সাহলান মারহাবা বললেন এবং তাঁদের সবার সঙ্গে মুয়ানাকা করলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াবে" লিখেছেন যে, যদিও এসব সাহাবী খায়বারের যুদ্ধে বাস্তবত শরীক হতে পারেননি, তবুও বিশ্ব নবী (সা) গনিমতের মালে তাঁদের অংশ নির্ধারণ করে দিলেন।

তারপর হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ কাজা ওমরায় রহমতে আলমের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি

সেই দশ হাজার পবিত্র নফসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের ব্যাপারে হাজার হাজার বছর পূর্বে কিতাবে ইসতিছনাতে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছিল।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ হুনাইন, তায়েফ ও তাবুকের যুদ্ধে রাসূলের (সা) বন্ধুত্বের হক আদায় করেছিলেন।

বদর, ওহোদ এবং খন্দকের যুদ্ধসমূহ হযরত খালিদের (রা) হাবশা অবস্থানকালে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তাতেও অংশগ্রহণের বঞ্চনায় সারাজীবন তাঁর আফসোস ছিল। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি রাসূলের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আফসোস যে, আমরা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের মর্যাদা লাভ করতে পারিনি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তোমরা কি এটা পসন্দ করনি যে অন্যেরা এক হিজরতের মর্যাদা পেয়েছেন। আর তোমরা (হাবশার মুহাজির) পেয়েছ দুই হিজরতের মর্যাদা।"

হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ কুরাইশের সেই হাতে গোনা কতিপয় মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা নবুওয়াতের সময় ভালোভাবে লিখাপড়া জানতেন। বস্তুত তিনি যখন হাবশা থেকে মদীনা এলেন তখন হুজুর (সা) তাঁকে দিয়ে প্রায়ই পত্রাদি লিখাতেন। যারকানী (র) বর্ণনা করেছেন যে, নবম হিজরীতে বনু ছাকিফ প্রতিনিধি দল রিসালাতের দরবারে হাজির হলে তাদের ও হুজুরের (সা) মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদন হয়েছিল তা হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মুসনাদে আবু দাউদে আছে যে, হুজুর (সা) ইয়েমেনবাসীকে যে নিরাপত্তানামা দিয়েছিলেন তাও হযরত খালিদই (রা) লিখেছিলেন।

হযরত খালিদের (রা) দুই সহোদর আমর (রা) বিন সাঈদ এবং আবান (রা) বিন সাঈদও ইসলাম গ্রহণের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। প্রিয় নবী (সা) এই তিন ভাইকে অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাঁদেরকে নেতৃত্ব কর্তৃত্বের যোগ্য মনে করতেন। সুতরাং তিনি হযরত খালিদকে (রা) ইয়েমেনের, হযরত আবানকে (রা) বাহরাইনের এবং হযরত আমরকে (রা) তাইমার রাজস্ব আদায়কারী নিয়োগ করেছিলেন। তিন সহোদর হুজুরের (সা) আস্থায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন এবং মহানবীর (সা) ওফাত পর্যন্ত নিজেদের দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে থাকেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন যে, তিনজনই হুজুরের

(সা) ওফাতের খবর শুনলেন। এই হৃদয়বিদারক খবর তিন জনের উপর একই প্রভাব ফেললো এবং তিনজনই নিজেদের পদত্যাগ করে মদীনা চলে এলেন। সে সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের মসনদে আসীন হয়েছিলেন। তিনি তিন সহোদরকেই ডেকে বললেন, তোমাদেরক স্বয়ং রাসূলে করিম (সা) সেই সব পদে নিয়োগ করেছিলেন। এজন্য তোমরা ছাড়া আর কেউ তার বেশী যোগ্য হতে পারে না। আমি চাই যে, তোমরা পূর্বেকার মত নিজেদের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকবে। কিন্তু তিন ভাইই একই জবাব দিলেন যে, আমরা রাসূলের (সা) পর অন্য কারোর আমেল হতে পারি না।

ইবনে জারির তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, মদীনা ফিরে আসার পর হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ দুই মাস পর্যন্ত হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) হাতে বাইয়াত করতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন। কিন্তু সিদ্দিকে আকবার (রা) এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কোন বাদানুবাদ করেননি। তারপর তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) সুন্দর চরিত্র এবং ধৈর্য ও স্থৈর্যে এত প্রভাবান্বিত হন যে, আনন্দচিত্তে তার বাইয়াত করেন। বাইয়াত গ্রহণের ব্যাপারে তার এই বিলম্বের কারণ সম্ভবত এই ছিলো যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) সম্পর্ক ছিল কুরাইশের সব চেয়ে ছোট কবিলা "বনি তাইমের" সঙ্গে এবং হযরত খালিদ (রা) নেক নিয়তের সঙ্গে মনে করতেন যে, খিলাফতের পদের জন্য এমন ব্যক্তিই যোগ্য যিনি বনু হাশিম অথবা বনু উমাইয়ার মত প্রভাবশালী কবিলার সাথে সম্পর্ক যুক্ত হবেন। কিন্তু তিনি যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) ব্যক্তিত্বে সেসব গুণাবলী পেলেন যা তখন মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। সে সময় তিনি বাইয়াত করায় একমুহূর্তও বিলম্ব করলেন না।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মদ্রোহিতার আগুন এত দ্রুততার সাথে প্রজ্জ্বলিত হলো যে, তার স্ফুলিঙ্গ দেখতে দেখতে সমগ্র আরব ভূমিকে গ্রাস করে ফেললো। হাতে গোণা কয়েকটি কবিলা ছাড়া আরবের এমন কোন কবিলা ছিল না যা এই বিরাট ফিতনায় প্রভাবিত হয়নি। এই নাযুক অবস্থায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) অটল পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিজের হিম্মত, বীরত্ব, তাদবীর ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে ইসলামী খিলাফতের কিশতিকে ভয়াবহ মুসিবত থেকে সহিসালামতে তুলে নিয়ে আসলেন। ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা নির্মূলে যেসব মানুষ জীবনের বাজী লাগিয়ে দিয়েছিলেন হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদও তাঁদের অন্যতম ছিলেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধসমূহে একবার তাঁর মুকাবিলা হলো আমর বিন মাদিকারব

যুবেয়দীর সঙ্গে। আমর বিন মাদিকারব সুঠামদেহী মানুষ ছিল এবং আরবের নামকরা বাহাদুরদের মধ্যে পরিগণিত হতো। কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী তাকে এক হাজার সওয়ারের সমান মনে করা হতো। দুর্ভাগ্যবশত সে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার আসওয়াদ আনসীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তার সমর্থকদের দলে শামিল হয়। হযরত খালিদ (রা) দৈহিক শক্তির দিক থেকে যদিও আমর বিন মাদিকারবের সমান ছিলেন না। কিন্তু ঈমানী জোশ তাঁর বাহুদ্বয়ে বিদ্যুত ভরে দিয়েছিল। তিনি আমর বিন মাদিকারবকে শুধু আহতই করেননি বরং তার তরবারী ও ঘোড়াও ছিনিয়ে নেন। আমর বিন মাদিকারব পালিয়ে জীবন রক্ষা করে এবং পরে পুনরায় মুসলমান হয়ে সিরিয়ার যুদ্ধে মূল্যবান খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা নির্মূল হওয়ার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ইরান ও সিরিয়ার অভিযানসমূহের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং মুসলমানদেরকে ইরান ও সিরিয়ার ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে গমনের জন্য উৎসাহ দিলেন। হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ সেই জীবন উৎসর্গকারীদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) জিহাদের ডাকে সর্বপ্রথম সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি খলিফাতুর রাসূলকে (সা) সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

"আল্লাহর কসম, আমর পসন্দ হলো যে, আমি কোন উঁচু পাহাড় থেকে নীচে পড়ে যাই অথবা আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী স্থানে আমাকে কোন হিংস্র পাখী উঠিয়ে নিয়ে যাক কিন্তু আমি এটা পসন্দ করিনা যে, আপনি আমাকে ডাকবেন আর আমি চুপ মেরে থাকবো। আপনি নির্দেশ দেবেন, আর আমি তা তামিল করবো না। আল্লাহর কসম, না দুনিয়ার প্রতি আমার কোন মুহাব্বাত বা আসক্তি আছে, না আমি দীর্ঘ জীবন কামনা করি। তোমরা সকলে স্বাক্ষী থেকো যে, আমি, আমার আত্মীয় স্বজন এবং আমার নওকর-চাকর সকলেই হক পথে লড়াই করার জন্য ওয়াকফ হয়ে আছি। আমরা সবসময় দ্বীনের দুশনের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকবো। ততক্ষণে আল্লাহ তাদেরকে খতম করে ফেলবে অথবা আমরা সকলেই নিজের জীবন কুরবান করে দেব।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদের জন্য দোয়া করলেন এবং তাঁকে তাইমা (সিরিয়া) গমনকারী সাহায্যকারী বাহিনীর অফিসার নিয়োগ করলেন। হযরত খালিদ (রা) নিজের বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হতে লাগলেন। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) কে সম্বোধন করে বললেন, "হে খলিফাতুর রাসূল! আপনার হাত এগিয়ে দিন।

জানিনা, আজকের পর পুনরায় এই দুনিয়ায় সাক্ষাত ঘটে কিনা। আল্লাহ যদি মুলাকাতের সুযোগ দেন তাহলে আমরা তার ক্ষমার আকাংখী থাকবো এবং আজকের পর যদি ভাগ্যে পুনরায় মুলাকাত না থাকে তাহলে আল্লাহর নিকট দোয়া হলো যে, তিনি যেন আমাকে ও আপনাকে জান্নাতে রাসূলের (সা) যিয়ারতের সৌভাগ্য দান করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হাত বাড়িয়ে হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদের সাথে অত্যন্ত মুহাব্বাত ও উষ্ণতার সাথে আলিঙ্গন করলেন। এই দৃশ্য এত হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, হযরত আবু বকর (রা), হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ এবং অন্যসব মুসলমান অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। সকলের উপরই বেশ কিছুক্ষণ ভাবাবেশ দেখাদিল। অতপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেন, "দাঁড়াও, আমরা কিছুদূর তোমাদের সাথে যাবো।" হযরত খালিদ (রা) আরজ করলেন, "আমি তা চাই না।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেন, "কিন্তু আমি ও অন্য মুসলমানরা তাই চায়।" সুতরাং সকলে উঠে দাঁড়ালেন এবং মদীনার বাইরে পর্যন্ত হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে গেলেন।

রোমকরা তাইমার দিক থেকে হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদের অগ্রযাত্রার খবর পেলো। এ সময় তারা খুব জোরে শোরে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করলো এবং সিরিয়ার সীমান্তে বসবাসরত কতিপয় মুরতাদ আরব কবিলাকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে বিভিন্ন দিকে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করলো। হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ দরবারে খিলাফতের হিদায়াত অনুযায়ী তাদের ওপর এমন প্রচন্ডভাবে হামলা চালালেন যে, সকল রোমক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং সেই সব সমর্থক আরব গোত্রসমূহ তওবা করে দ্বিতীয়বার ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিলো। তারপর রোমকদের একজন নামকরা সরদার বাহান এক বিরাট বাহিনী নিয়ে হযরত খালিদের (রা) মুকাবিলা করতে এলো। হযরত খালিদ (রা) তাকে পরাজিত করলেন এবং সে নিজের সৈন্যকে দামেস্ক হটিয়ে নিলো। হযরত খালিদ (রা) তার পিছু ধাওয়া করতে করতে অব্যাহতভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং দামেস্ক ও ওয়াকুসার মধ্যবর্তী একস্থানে গিয়ে তাঁবু ফেললেন। অন্যদিকে বাহান নিজের সৈন্য দলকে ইসলামী বাহিনীর চারদিকে ছড়িয়ে দিল এবং স্বয়ং একটি মজবুত বাহিনীসহ মুসলমানদের ওপর হামলার জন্য সামনে অগ্রসর হলো। পথিমধ্যে সে হযরত খালিদের (রা) পুত্র সাঈদকে (রা) একটি ছোট বাহিনীসহ পেলো। রোমকরা ঘেরাও করে হযরত সাঈদ (রা) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে শহীদ করে ফেললো। হযরত খালিদ (রা)

হঠাৎ করে পুত্রের শাহাদাতের খবর পেয়ে খুব দুঃখ পেলেন এবং শোকাভিভূত অবস্থায় তিনি নিজের বাহিনীকে নিয়ে পিছু হটে গেলেন। বাহান সামনে অগ্রসর হয়ে ইসলামী বাহিনীর ওপর চরম আঘাত হানতে চাইলো। কিন্তু মুসলমানদের এক জানবাজ সরদার ইকরামা জুলকালা (রা) বাহানকে সামনে অগ্রসর হওয়া থেকে নিবৃত্ত করলো এবং হযরত খালিদ (রা) পিছু হটতে হটতে জুলমারওয়া নামক স্থানে এসে তাঁবু ফেললেন। কিছুদিন পর সেখান থেকে মদীনা আগমন করলেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁর পিছু হটে আসায় অসন্তোষ প্রকাশ এবং খুব করে ভর্ৎসনা করলেন। হযরত খালিদ (রা) এই বলে ক্ষমা চাইলেন যে, পুত্রের বিচ্ছিন্নতার শোক তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল এবং তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁর ওজর কবুল করলেন এবং তাঁকে পুনরায় জিহাদে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ দ্বিতীয়বার সিরিয়া গিয়ে একজন সাধারণ সিপাহীর মত হযরত আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহর বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন এবং অতীতের ভুল সংশোধনের জন্য নিজের জীবন হাতের ওপর রাখলেন। তিনি রোমকদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধে জীবনবাজী রেখে অংশ নিলেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকরা দামেস্ক ও ফাহালের যুদ্ধসমূহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এসব যুদ্ধে তিনি উৎসাহ ও আত্মহারা অবস্থায় অংশ নিয়েছিলেন। সেই যুগেই হযরত খালিদ (রা) হযরত ইকরামা (রা) বিন আবি জেহেলের বিধবা পত্নী হযরত উম্মে হাকিমকে (রা) নিকাহ করেন। ফাহালের যুদ্ধের পর ইসলামী বাহিনী "মারজে সফর" পৌঁছলে হযরত খালিদ (রা) সেখানেই রুসমে উরুসী আদায়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। উম্মে হাকিম (রা) বললেন, দুশমন মাথার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের পরাজিত করে ইতমিনানের সাথে এই রসম আদায় করলে ভালো হতো না।

হযরত খালিদ (রা) বললেন ঃ "এই যুদ্ধে নিজের শাহাদাতের ব্যাপারে আমার আস্থা রয়েছে।" উম্মে হাকিম (রা) চুপ মেরে গেলেন। একটি পুলের নিকট যা বর্তমানে 'কানতারায়ে উম্মে হাকিম (রা)' নামে অভিহিত, সেখানে রুসমে উরুসী আদায় হয়। হযরত খালিদ (রা) সকালে ওয়ালিমার দাওয়াতের ব্যবস্থা করেন। লোকজনের খাওয়া-দাওয়া তখনো শেষ হয়নি। এমন সময় রোমকরা হামলা করে বসলো। তাদের একজন সুঠামদেহী যুদ্ধবাজ ব্যক্তি সর্বাগ্রে থেকে মুসলমানদেরকে মুকাবিলার আহ্বান জানাচ্ছিল। হযরত খালিদ (রা) তীর বেগে তার সাথে মুকাবিলার জন্য বের হয়ে গেলেন এবং খুব বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে তার হাতে শহীদ হলেন। তারপর সাধারণ যুদ্ধ শুরু

হয়ে গেল। হযরত উম্মে হাকিম (রা) স্বামীর শাহাদাতের দৃশ্য দেখছিলেন। সেই সময় নিজের তাঁবুর খুটি উঠিয়ে রোমকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং সাত ব্যক্তিকে যমালয়ে পাঠিয়ে স্বামীর প্রতিশোধ নিলেন।

চরিতকাররা হযরত খালিদের (রা) শুধুমাত্র দুই সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ পুত্র আবু সাঈদ (রা) এবং কন্যা উম্মাহ অথবা উম্মে খালিদ (রা)। সাঈদ (রা) যুদ্ধের ময়দানে হযরত খালিদের (রা) সামনেই শহীদ হয়ে যান।

হযরত উম্মে খালিদ (রা) মশহুর মহিলা সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের সাথে। প্রিয়নবী (সা) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর একবার তিনি নিজের মায়ের সঙ্গে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। হুজুর (সা) তাকে দেখে বললেন ঃ "খুব সুরত খুব সুরত।"

হুজুর (সা) হযরত উম্মে খালিদকে (রা) খুশী করার জন্য একথা বলেছিলেন।

আরেকবার হুজুর (সা) হযরত উম্মে খালিদকে (রা) বিশেষভাবে ডেকে একটি ফুল ও সুন্দর চাদর দিয়েছিলেন এবং সে সময়ও তাঁকে খুশী করার জন্য এই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল্ বার (র) বলেন যে, হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদের জীবনে কর্তৃত্বমূলক আচরণ ছিল। তবুও তিনি পোশাক প্রভৃতিতে মহানবীর (সা) সাদৃশ্য রাখার চেষ্টা করতেন। নিজের আংটির ওপর তাবারুক হিসেবে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" শব্দটি খোদাই করিয়ে নিয়েছিলেন। হুজুর (সা) এই আংটি দেখে তাঁর কাছ থেকে তা নিয়ে নেন এবং নিজের কাছেই রেখে দেন।

হযরত খালিদ (রা) বিন সাঈদ হক কবুলে অগ্রগমন, হক পথে নির্যাতন সহ্যকরণ এবং জিহাদের শওকের যে চিত্র ইতিহাসের পাতায় অংকন করছেন তা চিরকালের জন্য তার নাম জীবিত রাখবে।

হযরত আখরাম আসাদী (রা)

আল্লাহ তায়ালা সাইয়েদেনা হযরত আবু বকর সিদ্দিককে (রা) স্বপ্ন তা'বিরের পূর্ণাঙ্গ নিপুণতা দান করেছিলেন। অধিকাংশ মানুষ তাঁর খিদমতে নিজেদের স্বপ্নের তা'বির জিজ্ঞেসর জন্য হাজির হতো। ৬ষ্ঠ হিজরীর কথা। একদিন উজ্জল লাল বর্ণের একজন সুদর্শন যুবক সাইয়েদানা সিদ্দিকে আকবারের (রা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আবু বকর! গতরাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আসমানের দরজা আমার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে এবং আমি উর্ধ্বজগত ভ্রমণ করে সপ্তম আসমান এমনকি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌছে গেলাম। সেসময় গায়েব থেকে আমার কানে আওয়াজ এলো যে, এটাই তোমার অবস্থান স্থল। তারপর আমার চোখ খুলে গেল। আপনি আমাকে বলুন যে, এই আশ্চর্য ধরনের স্বপ্নের তাবির কি ?"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেন ঃ

"ভাই! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, তুমি হক পথে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে গেছ। এই হলো সেই স্বপ্নের তা'বির।"

কিছুদিন পর সেই স্বপ্নের তা'বির এমনভাবে পূর্ণ হলো যে, সেই ব্যক্তি হক পথে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন এবং সেই শাহাদাত তাকে তার স্থায়ী ঠিকানা সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌছে দিল।

এই সুদর্শন ও কমনীয় যুবক যাকে আখিরাতে সিদরাতুল মুনতাহার বুলন্দ স্থান দান করা হয়েছিল তিনি ছিলেন হযরত মুহরিয (রা) বিন ফাজলা। সাধারণভাবে তাঁকে আখরাম আসাদী লকবে ডাকা হতো।

হযরত মুহরিয (রা) বিন ফাজলা মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। বনু আসাদ বিন খুজাইমার সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসব নামা নিম্নরূপ ঃ

মুহরিয (রা) বিন ফাজলা বিন আবদুল্লাহ বিন মুররাহ বিন কবির বিন গানাম বিন দাওদান বিন আসাদ বিন গোযায়মা।

ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, জাহেলী যুগে তাঁর খান্দান বনু আবদি শামসের মিত্র ছিল। চরিতকাররা হযরত আখরাম আসাদীর (রা) ইসলাম গ্রহণের সময় নির্ধারণ করেননি। কিন্তু সকলেই এ ব্যাপারে একমত

যে, নবুওয়াতের প্রথমেই উদ্দীপ্ত যৌবনকালে তিনি তাওহীদের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন। এমনিভাবে তিনি আস-সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র দলের সদস্য হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

নবুওয়াতের ১৩ বছর পর বিশ্ব নবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরতের সাধারণ অনুমতি দিয়েছিলেন—এ সময় হযরত আখরাম আসাদীও (রা) অন্যান্য সাহাবীর সাথে হিজরত করে মদীনা এসে যান। এখানে বনু নাজ্জারের খান্দান বনু আবদুল আশহাল তাকে নিজের মিত্র বানিয়ে নেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, তার ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক আনসারের জালিলুল কদর সন্তান হযরত আম্মারাহ (রা) বিন হাজম নাজ্জারীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত আখরাম আসাদী (রা) শুধুমাত্র রাসূল প্রেম, দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা এবং ঈমানী জোশের নেয়ামতেই পূর্ণ ছিলেন তা নয়, বরং বীরত্ব, নির্ভীকতা এবং জানবাজীতেও নিজের উদাহরণ নিজেই ছিলেন। যুদ্ধের ধারা শুরু হলে তিনি সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধে নিজের তরবারীর নিপুণতা প্রদর্শন করেন। তারপর ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধে নিজের বাহাদুরী ও জীবন বাজী রাখার নমুনা পেশ করেন। রহমতে আলমের (সা) প্রতি ছিল গভীর ভালোবাসা এবং সবসময় নিজের জীবন হক পথে কুরবান করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। এই জীবন উৎসর্গের আবেগ তাঁকে আল্লাহর খাস ব্যক্তিদের কাতারভুক্ত করে দিয়েছিলো।

৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে। আল্লাহর নিকট তিনি যে বিরাট মর্যাদার অধিকারী তা এই স্বপ্নেই প্রমাণিত হয়। সিদ্দিকে আকবার (রা)-এর নিকট থেকে সেই স্বপ্নের তা'বির শুনে তিনি খুব খুশী হলেন এবং তখন থেকে তাঁর সারা সময় আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য কাটতে লাগলো।

কিছুদিন পরই সেই সময় এসে গেল। সে জন্যই হযরত আখরাম আসাদী উৎসুখ হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউস্‌সানী মাসে উয়াইনিয়া বিন হাসান ফাযারী ৪০ সওয়ারীর একটি দলের সাথে গাধার চারণ ভূমিতে গুপ্তভাবে হামলা চালালো। এই গোচারণ ভূমি মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে জিকারদে একটি পুকুরের সংলগ্ন ছিল এবং সেখানে রাসূলে আকরামের (সা) উটনী চরতো। ফাযারী লুটেরারা উটনীর রাখালকে শহীদ করে ফেললো এবং ২০টি দুধালো উটনী হাঁকিয়ে নিয়ে চললো। ঘটনাক্রমে হযরত সালমা (রা) ইবনুল আকওয়া আসলামী এবং হযরত রাব্বাহ (রাসূলের আযাদকৃত গোলাম) (রা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে ক্রোধে অস্থির হয়ে

পড়লেন। তিনি হযরত রাব্বাহকে (রা) ঘোড়ার ওপর সওয়ার করিয়ে তক্ষণি মদীনা পাঠিয়ে দিলেন। যাতে তিনি হুজুরকে (সা) খবরটি দিতে পারেন এবং নিজে একাকী ফাযারী লুটেরাদের সাথে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন খুব সাহসী ও নির্ভীক মানুষ। তিনি নিপুণ তীরন্দাজ ছিলেন। প্রথমত তিনি নিকটবর্তী একটি টিলায় চড়ে মদীনার দিকে মুখ করে তিনবার "ইয়া সাবাহা" ধ্বনি উচ্চারণ করলেন (যদি কেউ 'ইয়া সারাহ" শব্দের ধ্বনি উচ্চারণ করতেন তখন তার অর্থ দাঁড়াতো যে সে মুসিবতে নিপতিত হয়েছে অথবা যে কোন কঠিন বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য তার সাহায্যের প্রয়োজন। শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো "হে সকালের মুসিবত।")

এই শ্লোগান দিয়ে হযরত সালমা (রা) টিলার নীচে নামলেন এবং বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়ে লুটেরাদের ওপর পাথর এবং তীর নিক্ষেপ শুরু করলেন।

এই একাকী মরদে মুজাহিদের নিক্ষিপ্ত তীর ও পাথরের কারণে লুটেরাদের জবান বন্ধ হয়ে গেল এবং তারা হতবুদ্ধি হয়ে সকল উট রেখে পালিয়ে গেল। হযরত সালমা (রা) উটগুলো মদীনার দিকে তাড়িয়ে দিলেন এবং নিজে অব্যাহতভাবে ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করতে থাকলেন। চাশতের থেকে সময় একটু বেশী হলে আইনিয়া বিন বদর ফাযারী কতিপয় সশস্ত্র সওয়ারের সাথে লুটেরাদের সাহায্যের জন্য এসে পৌঁছলো। তারা হযরত সালমাকে (রা) গ্রেফতার করতে চাইলো। হযরত সালমা (রা) নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলেন এবং সেখান থেকে আহ্বান জানিয়ে বললেন ঃ

"হে আল্লাহর শত্রুরা! জানো, আমি কে। আমি হলাম আকওয়ার পুত্র। সেই সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মাদকে (সা) বুজুর্গ বানিয়েছেন। তোমাদের কারো এমন হিম্মত নেই যে আমাকে গ্রেফতার করতে পারে। তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ আমার নিকট আসে তাহলে সে কখনই বেঁচে যেতে পারবে না।"

লুটেরা ফাযারী কেবলমাত্র প্রথম পা উঠানোর কথা চিন্তাই করছিলো এমন সময় দূরে ধূলা ওড়া দৃষ্টিগোচর হলো এবং বৃক্ষের ঝোপ থেকে তিনজন অশ্বারোহী বের হয়ে এলো। তারা ঘোড়ায় চড়ে ধূলো উড়িয়ে হযরত সালমার (রা) সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। এসব ঘোড় সওয়ারকারী বাহিনীর অগ্রবর্তী দল ছিল, যাদেরকে মহানবী (সা) ডাকাতির সংবাদ পেতেই তাদের নির্মূলের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। সকলের আগে ছিলেন হযরত আখরাম আসাদী (রা)। তার পেছনে ছিলেন হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রা) এবং তাঁর পিছনে কিছু দূরে হযরত মিকদাদ (রা) ইবনুল আসওয়াদ। এই সময় হযরত সালমা (রা) তৎক্ষণাৎ পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে নেমে এলেন এবং হযরত আখরামের (রা) ঘোড়ার বাকডোর ধরে বললেন ঃ

"আখরাম ! থেমে যাও। তুমি যদি সামনে অগ্রসর হও তাহলে আমার ভয় হয় যে, তোমার ওপর লুটেরারা হামলা করে বসতে পারে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, যাতে রাসূলে আকরাম (সা) এবং তাঁর সঙ্গীরা এসে পৌছেন।"

দ্বীনের প্রতি সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ হযরত আখরামকে (রা) অস্থির করে তুলেছিল এবং তিনি লুটেরাদের সাথে পাঞ্জা লড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ

"হে সালমা! তুমি যদি আল্লাহ্ এবং আখিরাতের ওপর ঈমান এনে থাকো এবং মনে করে থাকো যে, জান্নাত ও জাহান্নাম হক বা সত্য তাহলে আমাকে হক পথে জীবন কুরবান করা থেকে বিরত রেখো না।"

এই বাক্যগুলো তিনি এতো উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং আবেগের সাথে বললেন যে, হযরত সালমা (রা) তাঁর ঘোড়ার বাকডোর ছেড়ে দিলেন এবং তিনি ঘোড়া দৌড়াতে দৌড়াতে লুটেরাদের দিকে অগ্রসর হলেন। ফাযারীদের নামকরা যোদ্ধা আবদুর রহমান বিন আইনিয়া সর্বপ্রথম তাঁর সামনে এলো। তিনি নিজের তরবারী দিয়ে তার ওপর সজোরে আঘাত করলেন এবং সে নিজে বেঁচে গেলেও তার ঘোড়া কেটে গেল। তারপর সে নিজেকে সামলে নিয়ে হযরত আখরামের (রা) ওপর বর্শা দিয়ে হামলা করলো। এই হামলা কার্যকর হলো এবং বর্শা হযরত আখরামের (রা) কলিজা পার হয়ে গেল। তিনি শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আর এমনিভাবে তাঁর স্বপ্নের তা'বির পূর্ণ হয়ে গেল। স্বপ্নে তার অবস্থান স্থল সিদরাতুল মুনতাহা নির্ধারণ করা হয়েছিল ঠিক সেই সময় হযরত আবু কাতাদা (রা) ঘোড়া দৌড়াতে দৌড়াতে এসে পৌছলেন এবং নিজের বর্শা দিয়ে আবদুর রহমান বিন আইনিয়াকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে হযরত আখরামের (রা) প্রতিশোধ নিয়ে নিলেন। তারপর হকপন্থীরা লুটেরাদের ব্যাপারে যথার্থ সতর্কতা অবলম্বন করলেন।

ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছিলেন যে, শাহাদাতের সময় হযরত আকরামের (রা) বয়স ৩৭ অথবা ৩৮ বছর ছিল।

হযরত মা'মার (রা) বিন আবদুল্লাহ্ আদভী

দশম হিজরীতে রহমতে আলম (সা) বিদায় হজ্জের জন্য মক্কা মুয়াজ্জামা তাশরীফ নিলেন। হজ্জ শেষে মহানবী (সা) নিজের পবিত্র মোছ কাটানোর জন্য কোন ব্যক্তিকে তালাশ করছিলেন। রাসূলের (সা) একজন সাহাবী (রা) মোছ কাটা জানতেন। তিনি হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এই খিদমতের জন্য নিজেকে পেশ করলেন। তিনি যখন ক্ষুর হাতে নিলেন তখন সারওয়ারে আলম (সা) মুচকী হেসে বললেন, "ভাই আল্লাহর রাসূল তোমাকে তাঁর কানের লতির ওপর এমন অবস্থায় আধিপত্য দিয়েছেন যখন তোমার হাতে ক্ষুর রয়েছে।"

সেই ব্যক্তি অকৃত্রিমভাবে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আল্লাহর কসম, এটা আমার ওপর আল্লাহর মহান দয়া ও ইহসান যে, তিনি আমাকে হুজুরের (সা) মোছ মোবারক কাটার মর্যাদা দান করছেন।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী যার বিদায় হজ্জের সময় সাইয়েদুল মুরসালিনের (সা) পবিত্র মোছ কাটার সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল এবং যিনি এই খিদমতকে নিজের জন্য স্থায়ী মান-মর্যাদা ও গৌরবের ব্যাপর মনে করেছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত মা'মার (রা) বিন আবদুল্লাহ আদভী।

সাইয়েদেনা হযরত মা'মার (রা) বিন আবদুল্লাহ্ মহানবীর (সা) অত্যন্ত মুখলিস জাননিছার সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তিনি কুরাইশের আদী খান্দানের আশা-আকাংখার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। নসব নামা হলো ঃ

মা'মার (রা) বিন আবদুল্লাহ্ বিন নাজলা বিন আবদুল উজ্জা বিন হারছান বিন আওফ বিন উবায়েদ বিন আবিজ বিন আদি বিন কা'ব।

আল্লাহ্ তায়ালা মা'মারকে (রা) সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। সুতরাং নবুয়াতের প্রথম যুগে যেই তাঁর কানে তাওহীদের আওয়াজ পৌছলো তখনই তিনি নির্ভাবনায় তাতে সাড়া দিলেন এবং সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র দলে শামিল হয়ে গেলেন। সেই ভয়াবহ যুগে ইসলাম গ্রহণের অর্থই ছিল দুঃখ-মুসিবতকে দাওয়াত দেয়ার নামান্তর। হযরত মা'মারও (রা) কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাননি এবং তিন-চার বছর পর্যন্ত

কাফেরদের জুলুম ও নির্যাতনের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হয়েছিলেন। নবুওয়াতের ৬ বছর পর মুসলমানদের দ্বিতীয় কাফেলা হাবশা রওয়ানা হলেন। এ সময় হযরত মা'মারও (রা) হুজুরের (সা) ইঙ্গিতে সেই কাফেলায় শরীক হয়ে গেলেন এবং হাবশার উদ্বাস্তু জীবন গ্রহণ করলেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, কিছু দিন পর হযরত মা'মার (রা) হাবশা থেকে মক্কা ফিরে এলেন এবং এখানে দীর্ঘদিন অবস্থানের পর মদীনা গমন করেন। কিন্তু ইবনে হিশাম লিখেছেন যে, তিনি সেই দলে শামিল ছিলেন যাঁরা খায়বারের সময় হযরত জাফর (রা) বিন আবি তালিবের সাথে হাবশা থেকে মদীনা পৌছেছিলেন। এমনিভাবে তিনি দুই হিজরতের মর্যাদা লাভ করেন। যদিও চরিতকাররা এ ব্যাপারে কিছু বলেননি, তবুও এটাই স্পষ্ট ধারণা যে, খায়বারের যুদ্ধের পর সকল যুদ্ধে হযরত মা'মার (রা) হুজুরের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, নিজের একনিষ্ঠতা এবং জীবন উৎসর্গের আবেগের বাদৌলতে হযরত মা'মার (রা) মহানবীর (সা) নৈকট্য লাভ করেছিলেন এবং হুজুর (সা) তাঁর ওপর খুব আস্থা রাখতেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বিদায় হজ্জে তাঁর খিদমতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই সফরে মহানবীর (সা) সওয়ারীর বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত ছিল এবং উটের পিঠের হাওদা ইত্যাদি তিনিই বাঁধতেন। একদিন জনৈক ব্যক্তি জেনে হোক বা না জেনে হোক তা ঢিলা করে দিয়েছিল। যাহোক, রাততো তেমনি কাটলো। সকাল হলে হুজুর (সা) হযরত মা'মারকে (রা) সম্বোধন করে বললো, "রাতে হাওদা ঢিলা হয়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল।"

হযরত মা'মার (রা) খুব লজ্জিত হলেন এবং আরজ করলেন "হে আল্লাহর রাসূল! আমিতো নিয়ম মত কষেই বেঁধেছিলাম। সম্ভবত কেউ এই ধারণায় তা ঢিলা করে দিয়েছে যে, আমার নিকট থেকে যাতে এই মর্যাদা বা কাজ ছিনিয়ে নেয়া যায় এবং আপনি এই খিদমত অন্য কারোর কাছে ন্যস্ত করেন।"

হুজুর (সা) বললেন, "তুমি নিশ্চিন্ত থেকো যে, এই খিদমত তুমি ছাড়া অন্যকে সোপর্দ করবো না।" হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত মা'মার (রা) খুশী হয়ে গেলেন। সেই হজ্জের সময় তিনি হুজুরের (সা) পবিত্র মোছ কাটার মর্যাদাও লাভ করেন।

হযরত মা'মারের (রা) ওফাতের সাল সম্পর্কে সকল চরিতকারই নীরবতা অবলম্বন করেছেন। সহীহ মুসলিমের এক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি হুজুরের (সা) উত্তম আদর্শ অত্যন্ত কঠোরভাবে মানতেন এবং এ ব্যাপারে

কোন মুসলিহাত বা ওজরের সুযোগ দিতেন না। একবার তিনি নিজের গোলামকে কিছু গম দিলেন এবং বললেন, তা বিক্রি করে যা মূল্য পাবে তা দিয়ে যব কিনে আনবে। গোলাম গম বিক্রির পরিবর্তে তা যবের সাথে বদলে নিল এবং গমের পরিমাণের চেয়ে যবের পরিমাণ বেশী নিল। হযরত মা'মার (রা) একথা জানতে পেরে গোলামের ওপর খুব ক্রোধান্বিত হলেন এবং তক্ষুণি তাকে যবের অতিরিক্ত পরিমাণ ফেরতদানের জন্য প্রেরণ করলেন। সেই সঙ্গে তাকে নসিহত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, খাদ্যদ্রব্য সমান পরিমাণে বদল কর।

হযরত মা'মার (রা) হাদীসও বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে।

হযরত আয়াশ (রা) বিন আবি রবিয়া

আবু আবদুর রহমান আয়াশ (রা) বিন আবি রবিয়া মাখজুমী এবং আবু জেহেল উভয়েই একই মা'র দুধ পান করেছিল। কিন্তু আল্লাহর কুদরতের কেরেশমা দেখুন যে, একভাই [আয়াশ (রা)] দ্বীনে হকের জানবাজ সিপাহী হয়েছিলেন। আর অন্যজন (আবু জেহেল) দ্বীনে হকের জঘণ্যতম শত্রু ছিল। আয়াশ (রা) বিন আবি রবিয়া সেই সব জালিলুল কদর সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যাঁদের জন্য আস্‌সাবিকুনাল আউয়ালুনের খিতাব নাযিল হয়েছিল। তিনি ইসলাম সম্পদে সেই সময়ে পূর্ণ হয়েছিলেন যখন বিশ্বনবী (সা) হযরত আরকামের (রা) গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেননি এবং দ্বীনে হক কবুল করাটা তরবারীর ওপর চলার নামান্তর ছিল। তাঁর মা পক্ষীয় ভাই আবু জেহেল আয়াশ (রা) যাতে তাওহীদের শরাব পান করতে না পারে সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয় এবং আয়াশ (রা) কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে মুশরিকদের জুলুম ও নির্যাতনের প্রজ্বলিত আগুনে নির্ভীকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যখন সেই আগুনের প্রচন্ডতা চরম পর্যায়ে পৌঁছলো তখন অন্যান্য মজলুম মুসলমানের সাথে হযরত আয়াশ (রা) এবং তাঁর স্ত্রী আসমাও (রা) হুজুরের (সা) অনুমতিক্রমে হাবশা হিজরত করেন। কিছু দিন উদ্বাস্তুর জীবন অতিবাহিত করার পর মক্কা ফিরে আসেন এবং কিছু দিন পর হযরত ওমর ফারুকের (রা) সঙ্গে মদীনা হিজরতের গৌরব লাভ করেন।

নিজের ভাইয়ের ইসলাম গ্রহণে আবু জেহেল খুব বিরক্ত হয়েছিল। কিছু দিন পর সে মদীনা এলো [এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী রহমতে আলম (সা) তখনো মদীনা তাশরীফ আনেননি] এবং হযরত আয়াশের (রা) সঙ্গে সাক্ষাত করে বলতে লাগলো, "প্রিয় ভাই আমার! আমাদের বৃদ্ধা মা তোমার বিচ্ছেদের আগুনে জ্বলছে। সে কসম করেছে যে, যতক্ষণ তোমার চেহারা না দেখবে ততক্ষণ না ছায়ায় বসবে, না মাথায় তেল দেবে। একবার তাকে তোমার চেহারা দেখিয়ে এসো।" মায়ের প্রতি ছিল হযরত আয়াশের (রা) সীমাহীন ভালোবাসা। বড় ভাইয়ের কথায় একদম গলে গেলেন এবং তার সাথে মা'কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য রওয়ানা দিলেন।

হযরত ওমর (রা) আয়াশের (রা) মক্কা যাওয়ার ব্যাপারে অবহিত হয়ে তাঁর নিকট গেলেন এবং বললেন, "আয়াশ! তোমার ভাইয়ের কথা থেকে

আমি যেন প্রতারণার গন্ধ পাচ্ছি। মক্কার প্রখর রোদ যখন তোমার মাকে অস্থির করে তুলবে তখন সে নিজেই ছায়ায় চলে যাবে এবং যখন তার মাথায় জটা ধরবে বা উকুন হবে তখন তেলও দেবে এবং চিরুনীও করবে। আমার কথা শুনলে কক্ষণো মক্কা যেয়ো না।"

কিন্তু হযরত আয়াশের (রা) ওপর আবু জেহেলের কথার এমন প্রভাব পড়েছিল যে, তিনি নিজের ইচ্ছা পরিবর্তনে আগ্রহী হলেন না এবং বললেন, মা'র কসম পূর্ণ করে ফিরে আসবো।

সুতরাং তিনি আবু জেহেলের সাথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। যেই মক্কা পৌছলেন, সেই বদস্বভাবী আবু জেহেল সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল এবং নিজের মুশরিক সাথীদের সহায়তায় প্রতারিত আয়াশকে (রা) যিন্দানখানায় নিক্ষেপ করলো। এই যিন্দানখানায় তাঁরও পূর্বে রিসালাত প্রদীপের আরেক পতঙ্গ জিঞ্জিরাবদ্ধ ছিলেন। হকপথের এই কয়েদীর নাম হলো হযরত সালমা (রা) বিন হিশাম।

হযরত আয়াশ (রা) বিন আবি রবিয়াও কয়েদ থাকার কারণে বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তবে তিনি অন্য কয়েকটি যুদ্ধে মুজাহিদ হিসাবে অংশ নেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) শাসনামলে সিরিয়ায় সেনা অভিযান পরিচালনার সময় হযরত আয়াশও (রা) ইসলামী বাহিনীতে শরীক হয়ে গেলেন এবং খৃষ্টনাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে বীর বেশে অংশ নেন। ওফাত সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়াত রয়েছে। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইয়ারমুকের যুদ্ধে শাহাদাত পান। অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী সিরিয়া থেকে সহীহ সালামতে মক্কা ফিরে এসেছিলেন এবং এখানেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে।

হযরত সালামা (রা) বিন হিশাম

হযরত সালমা (রা) বিন হিশাম আল-মাখযুমী আবু জেহেলের ভাই হতেন। তিনিও তাওহীদের দাওয়াতের প্রথম যুগে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজের পাষাণ হৃদয় ভাই ও অন্যান্য মুশরিকের জুলুম-নির্যাতনের নিশানা হয়ে গিয়েছিলেন। মুশরিকদের নির্যাতন যখন সীমা অতিক্রম করলো তখন তিনিও হুজুরের (সা) ইঙ্গিতে হাবশা চলে গেলেন। হাবশায় কেবলমাত্র তারা কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন, এমন সময় একটি গুজব শুনতে পেলেন যে মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছে। একথা শুনে তাঁরা খুব খুশী হলেন এবং অন্যান্য মুহাজিরের সাথে মক্কা ফিরে এলেন। এখানে পৌছে তাঁরা অবহিত হলেন যে, এটা ছিল ভুল খবর। সুতরাং তিনি পুনরায় হাবশা গমনের ইচ্ছা করলেন। কিন্তু আবু জেহেল বাধা দিল এবং সে তাঁর পায়ে বেড়ি দিয়ে একটি কুঠরীতে আটক করে রাখলো। খানা-পিনা বন্দ করে দিল এবং তাঁর ওপর নির্যাতন চালাতে লাগলো। কিন্তু নির্যাতন সত্ত্বেও সেই মরদে হকের হিম্মতে কোন ভাটা পড়লো না। তিনি বলতেন, "হে আল্লাহর দুশমন! আমাকে যদি মেরেও ফেলিস, তবুও হক পথে যে পা উঠেছে তা কখনো পিছু হটে আসবে না।"

দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি বিভিন্ন ধরনের হৃদয়বিদারক মুসিবত সহ্য করলেন। এমনকি তাঁর হকপন্থী সহযোগী অন্যভাই আয়াশও (রা) এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। এই দু'অটল ভাই মেহনতের কয়েদে আটক ছিলেন। এমন সময় তাওহীদের প্রতি ফিদা তৃতীয় আরেকজন সেই মুসিবতের যিন্দানখানায় বা কয়েদখানায় আসতে বাধ্য হলেন। হক পথের এই তৃতীয় মুসাফির ছিলেন ওয়ালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ।

হযরত সালমা (রা) বিন হিশাম, আয়াশ (রা) বিন আবি রবিয়া ওয়ালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ তিনজনই জালিলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। হযরত সালমা (রা) শ্রমমূলক কয়েদখানা থেকে নাজাত পেয়ে মদীনা পৌছলেন। এসময় বদরের যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি প্রায় সকল যুদ্ধে রাসূলে আকরামের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিকের শাসনামলে সিরিয়ার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে (১৪ হিজরীতে) মারজে রোম নামক যুদ্ধে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।

হযরত ওয়ালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ

হযরত ওয়ালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ মুগিরাতুল মাখজুমী হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ সাইফুল্লাহর ভাই ছিলেন। ওয়ালিদ (রা) ইসলামের দাওয়াতের শুরুতে ইসলামের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছিলেন। মুশরিকরা যখন পরাজিত হলো তখন ওয়ালিদ (রা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের হাতে গ্রেফতার হলেন। তাঁর ভাই খালিদ বিন ওয়ালিদ ও হিশাম বিন ওয়ালিদ ফিদিয়া দিয়ে তাঁকে মুক্ত করলেন এবং নিজেদের সঙ্গে মক্কা নিয়ে চললেন। এই সময় হযরত ওয়ালিদের অন্তর ঈমানের আলোয় আলোকিত হয়েছিল। জুল হুলায়ফা পৌছে ভাইদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে পালিয়ে গেলেন এবং সোজা মদীনায় রাসূলের (সা) খিদমতে পৌছে ইসলাম গ্রহণ করলেন। [এক রেওয়ায়াতে এও আছে যে, ওয়ালিদ (রা) নবুওয়াতের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।]

হুজুর (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ওয়ালিদ, তুমি ফিদিয়া আদায়ের পূর্বে কেন মুসলমান হওনি ?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এভাবে মুসলমান হলে কুরাইশরা বলতো যে, ফিদিয়া দেয়ার ভয়ে মুসলমান হয়ে গেছে। অথচ আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টির জন্য মুসলমান হতে চেয়েছিলাম।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মক্কা ফিরে গেলেন। ক্রোধে পরাজিত তাঁর ভাইয়েরা তাঁকেও জিঞ্জিরা বদ্ধ করে সালমা (রা) বিন হিশাম এবং আয়াশ (রা) বিন আবি রবিয়ার সাথে আটক করে রাখলো এবং রকমারী নির্যাতন চালাতে লাগলো।

মহানবী (সা) যখন এই তিন মজলুমের সশ্রম কারাভোগের অবস্থা শুনতেন তখন পবিত্র চেহারায় দুঃখ ও দুশ্চিন্তার রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠতো এবং (সে যুগে) প্রত্যেক নামাযের পর তিনি দোয়া করতেন ঃ "হে আল্লাহ! সালমা (রা) বিন হিশাম, আয়াশ (রা) বিন আবি রবিয়া ও ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদকে মুশরিকদের জুলুমের পাঞ্জা থেকে মুক্ত কর।"

হক পথের এই তিন কয়েদী অত্যন্ত ধৈর্য ও স্থৈর্য্যের সাথে মুসিবতের দিনগুলো অতিবাহিত করছিলেন। এমন সময় একদিন সুযোগ পেয়ে ওয়ালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ নিজেকে জিঞ্জির থেকে মুক্ত করানোতে সফল হলেন এবং লুকিয়ে ছুপিয়ে মদীনা মুনাওয়ারাতে রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে

পৌছলেন। হুজুর (সা) তাঁকে দেখে খুব খুশী হলেন এবং সালমা (রা) ও আয়াশের (রা) কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! তাঁরা খুব কঠিন মুসিবতে রয়েছেন। মুশরিকরা উভয়ের পা এক বেড়িতে বেঁধে রেখেছে এবং তাঁদের ওপর নিত্য নূতন নির্যাতন চালাচ্ছে।"

হুজুর (সা) সেই মজলুমদের অবস্থা শুনে খুব বিষণ্নবোধ করলেন এবং সাহাবীদেরকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "তোমাদের মধ্যে এমন কোন বান্দাহ আছে কি যে সালমা ও আয়াশকে কয়েদ থেকে ছাড়িয়ে আনবে?"

হযরত ওয়ালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এই দায়িত্ব এই অধমকে দান করুন।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "ঠিক আছে তুমিই যাও এবং মক্কা পৌছে সেখানকার কামারের নিকট অবস্থান করো। সে দ্বীনে হক কবুল করেছে। তার মাধ্যমে খুব গোপনে সালমা ও আয়াশের সাথে সাক্ষাত কর এবং তাদেরকে বলো যে, আমাকে আল্লাহর রাসূল (সা) প্রেরণ করেছেন। তোমরা উভয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়।"

রাসূলে করিমের (সা) ইরশাদ অনুযায়ী হযরত ওয়ালিদ (রা) মক্কা পৌছলেন এবং সেখানকার মুসলমান কামারের নিকট অবস্থান গ্রহণ করলেন। সে বললো যে, "তোমার পলায়নের পর মুশরিকরা সালমা ও আয়াশের কয়েদখানা পরিবর্তন করে চলেছে। জানিনা, তারা আজ-কাল কোথায় আটক রয়েছে।"

হযরত ওয়ালিদ (রা) কয়েদখানার পাত্তা লাগানোর ফিকিরে রলেন। একদিন এক মহিলাকে মাথার ওপর খাবার নিয়ে কোথাও যেতে দেখলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বোন, কার খাবার নিয়ে যাচ্ছ?"

সে বললো, "সালমা বিন হিশাম ও আয়াশ বিন আবি রবিয়ার। তারা ইদানিং বেদ্বীন হয়ে গেছে। তাদের খাবার দিতে যাচ্ছি।"

হযরত ওয়ালিদ (রা) বাহ্যত নিরুদ্বেগের সাথে তার কথা শুনলেন। কিন্তু সে যখন সামনে অগ্রসর হলো তখন তিনি তার দৃষ্টি বাঁচিয়ে পিছু পিছু চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সেই বাড়ী দেখতে পেলেন যাতে উভয় হকপন্থীরা কয়েদ ছিলেন। অবস্থান স্থলে ফিরে এসে কামারকে সকল কাহিনী শুনালেন এবং বললেন যে, সালমা ও আয়াশের জিঞ্জির কাটার কোন পদ্ধতি বলে দাও।

সে বললো, "জিঞ্জিরের নীচে একটি মজবুত পাথর রাখবে এবং তার এক কড়ার ওপর তরবারী রেখে অন্য পাথর দিয়ে আঘাত করবে। জিঞ্জির আস্তে আস্তে কেটে যাবে।"

রাতের অন্ধকারে হযরত ওয়ালিদ (রা) নিজের পবিত্র মিশন পূর্ণ করার জন্য বের হলেন। ঘটনাক্রমে কয়েদখানা ছিল ছাদহীন। হযরত ওয়ালিদ (রা) প্রাচীর টপকে কয়েদখানার মধ্যে গিয়ে পড়লেন। মজলুম কয়েদীদেরকে হুজুরের (সা) পয়গাম দিলেন। অতপর কামারের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে জিঞ্জির কেটে ফেললেন এবং উভয়কে সঙ্গে নিয়ে বাইরে চলে এলেন। নিজের উট বাইরে বেঁধে রেখে এসেছিলেন। তিনজনে তার ওপর সওয়ার হয়ে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

সকাল হলে কয়েদীদেরকে না পেয়ে মুশরিকরা মাথায় হাত দিয়ে বসলো। কয়েকজন দ্রুতগতি সম্পন্ন উটনীতে চেপে পিছু পিছু ছুটলো। কিন্তু ব্যর্থ হলো। কেননা হক পথের তিন মুসাফির অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁদেরকে সহীহ সালামতে মদীনা মুনাওয়ারা পৌছে দিলেন। হুজুর (সা) তাঁদেরকে দেখে যারপর নেই খুশী হলেন এবং হযরত ওয়ালিদের (রা) জন্য দোয়া খায়ের করলেন।

হযরত ওয়ালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এই মর্যাদার অধিকারী যে, তিনি সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যখন তাঁর মহান ভাই খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ কুফর ও শিরকের ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছিলেন। পরে এই খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকেই মহানবী (সা) "সাইফুল্লাহ" খিতাব দিয়েছিলেন।

আল্লামা ইবনে আছির (রা) বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ালিদ (রা) কাজা ওমরাতে রাসূলে আকরামের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন এবং খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ কোথায়ও লুকিয়ে ছিলেন। এ সময় হুজুর (সা) ওয়ালিদকে (রা) সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ "খালিদ যদি আমার নিকট আসতো, তাহলে আমি তাকে সম্মান করতাম। আমার বিস্ময় লাগে যে, তার মত মেধাবী মানুষ এখনো কিভাবে ইসলাম গ্রহণ না করে রয়েছে।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত ওয়ালিদ (রা) খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে একটি পত্র লিখলেন। তাতে তিনি তাঁকে অত্যন্ত দরদ ও আন্তরিকতার সাথে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। এই পত্রই খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে (রা) ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়ার কারণ হয়েছিল।

হযরত ওয়ালিদ (রা) কাজা ওমরার কিছু কাল পরই অষ্টম হিজরীতে ওফাত পান। তাঁর মা হযরত লুবাবা (রা) তখনো জীবিত ছিলেন। জওয়ান পুত্রের মৃত্যুতে তিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং একটি হৃদয় বিদারক মরছিয়া বললেন। হুজুর (সা) এই মরছিয়া শুনে তাঁকে বললেন যে, এই মরছিয়া না পড়ে বরং কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করো।

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ـ ق :١٩

হযরত ওয়াহাব (রা) বিন কাবুস মুযনি

সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুকের (রা) সামনে কখনো ওহোদের যুদ্ধের কথা আলোচনা হলে তিনি বলতেন, "হায়! সেই মুযনির শাহাদাতের ভাগ্য যদি আমার হতো।" এমনিভাবে ফারিসুল ইসলাম ও ইরাক বিজয়ী হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের সামনে কোন সময় ওহোদ যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ হলে তিনিও বলতেন, "মুযনির শাহাদাতের মত আমি আমার মৃত্যু কামনা করি।"

এই মুযনি যাঁর শাহাদাতে ফারুকে আজম (রা) ও সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের মত উম্মাতের স্তম্ভরাও ঈর্ষা করতেন। তিনি ছিলেন বনু মুযনিয়ার আশা-আকাংখার পাদ প্রদীপ হযরত ওয়াহাব (রা) বিন কাবুস। এটা হলো আল্লাহর দ্বীন। তিনি যাকে চান বিছানা থেকে উঠিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সিংহাসন থেকে ধূলায় নামিয়ে দিয়ে থাকেন। ওয়াহাব (রা) বিন কাবুস মরু আরবের একজন গ্রাম্য মানুষই তো ছিলেন। আখিরাতের দরজা ঠিক করার পূর্বে তিনি কোন রোযা রাখেননি এবং কোন সময় নামাযও পড়েননি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বিরাট শান ও মর্যাদা দান করেছিলেন।

হযরত ওয়াহাব (রা) বিন কাবুসের হসব-নসব ও স্বদেশভূমি সম্পর্কে শুধু এতটুকুনই জানা যায় যে, তিনি মুযনিয়া গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এই গোত্র মুজিরের মশহুর শাখা হিসেবে পরিচিত। যেহেতু বনু মুযনিয়ার অবস্থান ছিল গাতফানের কোন শহরে। এজন্য চরিতকাররা তাঁদেরকে গাতফান গোত্রের একটি শাখা হিসেবে ধারণা করেছেন ; কিন্তু একথা ঠিক নয়। বনু মুযনিয়ার সম্পর্ক হলো উবিন তানজা বিন ইলিয়াস বিন মুজিরের সঙ্গে। মশহুর কবি হযরত কা'ব (রা) বিন যোহায়েরেরও সম্পর্ক ছিল বনু মুযনিয়ার সঙ্গেই।

হযরত ওয়াহাব (রা) বিন কাবুসের জীবনী নীরবতার জীবনী। তিনি প্রথম ও শেষবার তৃতীয় হিজরীর শওয়ালে ওহোদের যুদ্ধের দিন ইতিহাসের পাতায় আবির্ভূত এবং সেই দিনই খ্যাতির শীর্ষ দেশে আরোহণ করেন ও আল্লাহর দরবারে এত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন হন যে, ইসলামী উম্মাহ কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্য গৌরব করবে।

আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওয়াহাব (রা) বিন কাবুস নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র হারিছ (রা) বিন উকবা বিন কাবুসের সাথে বকরী নিয়ে বিশেষ করে সেই দিন মদীনা মুনাওয়ারা এসেছিলেন যে দিন মহানবী (সা) নিজের জাননিসারদেরকে সাথে নিয়ে ওহোদের জন্য তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। সর্বজ্ঞাত আল্লাহই জানেন যে, তাঁরা উভয়ে বকরী বিক্রয় করতে অথবা ইসলাম গ্রহণের জন্য মদীনা এসেছিলেন কিনা। মদীনা পৌছে তাঁরা চারদিকে নীরবতা দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন। আওস ও খাজরাজের মহল্লায় মহিলা ও শিশু ছাড়া কোন পুরুষ লোক দেখতে পেলেন না। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঘটনাটা কি ? আজ মদীনা পুরুষ শূন্য কেন ? জবাব পেলেন যে, সকল পুরুষ মানুষ রাসূলের (সা) সঙ্গে মক্কার মুশরিকদের মুকাবিলার জন্য ওহোদ পর্বতের দিকে গেছেন। একথা শুনে চাচা-ভাতিজা দু'জনে তৎক্ষণাৎ ওহোদের ময়দানে মহানবীর (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন। সে সময় যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা মুশরিকদেরকে অব্যাহতভাবে পিছু হটিয়ে দিচ্ছিল। হযরত ওয়াহাবও (রা) তরবারী উঠিয়ে মুশরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শাহাদাতের আকাংখায় উন্মুখ মুসলমানরা নিজেদের আবেগপূর্ণ হামলায় শীঘ্রই মুশরিকদেরকে ভেগে যেতে বাধ্য করলো। ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেলে অধিকাংশ মুসলমান গনিমতের মাল সংগ্রহ শুরু করলো। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে হুজুর (সা) ওহোদের দাররাহে আইনাইনে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জোবায়ের আনসারীর নেতৃত্বে পঞ্চাশজন তীরান্দাজ নিয়োগ করেছিলেন। যাতে শত্রু সেই দাররা বা গিরিপথের পিছন দিক থেকে হঠাৎ করে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসতে না পারে। হুজুর (সা) এই তীরান্দাজদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যা কিছুই ঘটুক না কেন (আমরা জয়ই হই অথবা পরাজিত হই) তোমরা এই গিরিপথ ছেড়ে দেবে না। যুদ্ধে যখন মুসলমানরা বিজয়ী হলো তখন দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ তীরান্দাজের হুজরের (সা) নির্দেশ স্মরণ রইলো না এবং তারা গিরিপথ ছেড়ে গনিমতের মাল সংগ্রহে মশগুল হয়ে পড়লো। শুধুমাত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জোবায়ের সাত অথবা দশজন তীরান্দাজসহ গিরিপথে অবস্থান করছিলেন। ঠিক সেই সময় খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এবং আকরামা (রা) বিন আবু জেহেল (যাঁরা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি) নিজেদের ঘোরসওয়ার দল নিয়ে গিরিপথে এসে প্রবেশ করলো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জোবায়ের নিজের স্বল্প সংখ্যক সঙ্গী নিয়ে খুব দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করলেন। কিন্তু মুশরিকদের সংখ্যাধিক্যের সামনে তাঁরা টিকতে পারলেন না এবং হক পথের এই সকল জানবাজই এক এক করে শহীদ হয়ে গেলেন। তারপর মুশরিকরা গিরিপথ থেকে বের হয়ে মুসলমানদের বড় দলের ওপর হামলা করে বসলো।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুশরিকদেরকে হটিয়ে দিয়ে মুসলমানরা আগেই নিজেদের ব্যূহ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। গিরিপথ দিয়ে মক্কার কুরাইশদের হঠাৎ করে তুফানী হামলা তারা সামলে নেয়ারও সুযোগ পেলেন না এবং বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে হামলাকারীদের মুকাবিলা করতে লাগলেন। সেই সময় মুশরিকদের একটি দল মুসলমানদের সেই দলের দিকে অগ্রসর হলো যাদের মধ্যে মহানবী (সা) ছিলেন। হুজুর (সা) নিজের জাননিছারদের প্রতি তাকালেন এবং বললেন, এই দলকে কে রুখবে? হযরত ওয়াহাব (রা) বিন কাবুস নিকটেই ছিলেন। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন "হে আল্লাহর রাসূল! একাজের জন্য আমি হাজির।" এ কথা বলেই মুশরিকদের ওপর এমন প্রচন্ডভাবে তীর নিক্ষেপ শুরু করলেন যে, তাদের মুখ ফিরে গেল এবং পিছু হটে গেল। ইত্যবসরে মুশরিকদের আরেকটি দল সেদিকে এগিয়ে গেল। হুজুর (সা) বললেন, এর মুকাবিলা কে করবে? হযরত ওয়াহাব (রা) পুনরায় এগিয়ে এলেন এবং আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাদের মুকাবিলা করবো।" একথা বলেই তিনি তরবারী ঘুরাতে ঘুরাতে প্রচন্ড উৎসাহের সাথে সেই দলের ওপর হামলা করলেন যে তাদের দাঁত খাটো হয়ে গেল এবং তারাও পিছু হটে গেল। এটা কেবল শেষ হয়েছিল এমন সময় কাফেরদের একটা উৎসাহী দল সেদিক থেকে হামলা করে আসছিলো বলে দৃষ্টিগোচর হলো। হুজুর (সা) বললেন, "এ দলের মুকাবিলা কে করবে? এবারও হযরত ওয়াহাব (রা) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির," হুজুর (সা) বললেন, "যাও জান্নাত তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।" এই সুসংবাদ শুনে আনন্দের আতিশয্যে হযরত ওয়াহাবের (রা) পা আর জমিনে ধরে না। কাউকে ছাড়বো না এবং নিজেও বাঁচার চেষ্টা করবো না—একথা বলে তরবারী বের করে মুশরিক সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং এত উৎসাহ ও আত্মহারা হয়ে যুদ্ধ করলেন যে, জানবাজী ও আত্মোৎসর্গের হক আদায় করে ছাড়লেন। যুদ্ধ করতে করতে এবং হত্যা করতে করতে কাফেরদের অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে গেলেন। সামনে যখন কাউকে পেলেন না তখন পুনরায় ঘুরলেন এবং আবার মুশরিকদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। হুজুর (সা) তাঁর যুদ্ধকে সুন্দর দৃষ্টিতে দেখছিলেন এবং বলছিলেন, "আল্লাহুম্মা আরহামহু" হে আল্লাহ তার ওপর রহম কর।

ওয়াহাব (রা) দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত এভাবে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে লাগলেন। শেষে মুশরিকরা তাঁকে আয়ত্বের মধ্যে এনে ফেললো এবং চারদিক থেকে তরবারী ও বর্শা বর্ষণ করতে লাগলো। হযরত ওয়াহাব (রা) অব্যাহতভাবে বীরত্বের সঙ্গে মুকাবিলা করে যেতে লাগলেন। কিন্তু মানবীয় শক্তির তো একটা সীমা আছে। অবশেষে বিশেরও অধিক আঘাত খেয়ে মাটির ওপর পড়ে গেলেন এবং তাঁর পবিত্র আত্মা পরপারে যাত্রা করলো। এমনিতেই তাঁর শরীরে এমন কোন অংশ ছিল না যেখানে আঘাত লাগেনি। কিন্তু ২০টি আঘাত এমন গুরুতর ছিল যার একটিই মানুষের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট ছিল।

এতবড় গুরুতর আঘাত সত্ত্বেও শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অটলভাবে যুদ্ধ করাটা ছিল বিস্ময়কর ব্যাপার। বাস্তবত এটা ছিল তার ঈমানী আবেগ। এই আবেগই তার মধ্যে বীরত্ব, সাহসিকতা এবং অটলতা ও দৃঢ়তার বিদ্যুৎপূর্ণ করে দিয়েছিলো। যেহেতু তিনি মুশরিকদেরকে প্রচন্ডভাবে হেনস্তা করেছিলেন এবং তাদের অনেক লোককে হত্যা অথবা আহত করেছিলেন; সেজন্য তারা তাদের মনের ঝাল মেটানোর জন্য হক পথের শহীদ ওয়াহাবের (রা) লাশ খুব ভয়াবহভাবে বিকৃত করেছিল (নাক, কান ও ঠোঁট কেটে ফেলেছিল এবং দেহের স্থানে স্থানে ফেড়ে ফেলেছিল) এটা এমন এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য ছিল, যা কারোর পক্ষেই দেখাটা সম্ভব ছিল না। হযরত ওয়াহাবের (রা) যুবক ভাতিজা হারিছ (রা) বিন উকবা স্নেহের চাচার লাশের এই অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং তরবারী উচিয়ে মুশরিকদের ওপর গিয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত হযরত ওয়াহাবের (রা) মত নির্ভীকভাবে লড়াই করতে লাগলেন। শেষে মুশরিকরা তাকেও ঘিরে ধরে শহীদ করে ফেললো। এমনিভাবে চাচা-ভাতিজা উভয়ে মানুষের নিকট বকরী বিক্রয় করার পরিবর্তে নিজেদের জীবনই হক পথে বিক্রয় করে ফেললেন।

রহমতে আলম (সা) এই দুই জানবাজের নিষ্ঠাপূর্ণ আমলে এমন প্রভাবিত হলেন যে, লড়াই শেষে তিনি স্বয়ং তাদের লাশের নিকট তাশরীফ নিলেন এবং বললেন, "আমি তেমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি।" কবর খোঁড়া পর্যন্ত হুজুর (সা) তাঁদের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে রলেন। হযরত ওয়াহাবকে (রা) লাল স্ট্রাইপের অথবা লাল বুটির একটি চাদরের কাফন পরালেন। চাদরটি ছিল ছোট। পা আলগা ছিল। হুজুর (সা) তাঁর ওপর হারমালা ঘাস দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং তারপর নিজের হাত দিয়ে দাফন করলেন।

সাইয়েদেনা হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস বলতেন, যে হিম্মত ও বীরত্ব ওয়াহাব (রা) বিন কাবুসের নিকট থেকে ওহোদের যুদ্ধে প্রদর্শিত হয়েছিল তেমন কোন যুদ্ধে কারোর নিকট থেকেই দেখা যায়নি। আমি রাসূলকে (সা) দেখলাম যে, তাঁর (সা) পবিত্র দেহে আঘাত সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং গিয়ে ওয়াহাবকে (রা) কবরে নামালেন। তাঁর নিকট লাল স্ট্রাইপের অথবা লাল বুটির একটি চাদর ছিল। তা দিয়ে তিনি তাঁকে দাফন করেন। হায় ! আমার মৃত্যুও যদি এমন হতো।"

এমনিভাবে আরো বড় বড় সাহাবী (রা) হযরত ওয়াহাবের (রা) শাহাদাতে ঈর্ষা করতেন।

এই মরুচারী যিনি ইসলাম গ্রহণের পর দুনিয়ার মালিন্যতায় এক মুহূর্তের জন্যেও নিজেকে জড়িত করেননি এবং যাঁকে স্বয়ং রহমতে আলম (সা) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁর সৌভাগ্যে কোন মুসলমান ঈর্ষান্বিত হবে না।

হযরত জুল বিজাদাইন (রা)

রিসালাতের কেন্দ্র যখন মক্কা থেকে মদীনা স্থানান্তর হলো তখন আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হকের ঝান্ডাবাহীরা মদীনা পৌছতে শুরু করলেন। এসব লোক ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করে দুনিয়ার বিত্ত বৈভব এবং আরাম-আয়েশ ছেড়ে দ্বীনের তালিমের জন্য রিসালাতের দরবারে আসতেন। তাঁরা দারিদ্র ও বুভুক্ষার জীবন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বেছে নিয়েছিলেন। সফরের কাঠিন্যতা, ক্ষুৎ-পিপাসার মুসিবত এবং ঠাণ্ডা ও গরমের কোন কষ্টই মোটকথা ইসলামের তালিম এবং আল্লাহর কালাম শিক্ষা থেকে তাদেরকে রুখতে পারেনি। শান্তির সময় ছিলেন তাঁরা আল্লাহর মিসকিনতম বান্দা। আর জিহাদের ময়দানে বাঘের চেয়েও ছিলেন ভয়ানক। ইসলামের এসব দরবেশের সংখ্যা প্রতিদিনই যখন বৃদ্ধি পেতে লাগলো তখন রহমতে আলম (সা) তাদের খাওয়া, অবস্থান এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে নিজেই অভিভাবক হয়ে গেলেন। তিনি তাদের স্থায়ীভাবে থাকার জন্য মসজিদে নববীর পূর্ব দিকে একটি ছাদযুক্ত চত্বর বানিয়ে দিলেন। আরবীতে ছায়াদার অথবা ছাদযুক্ত দালানকে ছুফফা বলা হয়ে থাকে। এজন্য এসব হকপন্থীরা আসহাবে ছুফফা বলে অভিহিত হতে লাগলেন। তাঁদেরকে ইসলামের মেহমান অথবা আল্লাহর মেহমানও বলা হয়।

আসহাবে সুফফার মধ্যে একজন নওজোয়ানও ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে পূর্ণ পর্যায়ের ঈমানী আবেগ বা উত্তাপ প্রদান করেছিলেন। তিনি তখন পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত। কিন্তু দুনিয়ার রং-তামাশায় তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। বিশ্ব নবীর (সা) নিকট থেকে পবিত্র কুরআন শিখতেন এবং রাতদিন অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আবেগের সাথে তা পাঠ করতেন। একদিন সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক (রা) রাসূলের (সা) নিকট আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! মনে হয় যেন এই ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য এত জোরে আল্লাহর কালাম পাঠ করে থাকে।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "ওমর ! তাকে কিছু বলো না। তারতো অন্তরে ঈমানী উত্তাপ রয়েছে এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) জন্য সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে এসেছে।

এই ভাগ্যবান যুবক যার ইসলাম ও ঈমানী উত্তাপের সত্যতার কথা স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালিন ফাখরে মওজুদাত খায়রুল খালায়েক (সা) স্বীকার করেছেন, তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ জুল বিজাদাইন (রা)।

হযরত আবদুল্লাহ জুল বিজাদাইন (রা) মহানবীর (সা) সেই সকল জাননিছারের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন যাদের সৌভাগ্যে অত্যন্ত জালিলুল কদর সাহাবীরাও (রা) ঈর্ষা পোষণ করতেন। তিনি বনু মুযনিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

আবদুল্লাহ বিন আবদি নাহাম বিন আফিফ বিন সাহিম বিন আদি বিন ছা'লাবা বিন সায়াদ বিন আদি বিন উসমান বিন আমর।

শৈশবকালেই হযরত আবদুল্লাহ্ পিতৃছায়া থেকে বঞ্চিত হন। আবদি নাহামের ভাই ইয়াতিম ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিজের স্নেহের ছায়ায় গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে তাকে লালনপালন করেন। আল্লাহ্ তায়ালা এই শিশুকে সুন্দর স্বভাব ও কোমল অন্তর দান করেছিলেন। তাঁর যখন জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হলো তখন মক্কায় দ্বীনে হকের আওয়াজ বুলন্দ হয়েছিল। এই দাওয়াত আবদুল্লাহর কানেও এসে পৌছেছিল। তিনি দ্বিধাহীন ও নিশ্চিন্তে এই দাওয়াতে সাড়া দিলেন। কিন্তু চাচা তখনো কুফর ও শিরকের জালে ফেঁসে ছিলেন। সময় অতিক্রমের সাথে সাথে আবদুল্লাহর (রা) অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু চাচার ভয়ে তা প্রকাশ করতেন না। আল্লাহ কখন চাচাকে হক কবুলের তাওফিক দেন সেই অপেক্ষা করছিলেন। এমনিভাবে কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। চাচার আর হক কবুলের সৌভাগ্য লাভ ঘটলো না। ইত্যবসরে মহানবী (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিলেন।

শেষে আবদুল্লাহর (রা) ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেল। এক দিন তিনি চাচার নিকট গেলেন এবং বললেন, "প্রিয় চাচা! আমি অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছি যে, আপনি কখন মিথ্যা মা'বুদদের থেকে মুখ ফিরিয়ে তাওহীদের ঝান্ডা হাতে তুলে নিবেন। কিন্তু আগে যে অবস্থা ছিল আপনার এখনো তাই রয়েছে। আল্লাহ আমাকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার তাওফিক দিয়েছেন। আপনি জেনে রাখুন যে, আমি একক আল্লাহ এবং তার সাচ্চা রাসূলের (সা) ওপর ঈমান এনেছি।"

চাচা ক্রোধান্বিত হয়ে বললো ঃ "তুমি যদি মুহাম্মাদের (সা) দ্বীন গ্রহণ করে থাকো, তাহলে তা থেকে বড় দুঃখ আর আমার নিকট কিছুই নেই। আমি কি তোমাকে সেই দ্বীনের জন্য লালনপালন করেছি যা নিজের মা'বুদদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এটাই উত্তম যে, নতুন দ্বীনকে কালবিলম্ব না করে ছেড়ে দাও। নচেৎ উট, বকরী, মাল, কাপড় যা কিছু আমি তোমাকে দিয়েছি তা সব ছিনিয়ে নিব।" আবদুল্লাহ (রা) বেধড়ক জবাব দিলেন, "চাচাজান! এখন যদি

আমার জীবনও চলে যায়, তবুও আমি আল্লাহ ও আল্লাহর সাচ্চা রাসূল (সা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব না।"

এই জবাব শুনে চাচা অগ্নিশর্মা হয়ে পড়লেন। সে তাওহীদে মাতওয়ালা আবদুল্লাহর (রা) নিকট থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিলেন। এমনকি তাঁর পরিধানের কাপড় পর্যন্ত খুলে নিলেন। দেহের ওপর শুধুমাত্র কাপড়ের একটি অংশ অবশিষ্ট থাকতে দিলো, যাতে তা দিয়ে সতর ঢাকা থাকে।

আবদুল্লাহ (রা) প্রায় ল্যাংটা অবস্থায় ল্যাংগট বেঁধে মায়ের কাছে গমন করলেন এবং তাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। বিধবা মায়ের ছিল নিজের সন্তানের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা। পুত্রকে যখন এই অবস্থায় দেখলো তখন অস্থির হয়ে পড়লো। তার নিকট ছিল একটি চাদর। তা তাকে দিয়ে দিল। যাতে তা দিয়ে সে দেহ ঢাকতে পারে। আবদুল্লাহ (রা) চাদর দু'টুকরো করলেন। এক টুকরো দিয়ে তহবন্দ বানালেন এবং অন্য টুকরো দিয়ে শরীর ঢাকলেন এবং মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) মদীনা মুনাওয়ারা পৌছলেন। তিনি যখন সেখানে পৌছলেন তখন ছিলো রাতের শেষ ভাগ। ফজরের নামাযের সময় হয়েছে। তিনি সোজা মসজিদে নববীতে গেলেন এবং রাসূলে আকরামের (সা) পেছনে নামায পড়লেন। নামাযের পর হুজুর (সা) যথারীতি লোকদের সঙ্গে মুসাফিহা করতে লাগলেন। এ সময় আবদুল্লাহর (রা) ওপর দৃষ্টি পড়লো। জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ? তিনি আরজ করলেন," আমার নাম হলো আবদুল উজ্জা। একজন মুসাফির এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছি।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আজ থেকে তোমার নাম আবদুল উজ্জা নয়। বরং আবদুল্লাহ! আর লকব হলো জুল বিজাদাইন (দুই চাদর ওয়ালা)। তুমি আমার নিকটই থাকবে।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে আবদুল্লাহ খুশীতে বাগ বাগ হয়ে গেলেন এবং আসহাবে সুফফাতে শামিল হয়ে সকাল-সন্ধ্যায় নবীর (সা) আবাসস্থলে হাজিরী দেয়াকে নিয়ম বানিয়ে নিলেন। মাহবুবে রাব্বুল আলামীনের (সা) আবাসগৃহের দারোয়ানী করা তাঁর নিকট দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল। হুজুরও (সা) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। আল্লাহর জিকরের প্রতি হযরত আবদুল্লাহর (রা) গভীর আকর্ষণ ছিল। সবসময় হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠে তাসবিহ, তাহলিল ও কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। রাসূলে করিম (সা) তাঁর ইখলাস দেখে খুব খুশী হতেন।

নবম হিজরীতে মহানবী (সা) তাবুক যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন ৩০ হাজার জাননিছার। হযরত আবদুল্লাহ জুল বিজাদাইনও (রা) তাঁদের মধ্যে শামিল ছিলেন। রওয়ানার পূর্বে অথবা পথিমধ্যে রাসূলের (সা) নিকট হাজির হয়ে আরজ করলেন। হে আল্লাহর রাসূল! দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন।"

হুজুর (সা) বললেন, "যাও, কোন বৃক্ষের ছাল তুলে নিয়ে এসো।"

তিনি যখন ছাল নিয়ে এলেন তখন হুজুর (সা) সেই ছাল তাঁর বাহুতে বেধে দিলেন এবং বললেন, "আমি আবদুল্লাহর খুন কাফেরদের ওপর হারাম করছি।" হযরত আবদুল্লাহ (রা) আরজ করলেন, " হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি আমার রক্ত বা খুন কাফেরদের জন্য হারাম করছেন অথচ আমি শাহাদাত লাভ করতে চাই।"

হুজুর (সা) বললেন, "তুমি যখন আল্লাহর পথে জিহাদের নিয়তে বের হয়ে এসেছ এবং যুদ্ধের পূর্বে যদি তোমার জ্বর আসে এবং সেই জ্বরে তুমি ওফাত পাও, তাহলে তুমিও শহীদই হবে।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে মুতমায়েন হয়ে গেলেন। আল্লাহর কি কুদরত! ইসলামী বাহিনী যখন তাবুক পৌঁছলো তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) প্রচন্ড জ্বরে আক্রান্ত হলেন এবং সেই জ্বরেই তিনি সামরিক ছাউনীতে পরপারে যাত্রা করলেন। রাতে তাঁর লাশ দাফন করা হলো। সে সময় বিশ্ব এক বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করলেন। হযরত বিলাল হাবশীর (রা) হাতে মশাল ছিল এবং তার আলোতেই মহানবী (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) সাথে একত্রে কবর খুঁড়ছিলেন কবর খোঁড়া শেষ হলে হুজুর (সা) নিজের দুই সাথীর সহযোগিতায় হযরত আবদুল্লাহর (রা) লাশ কবরে রাখলেন। তখন তিনি বলছিলেন, "আদবান ইলা আখাকুমা" অর্থাৎ নিজের ভাইয়ের আদব খেয়াল রেখো। কবরের ওপর যখন মাটি দেয়া হলো তখন সাইয়েদুল মুরসালিন (সা) দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! আমি তার ওপর সন্তুষ্ট ছিলাম, তুমিও তার ওপর সন্তুষ্ট হও।"

উম্মাহর ফকীহ হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদও সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলে' (সা) দোয়া শুনে আমার মন চাইলো যে, হায়! আবদুল্লাহ জুল বিজাদাইনের পরিবর্তে যদি আমার মৃত্যু হতো [অর্থাৎ এই কবর ওয়ালার স্থানে যদি আমি হতাম। হুজুর (সা) নিজের পবিত্র হাত দিয়ে আমাকে দাফন করতেন এবং আমার জন্য এইভাবে দোয়া করতেন।]

হযরত আবদুল্লাহ জুল বিজাদাইনের (রা) দাফন যে শানে হয়েছিল তা থেকে তাঁর মর্যাদা ও সম্মান এবং রাসূলের (সা) দরবারে তাঁর ভালোবাসার আন্দাজ করা যায়। হযরত উকবা (রা) বিন আমের থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করিম (সা) আবদুল্লাহ জুলবিজাদাইন (রা) সম্পর্কে বলতেন যে, এই ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে সত্য অন্তরে ফরিয়াদ করে থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ জুল বিজাদাইন (রা) নিজের ঈমানের আবেগ এবং অন্তরের উত্তাপের যে উদাহরণ কায়েম করেছিলেন, নিসন্দেহে তা আমাদের মৃত শিরাসমূহে চিরকাল জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করবে।

হযরত বুরাইদা (রা) বিন হুসাইব আসলামী

নবুয়াতের পর রহমতে আলমের (সা) পবিত্র জীবনের মক্কী অধ্যায়টা ছিল দুঃখ-কষ্টে পূর্ণ। এই অধ্যায়ে কুরাইশ মুশরিকরা নিজেদের সকল শক্তি দিয়ে দাওয়াতে হকে বাধা দান এবং হকপন্থীদেরকে নির্যাতনের কাজে ব্যয় করতো। তারা আরববাসীকে দায়ীয়ে আজমের (সা) প্রতি ঘৃণা এবং খারাব ধারণা পোষণের জন্য মিথ্যার এক অব্যাহত অভিযান চালু রেখেছিল। আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে মানুষ উকাজ ও মাজান্নাহ প্রভৃতি মেলায় অংশগ্রহণ অথবা হজ্জের জন্য মক্কা আগমন করলে কুরাইশের প্রতিনিধিদলসমূহ তাদের নিকট গিয়ে হুজুরের (সা) বিরুদ্ধে সবধরনের অকথ্য কথা বলতো এবং তাদেরকে এটা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করতো যে, মুহাম্মাদের (সা) কথায় আমল দেয়ার অর্থই হলো নিজেদের তৈরী মা'বুদদের ক্রোধের দাওয়াত প্রদান।

আল্লাহর কুদরতের কেরেশমাও বিস্ময়কর! মুশরিকরা যদি এই অপবিত্র অভিযান না চালাতো তাহলে আরবের মত বিশাল দেশের দূর-দুরান্ত পর্যন্ত হক দাওয়াত পৌছতে কয়েক বছর লেগে যেতো। কিন্তু হকের বিরুদ্ধে মুশরিকদের এই তৎপরতা রহমতে আলমের (সা) পবিত্র নাম এবং তাঁর দাওয়াতকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরবে সুপরিচিত করে তোলে এবং কয়েকটি কবিলা এবং এলাকাসমূহের নেক স্বভাবের মানুষ হকের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এ ধরনের কবিলা বা গোত্রের মধ্যে বনু আসলাম বিন আফসার গোত্রও ছিল। এই কবিলার সাদাসিধে এবং সুন্দর স্বভাবের মানুষ মরু বস্তি আল গামিমে বসবাস করতো। এই বস্তি সাগর উপকূলের নিকট এমন একটি রাস্তার ওপর অবস্থিত ছিল যা মক্কাকে মদীনার সঙ্গে যুক্ত করতো। নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে এই কবিলার লোকদের নিকট পর্যন্ত তাওহীদের দাওয়াত কোন মাধ্যমে পৌছে ছিল এবং তাঁরা তাতে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

নবুয়াতের তের বছর পর বিশ্বনবী (সা) হিজরতের সফরে যখন আল-গামিমে পৌছলেন তখন গ্রামের এক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ৭০-৮০ জন মানুষের একটি দলসহ তাঁর খিদমতে হাজির হলেন। তাঁর মর্যাদাপূর্ণ আচরণ ও ব্যক্তিত্ব দেখে স্পষ্ট মনে হচ্ছিল যে, তিনি তাঁর সঙ্গীদের নেতা। তিনি আরজ করলেন ঃ

"আমরা জানতে পেরেছি যে, আপনি আপনার স্বদেশ ভূমি থেকে বের হয়ে ইয়াছরাব গমন করছেন। আপনার কওম সমগ্র আরবে এই খবর মশহুর করে দিয়েছে এবং আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য মূল্যবান পুরস্কারও ঘোষণা করেছে। কিন্তু হে সাহিবে কুরাইশ! আমরা আপনার দাওয়াতের অবস্থা শুনেছি এবং আমাদের অন্তর সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ এক! আপনি তার সাচ্চা রাসূল এবং যে কথার দিকে আপনি আহ্বান করে থাকেন তা সম্পূর্ণ হক।"

হুজুর (সা) বিস্ময়ের সাথে বৃদ্ধ সরদারের প্রতি তাকালেন এবং বললেন, "আল্লাহর শুকর যে, তিনি তোমাদেরকে হক কবুলের তাওফিক দিয়েছেন।"

বৃদ্ধ সরদার সঙ্গে সঙ্গে সামনে অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাতটা দিন। আমি এবং আমার সঙ্গীরা তার ওপর ইসলামের বাইয়াত করি।"

হুজুর (সা) তাঁর কথা শুনে খুব খুশী হলেন। বৃদ্ধ সরদার এবং তাঁর সঙ্গীদের নিকট থেকে বাইয়াত নিলেন এবং তাদের সবার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। বৃদ্ধ সরদার এই সৌভাগ্যে এত খুশী হলেন যে, তিনি নিজের পাগড়ী খুলে বর্শার মাথায় বেঁধে নিলেন এবং তা ঝান্ডার মত উড়াতে উড়াতে হুজুরের (সা) আগে আগে রওয়ানা দিলেন। মহানবী (সা) তাঁকে বাধা দিলেন এবং বললেন ঃ

"তোমরা এখন এখানেই থাকো। উপযুক্ত সময়ে আমার নিকট চলে আসবে। অথবা আমি নিজেই তোমাদেরকে ডেকে নেবো।"

এই বৃদ্ধ সরদার যিনি সেই সময় প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র সান্নিধ্য গ্রহণ করেছিলেন (যখন তিনি নিজের স্বদেশভূমি ও ঘরবাড়ী ত্যাগ করে এক অপরিচিত স্থানে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সমগ্র আরবের বিরোধিতা প্রত্যক্ষ করে প্রকাশ্য তাঁর সাফল্যের কোন সম্ভাবনা ছিল না)—তিনি ছিলেন হযরত বুরাইদা (রা) ইবনুল হুসাইব আসলামী।

সাইয়েদেনা হযরত আবু আবদুল্লাহ বুরাইদা (রা) বিন হুসাইব মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি বনু আসলাম বিন আফসার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

বুরাইদা (রা) বিন হুসাইব বিন আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন আরাজ বিন সায়াদ বিন যারাহ বিন আদি বিন সাহাম বিন মাযিন বিন হারিছ বিন সালামান বিন আসলাম বিন আফসা।

বনু আসলাম প্রকৃতপক্ষে বনু খুজায়ার একটি শাখা ছিল। তারা বনু খুজায়া বংশ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে ওয়াকেদী লিখেছেন যে, হযরত বুরাইদার (রা) সম্পর্ক ছিল বনু আসলামের সঙ্গে। বনু আসলাম বনু খুজায়া থেকে বের হয়েছিল। তবুও অধিকাংশ চরিতকার ইবনে সায়াদের (রা) বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল।

হযরত বুরাইদার (রা) ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম বর্ণনা হলো, তিনি ৮০টি খান্দানকে সঙ্গে নিয়ে সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যখন প্রিয় নবী (সা) মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে মদীনা মুনায়ারা গমনকালে তাদের বস্তী আল-গামিমে অবস্থান করছিলেন। ইবনে সায়াদ (র) এবং হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) এই বর্ণনায় এই কথাও বৃদ্ধি করেছেন যে, হযরত বুরাইদা (রা) হুজুরের (সা) সঙ্গে (অথবা হিজরতের অব্যবহিত পরই) মদীনা মুনাওয়ারা এসেছিলেন এবং কিছু দিন কুরআনে হাকিমের তালিম হাসিলের পর নিজের কবিলায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

দ্বিতীয় বর্ণনা হলো, হযরত বুরাইদা (রা) বদরের যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি স্বদেশেই অবস্থান করেন। তিনি ৬ষ্ঠ হিজরী অথবা তার কিছু পূর্বে হিজরত করে মদীনা আসেন, তারপর সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এই বর্ণনা হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" উল্লেখ করেছেন।

ওয়াকেদী (রা) বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয় নবী (সা) (এক সফরকালে) গাদিরুল আসতাতাহ নামক একটি পুকুরের পারে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করছিলেন। সেখানকার সরদার বুরাইদা (রা) বিন আল-হুসাইব তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে নিজের কওমের সালাম পেশ করে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এই হলো আমাদের বস্তি ও পশু, কিছু মানুষ হিজরত করে মদীনা চলে গেছেন। অবশিষ্টরা এখানেই আছেন। এখন আপনি যা বলেন?"

হুজুর (সা) তাদেরকে সেখানেই অবস্থানের নির্দেশ দিলেন এবং তাঁর গোত্র বনু আসলামকে একটি পরওয়ানা প্রদান করলেন। আল্লামা ইবনে সায়াদের (র) মত অনুযায়ী নবীর সেই পরওয়ানার ভাষা ছিল এই ঃ

(১) বনু আসলাম হলো বুন খুযায়ার শাখা। তাদের জন্য যারা তাদের মধ্য থেকে ঈমান আনয়ন করেছে, নামায পড়ে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর দ্বীনের শুভাকাংখী।

(২) তাদেরকে ইসুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা হবে। যারা জুলুমের মাধ্যমে তাদের ওপর হঠাৎ করে হামলা করবে।

(৩) এবং তাদের ওপর রাসূলের (সা) সাহায্য আবশ্যকীয় হয়ে পড়বে যখন তাদেরকে ডেকে পাঠানো হবে।

(৪) এবং তাদের যাযাবর বুদ্দুদের জন্যও সেই অধিকার যা তাদের বস্তিতে বসবাসকারীদের জন্য রয়েছে।

(৫) এবং তারা যেখানেই থাকুক মুহাজির হিসেবেই পরিগণিত হবেন।

এই পাঠ আ'লা (রা) বিন হাজরামী লিখেন এবং সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এই বাক্যাবলী দেখে মনে হয় যে, নবীর পরওয়ানা মক্কা বিজয়ের পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কেননা মক্কা বিজয়ের পর হিজরত শেষ হয়ে গিয়েছিল। চরিতকাররা এই পরওয়ানা লিপিবদ্ধ করার সময় সম্পর্কে কিছু বলেননি। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মনে হয় যে, যখন এই পরওয়ানা লিখা হয়েছিল তখন হযরত বুরাইদা (রা) এবং তাঁর কবিলার অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ হিজরত করে মদীনা চলে গিয়েছিলেন। এই ঘটনা যেন মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার।

হযরত বুরাইদা (রা) যখন হিজরত করে মদীনা এলেন তখন বদর ও ওহোদের যুদ্ধ অতীত হয়েছিল। ৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি সর্বপ্রথম সেই ১৪শ' পবিত্র নফসের মধ্যে শামিল হতে পেরেছিলেন যারা বাইয়াতে রিদওয়ানের মহান সৌভাগ্য অর্জন করছিলেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য স্পষ্টভাষায় বেহেশতের সুসংবাদ এসেছিল ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْيُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"অবশ্যই আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা তোমার হাতে এই বৃক্ষের নীচে বাইয়াত করছিলো।"(আল-ফাতাহ ঃ ১৮)

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, বাইয়াতে রিদওয়ানের পর হযরত বুরাইদা (রা) নবী যুগের ১৬টি গাযওয়া ও সারিয়া বা যুদ্ধে অংশ নেন। তাদের মধ্যে খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ ও তাবুকের যুদ্ধসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে খায়বারের যুদ্ধ সম্পর্কে হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা খায়বার অবরোধ করেছিলাম। প্রথম দিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন। কিন্তু দুর্গ জয় হয়নি। দ্বিতীয় দিনও একই অবস্থায় কাটলো। লোকজন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তিকে ঝাণ্ডা দেব যিনি আল্লাহ ও তার রাসূলের (সা) প্রিয় এবং তিনিও আল্লাহ এবং তার রাসূলকে (সা) ভালোবাসেন। আল্লাহ তার হাতে বিজয় দিবেন। হুজুরের

(সা) ইরশাদ শুনে লোকেরা খুশী হয়ে গেলেন। পরবর্তী দিন রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায থেকে ফারেগ হয়ে ঝান্ডা চাইলেন এবং হযরত আলীকে (রা) ডেকে পাঠালেন। হুজুর (সা) তাঁকে ঝান্ডা দিলেন এবং আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে খায়বার পদানত করালেন।

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত বুরাইদা (রা) মহানবীর (সা) সেই পবিত্র আত্মার দশ হাজার সফর সঙ্গীর মধ্যে শামিল ছিলেন যাঁদের ব্যাপারে শত শত বছর পূর্বে কিতাবে ইসতিছনাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

হযরত বুরাইদা (রা) বলেন, মক্কা বিজেয়র দিন আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ওজুতে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়লেন এবং মোজার ও... মসেহ করলেন। হযরত ওমর (রা) আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর পূর্বে আপনি কখনো এমন করেননি। তিনি বললেন, "আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন করছি। যাতে লোকেরা এটা জায়েজ তা জেনে নিতে পারে।" (মুসলিম)

মক্কা বিজয়ের পর হযরত বুরাইদা (রা) হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধসমূহে নিজের তরবারীর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। অষ্টম হিজরীর শেষে বিশ্বনবী (সা) হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে (রা) মুজাহিদীনের একটি দলের সাথে তাবলীগে ইসলামের জন্য ইয়েমেন প্রেরণ করেন। তখন হযরত বুরাইদাও (রা) সেই দলে শামিল হন এবং কয়েক মাস ইয়েমেনে মুকিম থেকে তাবলিগ ও হেদায়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন।

নবম হিজরীতে রাসূলে আকরাম (সা) যাকাত ও সাদকা আদায়ের লক্ষে প্রত্যেক কবিলার জন্য পৃথক পৃথক আদায়কারী নিয়োগ করেন। তারাই ছিলেন এসব ব্যক্তি যাঁদের আমানত ও দিয়ানত, তাফাককুহ ফিদ্বীন ও অন্তর্দৃষ্টির ওপর হুজুরের (সা) বিশেষ আস্থা ছিল। এসব আদায়কারী গোত্রসমূহে সফর করে লোকদের নিকট থেকে যাকাত ও সাদকা আদায় করে রাসূলের (সা) দরবারে পেশ করতেন।

ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, হুজুর (সা) হযরত বুরাইদাকে (রা) গিফার ও আসরাম গোত্রের আদায়কারী নিয়োগ করেছিলেন। তিনি গোত্রদ্বয় থেকে যাকাত ও সাদকা আদায় করে মদীনা এলেন। এ সময় তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল। হুজুর (সা) হযরত বুরাইদাকে (রা) দ্বিতীয়বার ঐসব গোত্রে প্রেরণ করলেন। যাতে তাদেরকে জিহাদে (তাবুকের যুদ্ধে) শরীক হওয়ার দাওয়াত দেন। হযরত বুরাইদা (রা) অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ পদ্ধতিতে তাদেরকে ইসলামী বাহিনীতে শামিল হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। এমনকি তাদের একটি বিরাট সংখ্যা হুজুরের (সা) সফরসঙ্গী হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য

প্রস্তুত এবং অস্থির হয়ে পড়লেন। হযরত বুরাইদা (রা) তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে নবীর (সা) দরবারে হাজির হলেন, অতপর হযরত বুরাইদা (রা) সমেত তারা সকলেই সেই ত্রিশ হাজার মুজাহিদ বাহিনীতে শামিল হওয়ার সম্মান লাভ করেছিলেন যারা রহমতে আলমের (সা) সফরসঙ্গী হয়ে তাবুকের ভয়ংকর সফরের দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছিলেন।

দশম হিজরীতে মহানবী (সা) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে তিনশ' সওয়ার সহ ইয়েমেনের মাজহাজ গোত্রের দিকে প্রেরণ করেন। এই সওয়ারদের মধ্যে হযরত বুরাইদাও (রা) শামিল ছিলেন। ইয়েমেন পৌঁছে হযরত আলী (রা) বনু মাজহাজকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তাঁরা এই দাওয়াত কবুল করার পরিবর্তে মুসলমানদের সাথে লড়াই শুরু করে দিল। মুসলমানরা খুব জোরের সাথে মুকাবিলা করলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি মাজহাজী যুদ্ধবাজদেরকে পরাজিত করে ফেললেন। গনিমতের মাল বণ্টন করা হলো। হযরত আলী (রা) নিজের জন্য একটি দাসী রাখলেন। ব্যাপারটি হযরত বুরাইদার (রা) পসন্দ হলো না। তবুও তিনি সে সময় চুপ রলেন।

ইয়েমেন থেকে ফিরে এসে হযরত আলী (রা) ও হযরত বুরাইদা (রা) বিদায় হজ্জে শরীক হলেন। হজ্ব শেষে প্রিয়নবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারা প্রত্যাবর্তন করলেন। সকল মুহাজির ও আনসারও তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। পথিমধ্যে গাদিরে খুম নামক স্থানে তিনি কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করলেন এবং সকল সাহাবীকে একত্রিত করে একটি সংক্ষিপ্ত খুতবা দিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, ইয়েমেন থেকে ফিরে আসার পর (সম্ভবতঃ সেই সময়) হযরত বুরাইদা (রা) হুজুরের (সা) নিকট অভিযোগ করলেন যে, গনিমতের মাল থেকে আলী (রা) নিজের জন্য একটি দাসী নিয়েছেন। হুজুর (সা) তাঁর কথা শুনে বললেন ঃ "বুরাইদা! আলীর (রা) ব্যাপারে তোমার কি কোন মনোকষ্ট আছে ?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "জ্বী হাঁ। হে আল্লাহর রাসূল!"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আলীর (রা) বিরুদ্ধে মনে কোন কষ্ট রেখ না। এক-পঞ্চমাংশ হিসেবে সে আরো বেশী পেতো।"

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত বুরাইদার (রা) অভিযোগ শুনে হুজুরের (সা) উজ্জ্বল চেহারায় মলিনতার ছাপ পরিলক্ষিত হলো এবং তিনি বললেন, "বুরাইদা! মুসলমান কি নিজের সত্ত্বার ওপর আমার হককে অগ্রাধিকার দেয় না ?"

তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই আপনার হক সর্বোচ্চে।"

তিনি বললেন, "তাহলে শোনে., আমি যার গোলাম আলীও (রা) তারই গোলাম।"

ইমাম নাসায়ী, তিরমিযি এবং অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস লিখেছেন যে, এ সময় হুজুর (সা) নিজের ভাষণে এই বাক্যাবলী ব্যবহার করেছিলেন। বাক্যাবলীর সারমর্ম হলো ঃ "আমি যার প্রিয়, আলীও (রা) তার প্রিয় হওয়া চাই। হে আল্লাহ! যে আলীকে (রা) ভালোবাসে, তুমিও তাকে ভালোবাসো এবং যে আলীর (রা) সাথে শত্রুতা পোষণ করে তার প্রতি তুমিও শত্রুতা পোষণা কর।"

হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুরের (সা) ইরশাদসমূহ শুনে আলীর (রা) বিরুদ্ধে আমার সকল অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেল। বরং আমার অন্তরে তার জন্য এমন ভালোবাসা সৃষ্টি হলো যে, তার কোন শেষ ছিল না।

একাদশ হিজরীর সফর মাসে প্রিয়নবী (সা) হযরত উসামা (রা) বিন যায়েদকে (রা) একটি সৈন্য বাহিনী দিয়ে সিরিয়া গমনের নির্দেশ দিলেন। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল রোমকদের বিরুদ্ধে মাওতার শহীদদের প্রতিশোধ গ্রহণ। হযরত উসামা (রা) যদিও সে সময় ১৭-১৮ বছরের যুবক ছিলেন ; কিন্তু হুজুর (সা) সেই বাহিনীর নেতৃত্বের জন্য তাঁকেই নির্বাচিত করেছিলেন। অথচ তাতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আবু উবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহ, হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদ এবং বহু বড় বড় সাহাবীও শামিল ছিলেন।

আল্লামা ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন, হুজুর (সা) হযরত বুরাইদাকে (রা) হযরত উসামার (রা) অধীন সেই বাহিনীর ঝান্ডাবাহী নিয়োগ করেছিলেন। সেই বাহিনী মদীনা থেকে বের হয়ে জুরুফ নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। সেখানেই হযরত উসামা (রা) তাঁর মা উম্মে আইমানের (রা) পয়গাম পেলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই নশ্বর জগৎ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। কাল বিলম্ব না করে মদীনা চলে এসো।

হযরত নাঈম (রা) বিন
মাসউদ আশজায়ী

খন্দকের যুদ্ধে (পঞ্চম হিজরী) আরবের সকল ইসলামের শত্রু ঐক্যবদ্ধ-ভাবে মদীনা মুনাওয়ারার ওপর হামলা করে বসেছিল এবং হকপন্থীরা নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য খন্দক বা পরিখা খননে বাধ্য হয়ে পড়েছিলেন। উপরন্তু আরো দুঃখজনক ব্যাপার হয়েছিল যে, মদীনার অভ্যন্তরে ইহুদী বনি কোরায়জা আস্তিনের সাপ হিসেবে বের হয়ে এসেছিল। এরপূর্বে তারা মুসলমানদের সাথে এই চুক্তি সম্পাদন করেছিল যে, তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেবে না। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধের সময় তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে বসলো এবং ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে মিলে পরিকল্পনা এটেছিল যে, তারা বাইরে থেকে হামলা করবে। আর শহরের অভ্যন্তর থেকে বনু কোরায়জা মুলমানদের পেছনে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেবে। হকপন্থীদের জন্য সময়টা ছিল খুবই নাজুক। কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। একদিকে তো তারা হামলাকারীদের সামনে শিসাঢালা প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অন্যদিকে বনু কোরায়জার তরফ থেকে কোন সম্ভাব্য ক্ষতিকর তৎপরতা বন্ধের জন্য দুশ' জানবাজকে নির্দিষ্ট করে দিলেন। অবরোধকালে কাফেররা কয়েকবার খন্দক অতিক্রম করে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মুসলমান বাহাদুররা তাদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যাহোক, রহমতে আলম (সা) কাফেরদের শয়তানী আচরণ এবং বুন কোরায়জার গাদ্দারীর আশংকায় শংকিত ছিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সময়ের কথা—একদিন মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে একজন বৃদ্দু সরদার কোন না কোন উপায়ে রাসূলের (সা) নিকট পৌঁছে গেলেন। হুজুর (সা) তখন নামায পড়ছিলেন। সালাম ফেরালেন। এ সময় বৃদ্দু সরদারের প্রতি দৃষ্টি পড়লো। চেহারাটা পরিচিত বলে মনে হলো। জিজ্ঞেস করলেন, এখন কিভাবে এলে। বৃদ্দু সরদার আরজ করলো ঃ

"হে মুহাম্মাদ ! (সা) আমি একক আল্লাহর ওপর ঈমান আনছি এবং আপনার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করছি। আমাকে আপনার দলে শামিল করে নিন।"

এই কঠিন সময়ে বেদুঈন সরদারের ইসলাম গ্রহণে হুজুর (সা) সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। তারপর বেদুঈন সরদার বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! এতদিন পর্যন্ত কুরাইশ ও বুন কোরায়জার সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল এবং আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কেউ অবহিত নয়। এই যুদ্ধ প্রসঙ্গে আমার যোগ্য কোন কাজ থাকলে তা ইরশাদ করুন। অবিনশ্বর আল্লাহর কসম! আমি তা অবশ্যই পালন করবো।"

প্রিয় নবী (সা) বললেন ঃ "গোত্রসমূহের এই সমাবেশ এবং বনু কোরায়জার ইহুদীদের সাথে তাদের কোন ষড়যন্ত্র থাকলে তা বের করবো।"

বুদ্দু বা বেদুঈন সরদার আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এই কাজ আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনি দেখবেন যে, তারা কিভাবে বিশৃংখল হয়ে পড়ে।"

এই বেদুঈন সরদার যিনি মুসলমানদের ওপর আপতিত চরম মুসিবতের সময় তাওহীদের ঝান্ডা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং হকপন্থীদেরকে আশংকামুক্ত করার জন্য এক বিরাট কাজ নিজের দায়িত্বে নিয়েছিলেন। তিনি হলেন হযরত নাঈম (রা) বিন মাসউদ আশজায়ী।

হযরত আবু সালমা নাঈম (রা) বিন মাসউদ গাতফানের আশজা খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তার নসব নামা হলো ঃ

নাঈম (রা) বিন মাসউদ বিন আমের বিন আনিফ বিন ছালাবা বিন কুনফুজ বিন হালাওয়াহ বিন সাবি' বিন বাকার বিন আশজা বিন রিছ বিন গাতফান।

স্বগোত্রে হযরত নাঈম (রা) বিন মাসউদ নেতৃস্থানীয় হিসেবে পরিগণিত হতেন। তিনি খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন এবং বনু আশজা তাকে অত্যন্ত মান্য করতো। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির অবস্থাটা এমন ছিল যে, একদিকে মক্কার কুরাইশ তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতো এবং অন্যদিকে মদীনার ইহুদীদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। হযরত নাঈম (রা) রাসূলে করীমের (সা) দীর্ঘ দিনের পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর দাওয়াত সম্পর্কেও অবিহত ও প্রভাবিত ছিলেন কিন্তু এটা জানা যায়নি যে, কোন কোন কারণে তাঁর মত একজন বিজ্ঞ মানুষ খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত নিজের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারেননি। খন্দকের যুদ্ধে তিনি নিজের গোত্রের সাথে হামলাকারী বাহিনীতে শামিল ছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারা অবরোধকালে একদিন তাঁর অন্তর গালাগালি করলো যে, তুমি মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর দ্বীনকে বরহক জানো। অথচ, মুশরিকদের সঙ্গে মিলে দ্বীনে হক গ্রহণকারীদেরকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছ। এটা কোন বীরত্বের কাজ নয়। সুতরাং তিনি এক রাতে চুপচাপ হুজুরের (সা) পবিত্র খিদমতে হাজির হলেন এবং

ইসলামের নিয়ামাত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে হকের শত্রুদের বিরাট বাহিনীকে বিশৃংখল করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিলেন। কাজটা ছিল কঠিন এবং ভয়ংকর। কিন্তু হযরত নাঈমের (রা) নিজের ওপর এত আস্থা ছিল যে, তিনি সব ধরনের ভয় থেকে বেপরোয়া হয়ে সেই কাজ পূর্ণ করার দৃঢ় সংকল্প করলেন।

হুজুরের (সা) নিকট থেকে বিদায় হয়ে হযরত নাঈম (রা) বনু কোরায়জার ইহুদীদের কাছে পৌঁছলেন এবং তাদেরকে একত্রিত করে এভাবে আলোচনা শুরু করলেন ঃ

নাঈম (রা) ঃ "হে বুন কোরায়জার ভাইসব! তোমরা জানো যে, আমার সাথে তোমাদের কি ধরনের মুহাব্বাত বা ভালোবাসা রয়েছে।"

বনু কোরায়জা ঃ "হাঁ, আমরা তা খুব ভালোভাবে জানি।"

নাঈম (রা) ঃ "কুরাইশ ও বনুগাতফান মুহাম্মাদের (সা) সঙ্গে লড়াই করার জন্য এসেছে।"

বনু কোরায়জা ঃ "হাঁ, আমরাও তাদেরকে সাহায্য করবো।"

নাঈম (রা) ঃ "কিন্তু তাদের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক। তারা তো তোমাদের থেকে অনেক দূরে থাকে।"

বনু কোরায়জা ঃ "একথা ঠিক। তবে মুহাম্মাদ (সা) তাদেরও এবং আমাদেরও শত্রু। সে যদি বিজয়ী হয় তাহলে না তাদের ছাড়বে, না আমাদের ছাড়বে।"

নাঈম (রা) ঃ "একথাও চিন্তা কর যে, কুরাইশ ও গাতফান উপযুক্ত সুযোগ পেলেই মুহাম্মাদের (সা) সঙ্গে লড়াই করবে। নচেৎ ফিরে যাবে। এটা স্পষ্ট কথা যে, তারা তো তোমাদেরকে তাদের সাথে নিয়ে যাবে না। তোমাদেরকে এই স্থানেই মুসলমানদের সঙ্গে থাকতে হবে। খামাখা তাদের সাথে বিবাদ বিসম্বাদ কেন করবে?"

বনু কোরায়জা ঃ "তাহলে আমরা কি করবো?"

নাঈম (রা) ঃ "কুরাইশ ও বনু গাতফানের সঙ্গ পরিত্যাগ কর এবং যুদ্ধে কোন পক্ষই অবলম্বন করো না।"

বনু কোরায়জা ঃ "কিন্তু আমরা তো কুরাইশদেরকে কথা এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমরা তাদের নিকট কি করে মুখ দেখাবো।"

নাঈম (রা) ঃ "কথা ও প্রতিশ্রুতি তো তোমরা মুসলমানদেরকেও দিয়েছিলে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ যে, কুরাইশরা যদি ব্যর্থ বা পরাজিত হয়ে ফিরে যায় তাহলে তোমরা এখানে একাকী মুসলমানদের মুকাবিলা কিভাবে করবে?"

বনু কোরায়জা ঃ "নিসন্দেহে তুমি সত্য বলেছ। কিন্তু আমরা এখন এই ঝামেলা থেকে মুক্তির কি চেষ্টা করবো।"

নাঈম (রা) ঃ "তোমরা আমার খুব প্রিয়। এজন্য আমার কথা শুনলে কুরাইশ ও বুন গাতফানের কতিপয় ব্যক্তিকে জামানত হিসেবে নিজেদের কাছে রেখে দাও। যদি কুরাইশ ও বনু গাতফান প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং উদ্দেশ্য হাসিল ছাড়াই ফিরে যায় তাহলে তোমাদের কাছে তাদের মানুষ থাকবে। মুসলমানরা যদি তোমাদের দিকে অগ্রসর হয় তাহলে নিজেদের মানুষের খাতিরে তারা তোমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে।"

বনু কোরায়জা ঃ "তাওরাত কিতাবের কসম! তোমার পরামর্শ অত্যন্ত সঠিক পরামর্শ। আমরা সে অনুযায়ীই আমল করবো।"

বনু কোরায়জার পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত বা মুতমায়েন হয়ে হযরত নাঈম (রা) কুরাইশ সরদার আবু সুফিয়ানের নিকট গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে এভাবে আলোচনা করলেন ঃ

নাঈম (রা) ঃ "মুসলমানদের সাথে আমার শত্রুতার অবস্থা আপনার জানা আছে এবং আমার ও আপনার মধ্যে বন্ধুত্বের যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাও আপনার জানা আছে।"

আবু সুফিয়ান ঃ "হাঁ, হাঁ, আমার জানা আছে। তা বলার আবার কি প্রয়োজন পড়লো।"

নাঈম (রা) ঃ "একটি খবর আমি শুনেছি। তা আপনার কর্ণগোচর করাতে চাই।"

আবু সুফিয়ান ঃ "বলো, কি ?"

নাঈম (রা) ঃ "শর্ত হলো যে, তা গোপন রাখতে হবে। বিশেষ করে বনু কোরায়জার কানে যেন তা না যায়।"

আবু সুফিয়ান ঃ "আমরা তোমার খবর গোপন রাখবো এবং কোন অবস্থাতেই তা প্রকাশ করবো না।"

নাঈম (রা) ঃ "আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, বনু কোরায়জা আপনাদের সাথে যে চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি করেছে তা তারা ভঙ্গ করেছে এবং তারা দ্বিতীয়বার মুসলমানদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক মজবুত করতে আগ্রহী। তারা পরিকল্পনা এঁটেছে যে, কুরাইশ ও বনুগাতফানের ৭০ জনকে নিজেদের

কবজায় নিয়ে তাদেরকে মুহাম্মাদের (সা) নিকট প্রেরণ করবে। যাতে তারা তাদের গর্দান উড়িয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিতে পারে। এই প্রসঙ্গে তারা মুহাম্মাদের (সা) নিকট ইতিমধ্যেই পয়গাম প্রেরণ করেছে এবং সেও তাতে সম্মত আছে।"

আবু সুফিয়ান ঃ "এ ব্যাপারে তোমার মত কি ?"

নাঈম (রা) ঃ "আমার পরামর্শ হলো, বনু কোরায়জা আপনার নিকট জামানত হিসেবে কিছু মানুষ চাইলে তা স্পষ্ট অস্বীকার করবেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রের জালে কখনই আটকা পড়বেন না।"

আবু সুফিয়ান ঃ "তোমার পরামর্শ সঠিক ও সুন্দর। আমরা তাই করবো।"

কুরাইশদের সঙ্গে খাতির পাতানোর পর হযরত নাঈম (রা) বনু গাতফানের নিকট গেলেন এবং যেসব কথা কুরাইশের নিকট বলেছিলেন তাই তাদেরকে বললেন। বস্তুত তিনি নিজেই বনু গাতফানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এ জন্য গোত্রের সকলেই ঐকমত্য হয়ে তাকে সমর্থন জানালো।

যেদিন এসব কথা হয়েছিল, ঘটনাক্রমে তা ছিল জুমার দিন। সেই রাতেই আবু সুফিয়ান বনু কোরায়জার নিকট পয়গাম প্রেরণ করে বললেন, আমরা এখানে অনেক দিন পড়ে রয়েছি। মানুষ ও পশুদের খুব কষ্ট হচ্ছে। আজ রাতেই যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং অতি প্রত্যুষে আমরা ও তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের সাথে সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ করাটাই উত্তম হবে। বনু কোরায়জা জবাবে জানালো যে, আগামীকাল শনিবার। এদিন আমরা কোন কাজ করি না। তারপরও আমরা সেই অবস্থায় তোমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো যখন তোমরা নিজেদের গোত্রের ৭০ জন বিশিষ্ট মর্যাদাবান ব্যক্তিকে আমাদের নিকট প্রেরণ করবে। কেননা আমাদের আশংকা রয়েছে যে, অবরোধ দীর্ঘ দিন চললে তোমরা ঘাবড়ে গিয়ে ফিরে যাবে এবং আমরা বন্ধুহীন ও সাহায্যকারী ছাড়া রয়ে যাবো। মুসলমানরা যদি আমাদের ওপর এসে পড়ে তাহলে তোমরা নিজেদের মানুষের খাতিরে আমাদের সাহায্যের জন্য আসবে। অন্যথা তোমাদেরকে এত দূর থেকে ডেকে আনা অসম্ভব হবে।

কুরাইশরা যখন বনু কোরায়জার জবাব শুনলো তখন তাদের কান খাড়া হয়ে গেল এবং বলতে লাগলো যে, খোদার কসম! নাঈম যা বলেছিল তাই সত্য হলো। সুতরাং তারা বনু কোরায়জাকে জবাবে বললো যে, আমরা কখনই আমাদের কোন লোককে তোমাদের নিকট সোপর্দ করবো না। তোমরা যদি

আমাদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাও তাহলে ভালো। নচেৎ আমরা যখন চাইবো তখন ফিরে যাবো। অতপর তোমরা জানবে এবং মুসলমানরা বনু কোরায়জা বনু গাতফানকেও তাদের কিছুলোককে জামানত হিসেবে প্রেরণের পয়গাম প্রেরণ করলো। এই পয়গামের তারাও কড়া জবাব দিল। এখন বনু কোরায়জা প্রকাশ্যে বলতে লাগলো যে, নাঈম আশজায়ী আমাদেরকে যা কিছু বলেছিল তা সবই ঠিক বলে প্রমাণিত হলো। আমরা কুরাইশ ও গাতফানীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কখনই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো না। মোটকথা উভয় মিত্র পক্ষ পরস্পরের প্রতি খারাব ধারণা পোষণ করতে লাগলো এবং তাদের মধ্যে চরম অনৈক্য সৃষ্টি হলো। এ সবকিছুই হযরত নাঈমের (রা) বদৌলতে হয়েছিল। এদিকে আল্লাহর আরেক গজব এসে উপস্থিত। বুধবার এমন ভয়াবহ তুফান এলো যে, অবরোধকারীদের তাঁবু উল্টে গেল। আগুন নিভে গেল এবং ডেগগুলো চুলায় উপুর হয়ে পড়লো। কাফেররা কিছুটা এই তুফানের কারণে এবং কিছুটা পারস্পরিক খারাব সম্পর্কের কারণে অবরোধ উঠিয়ে খারাব অবস্থায় স্ব স্ব দেশের পথ ধরলো।

খন্দকের যুদ্ধের পর হযরত নাঈম (রা) বিন মাসউদ নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন। বিভিন্নভাবে জানা যায় যে, তিনি নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে স্বগোত্রের অনেক মানুষকে ইসলামের সীমায় নিয়ে আসেন। তারপর হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারা চলে যান এবং কয়েকটি যুদ্ধে প্রিয়নবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের সময় তিনি নিজের গোত্র আশজাকে মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গিয়েছিলেন। এমনিভাবে তিনি তাবুকের যুদ্ধেও নিজের গোত্রকে উদ্বুদ্ধ করে এনেছিলেন। এসব রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত নাঈমের (রা) অন্তরেই শুধুমাত্র জিহাদের আবেগ উদ্বেলিত হতো না বরং তিনি নিজের কবিলাকেও এই কাজে অংশ নেয়ার জন্য চেষ্টা চালাতেন।

বিশ্বনবীর (সা) ওফাতের পর হযরত নাঈম (রা) বিন মাসউদ দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। এ সময় তিনি কি করতেন সে সম্পর্কে চরিতকাররা কিছু লিখেননি। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত নাঈম (রা) বিন মাসউদ হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিলাফত কালের শুরুতে ওফাত পান। একটি রেওয়ায়াতে এও আছে যে, তিনি উষ্ট্রের যুদ্ধে শাহাদাত পান। চরিতকাররা হযরত নাঈমের (রা) পুত্র সালমার (রা) কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনিও সাহাবী হওয়ার সম্মান লাভ করেছিলেন। তাঁর থেকে পাঁচটি হাদীস বর্ণিত আছে। তার মধ্য থেকে কয়েকটি নিজের পিতার নিকট থেকে রেওয়ায়াত করেছেন।

এই পয়গাম পেতেই হযরত উসামা (রা), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আবু উবায়দা (রা) এবং অন্য কতিপয় সাহাবীর (রা) সাথে মদীনা ফিরে এলেন। হুজুর (সা) ওফাত পেলেন। এ সময় সকল সৈন্য জুরুফ থেকে মদীনা এসে গেল এবং এই অভিযান মুলতবী হয়ে গেল।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। তখন তিনি পুনরায় সৈন্য একত্রিত করে হযরত উসামাকেই (রা) রওয়ানার নির্দেশ দিলেন। হযরত বুরাইদা (রা) পূর্বেকার এই বাহিনীর ঝান্ডাবাহী হিসেবে নিয়োজিত হলেন। এই বাহিনী কেবলমাত্র জুরুফে পৌঁছেছিল। এমন সময় সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো এবং পরিস্থিতি খুব নাজুক রূপ ধারণ করলো। কিছু সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিককে (রা) পরামর্শ দিলেন যে, এমন নাজুক অবস্থায় ইসলামের এসব জানবাজকে মদীনার বাইরে প্রেরণ করা উচিত নয়। এ জন্য এই অভিযান মুলতবী করে দিন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁদের সঙ্গে একমত হলেন না এবং বললেন ঃ

"আল্লাহর কসম! স্বয়ং রাসূলে করিম (সা) যে অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাতে আমি অবশ্যই বাধা দিব না। হুজুরের (সা) নির্দেশ পালনে যদি পাখীরা আমাকে নখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েও ফেলে তাতেও কোন পরওয়া নেই।"

তারপর খলিফাতুর রাসূল (সা) কিছু দূর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে সেই সৈন্যদের সঙ্গে গেলেন এবং দোয়ার মাধ্যমে তাদেরকে বিদায় করলেন। এই বাহিনী উসামা (রা) বাহিনী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দুশমনদেরকে যথাযথ শাস্তি প্রদানের পর সফল ও বিজয়ী হিসেবে ফিরে এলেন। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) মুহাজির ও আনসারদেরকে সঙ্গে নিয়ে মদীনার বাইরে তাদেরকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। বাহিনীর আগে আগে হযরত বুরাইদা (রা) বিন হুসাইব ঝান্ডা উড়াচ্ছিলেন এবং তাঁর পিছনে সেনাবাহিনী প্রধান হযরত উসামা (রা) নিজের পিতা যায়েদের (রা) ঘোড়া সাবহার ওপর সওয়ার ছিলেন।

এই অভিযানের পর হযরত বুরাইদা (রা) আবু বকর সিদ্দিক (রা) ও ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলের আরো কয়েকটি যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু চরিতকাররা তার বিস্তারিত বিবরণ দেননি।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে বসরা আবাদ হলো। এ সময় হযরত বুরাইদা (রা) অন্য বহু সাহাবীর সঙ্গে সেখানে চলে গেলেন এবং সেখানেই একটি বাড়ী নির্মাণ করেন।

হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতকালে খোরাসানে সামরিক অভিযান চালানো হয়। তখন হযরত বুরাইদাও (রা) ইসলামী বাহিনীতে শামিল হয়ে যান এবং এই পর্যায়ে কয়েকটি যুদ্ধে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করেন।

আল-বালাজুরী (র) ফতুহুল বুলদানে লিখেছেন যে, ৫১ হিজরীতে যিয়াদ বিন আবিয়া এক ফরমান জারী করেন। তাতে তিনি বসরা ও কুফা থেকে বেশী বেশী লোক খোরাসান গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের নির্দেশ দেন। সুতরাং বিরাট সংখ্যক মানুষ (৫০ হাজার বলা হয়) আর-রাবি' বিন যিয়াদের সঙ্গে সেই সব শহর থেকে স্থানান্তর হয়ে খোরাসানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। তাদের মধ্যে হযরত বুরাইদা (রা) বিন হুসাইবও শামিল ছিলেন। তিনি মারো নামক স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান এবং সেখানেই ৬০ অথবা ৬২ হিজরীতে পরপারের ডাকে সাড়া দেন।

তিনি মৃত্যুকালে দুই ভাগ্যবান পুত্র আবদুল্লাহ (র) ও সোলায়মানকে (র) রেখে যান এই দুই পুত্র জালিলুল কদর পিতার নিকট থেকে কয়েকটি হাদীসও বর্ণনা করেছিলেন। হযরত বুরাইদা (রা) বিন হুসাইবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল ইখলাস ফিদ্বীন, রাসূল প্রেম, শওকে জিহাদ, হক কথন এবং উম্মাহর কল্যাণ কামনার আবেগ। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর শুধুমাত্র নিজেকে আপাদ মস্তক হকের তাবলীগের জন্যই ওয়াকফ করেননি বরং নিজের গোত্রের লোকদেরকেও ইসলামের সীমায় এনে তাদেরকে হকের জানবাজ সিপাহী বানিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূলের (সা) প্রতি গভীর ভালোবাসার অবস্থাটা এমন ছিল যে, তিনি তাঁর প্রতিটি ইরশাদকে জীবনের জপমালা বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং তার ওপর আমল করার জন্য সবসময় তৎপর থাকতেন। জীবন উৎসর্গের আবেগ এবং দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতার বদৌলতে তিনি নবীর (সা) দরবারে বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং হুজুর (সা) তাঁর প্রতি সীমাহীন স্নেহ প্রদর্শন করতেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, একবার হযরত বুরাইদা (রা) কোথাও যাচ্ছিলেন। এমন সময় রাস্তায় মহানবীর (সা) সাথে সাক্ষাত হয়ে গেল। হুজুর (সা) কোন লৌকিকতা ছাড়াই তাঁর হাত ধরলেন এবং তারপর তাঁর সাথে সামনে অগ্রসর হলেন। জানা যায় যে, হযরত বুরাইদা (রা) হুজুরের (সা) এই বিশেষ স্নেহ আরো কয়েকবার লাভ করেছিলেন।

হযরত বুরাইদার (রা) রাসূল প্রেমের আন্দাজ ঐ কথা থেকেই করা যায় যে, হুজুর (সা) তাঁকে নিজের দেশে অবস্থান কালেই মুহাজির আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রিয়নবী (সা) থেকে দূরে থাকাটা তাঁর কোনক্রমেই সহ্য

হলো না এবং তিনি নিজের ঘরবাড়ি ত্যাগ করে মদীনা মুনাওয়ারাতে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন। কেননা নবীর (সা) ফয়েজ অব্যাহতভাবে লাভের আবেগ এভাবেই পূর্ণ হতে পারতো।

হযরত বুরাইদা (রা) ছিলেন একজন বাহাদুর ও নির্ভীক মানুষ। আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য তাঁর অন্তর সবসময় তড়পাতো। মদীনা মুনাওয়ারা আসার পর হুজুরের (সা) ওফাত পর্যন্ত সকল যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন। তাঁর এই আবেগ ও উচ্ছ্বাস হুজুরের (সা) ইন্তেকালের পরও ছিল এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলেও তিনি জিহাদের ময়দান থেকে পিছু হটে থাকেননি। তিনি বলতেন, জীবনের আনন্দ যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া দৌড়িয়েই লাভ করা যায়।

কাফের ও মুশরিকদের মুকাবিলায় হযরত বুরাইদার (রা) আবেগ ও উচ্ছ্বাসের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের পারস্পরিক গৃহ যুদ্ধে তাঁর তরবারী সবসময়ের জন্য ভোঁতা ছিল। তিনি সেই সব গৃহযুদ্ধ থেকে নিজের শরীরকে শুধু বাঁচিয়েই রাখেননি বরং তাতে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারেও কোন রায় কায়েম করেননি এবং উভয় পক্ষের ব্যাপারে সবমময় ভালো ধারণা পোষণ করতেন। তার কারণ এই যে, তাঁর অন্তরে সবসময় উম্মাহর কল্যাণ কামনাই স্থান পেত।

ইবনে সায়াদ (র) বকর বিন ওয়ায়েলের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি বুরাইদা (রা) হুসাইবের সঙ্গে সিজিস্তানে (জিহাদের ময়দানে) ছিলাম। একদিন আমি তাঁর সামনে হযরত আলী (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত তালহা (রা) এবং হযরত যোবায়ের (রা) সম্পর্কে কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করলাম। উদ্দেশ্য ছিল যে, এভাবে সেই সকল সাহাবী সম্পর্কে আমি হযরত বুরাইদার (রা) মত জানতে পারবো। আমার অভিযোগসমূহ শুনে হযরত বুরাইদা (রা) একাকি কিবলামুখী হয়ে গেলেন এবং দু'হাত তুলে এই দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ! আলী (রা) বিন আবি তালিবকে ক্ষমা কর। ওসমানকে (রা) ক্ষমা কর। তালহাকে (রা) ক্ষমা কর। যোবায়েরকে (রা) ক্ষমা কর।"

তারপর তিনি আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "তোমার পিতা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। মনে হয় যেন, তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও।"

আমি বললাম ঃ "আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি আপনাকে হত্যা করতে

চাই না। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, এসব অভিযোগের মাধ্যমে তাদের ব্যাপারে আপনার রায় জানবো।"

তিনি বললেন, "ঐসব সাহাবী বা ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা সাবিকুনাল আউয়ালুন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এখন তাদের ব্যাপার আল্লাহরই হাতে। চাইলে তিনি নেকীর বদলায় তাদেরকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। আবার চাইলে তাদের ভুল-ভ্রান্তির শাস্তিও দিতে পারেন।"

সত্য কথনই ছিল হযরত বুরাইদার (রা) উল্লেখযোগ্য গুণ। সত্য কথা বলতে তিনি কাউকেই খাতির করতেন না। এই প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) একটি রেওয়ায়াত নকল করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, একবার হযরত বুরাইদা (রা) আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নিকট তাশরীফ নিলেন। সে সময় অন্য আরেক ব্যক্তি তাঁর সাথে আলোচনায় মশগুল ছিলো। সে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সম্পর্কে কিছু অনুপোযোগী কথা বললো, হযরত বুরাইদা (রা) তা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি হযরত আমীর মুয়াবিয়াকে (রা) বললেন ঃ "আমিও কি কিছু বলতে পারি ?"

তিনি বললেন, "হাঁ, খুব উৎসাহের সাথে বলতে পারেন।"

তিনি বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহকে স্বয়ং বলতে শুনেছি যে, হাশরের দিন আমি দুনিয়ায় যত পাথর ও বৃক্ষ আছে সেই সংখ্যক মানুষের সুপারিশের আশা করি। মুয়াবিয়া! তুমি যদি এই সাধারণ সুপারিশের যোগ্য হও তাহলে আলী (রা) কেন হতে পারবে না ?"

তাঁর কথা শুনে আমীর মুয়াবিয়া (রা) চুপ মেরে গেলেন এবং সেই ব্যক্তিও সেই বিষয়ে আর মুখ খোলেনি।

হযরত বুরাইদা (রা) কয়েক বছর অব্যাহতভাবে সরাসরি নবীর (সা) ফয়েজ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। এজন্য তাঁর ইলম ও ফজলের মাত্রা খুব বুলন্দ হয়ে গিয়েছিল। হাদীস বর্ণনার দিক থেকে হযরত বুরাইদার (রা) স্থান সাহাবায়ে-কিরামের (রা) তৃতীয় তবকায় নির্ধারিত হয়ে থাকে। তিনি ১৬৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত বুরাইদা (রা) অত্যন্ত মজবুত আকীদার মুসলমান ছিলেন। প্রিয় নবীর (সা) নিকট থেকে যা কিছু শুনতেন তার প্রতিটি তথ্যের ওপর আস্থা রাখতেন মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, হযরত বুরাইদা (রা) একদিন রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত ছিলেন এবং হুজুরের (সা) ইরশাদসমূহ থেকে ফায়দা হাসিল করছিলেন। আলোচনার মধ্যে হুজুর (সা) বললেন ঃ

"সেই সময় আসছে যখন আমার উম্মাতের ওপর এক প্রশস্ত চেহারা ও ছোট ছোট চক্ষু বিশিষ্ট জাতি তিনবার হামলা করবে এবং তাদেরকে ঠেলতে ঠেলতে জাযিরাতুল আরবের মধ্যে সীমিত করে ফেলবে। তার প্রথম হামলায় যারা পালাবে তারা বেঁচে যাবে। দ্বিতীয় হামলায় কিছু বেঁচে যাবে এবং কিছু নিহত হবে। তৃতীয় হামলায় সকল মানুষ সেই মুসিবতের শিকার হবে।"

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! হামলাকারীরা কারা ? হুজুর (সা) বললেন ঃ তারা তুর্কী।" আবার বললেন, "আল্লাহর কসম! তারা নিজেদের ঘোড়াকে মসজিদে বাধবে।"

হুজুর (সা) যদিও সেই ফিতনা প্রকাশের কাল সম্পর্কে কিছু বলেননি। কিন্তু তাঁর ইরশাদ শোনার পর হযরত বুরাইদা (রা) সবসময় দুই-তিনটি উট ও পানির পাত্র নিজের নিকট রাখতেন। এর উদ্দেশ্য হলো, যদি তাঁর জীবনে ফিতনা দেখা দেয় তাহলে তিনি তা থেকে বেঁচে বাইরে চলে যাবেন।

হযরত বুরাইদা (রা) শুধুমাত্র স্বয়ং প্রিয় নবীর (সা) ইরশাদ সমূহকে নিজের জীবনের কর্মসূচীই মনে করতেন না বরং তা অত্যন্ত আগ্রহ ভরে অন্যদের নিকটও পৌঁছাতেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে অধিকাংশই আকায়েদ, আখলাক ও আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট। এসব হাদীস শুধুমাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি মাসয়ালার ওপরই আলোকপাত করে না বরং নেক আমলের দিকেও উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীসের মর্মার্থ হলো ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল, তার আমল মূল্যহীন হয়ে পড়লো।" (বুখারী)

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে যে বস্তুর ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতি তাহলো নামায। যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেবে সে কাফের হয়ে যাবে।" (নাসায়ী)

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তাদেরকে সুসংবাদ দাও যারা অন্ধকারে মসজিদের পানে যায়। কিয়ামতের দিন তার (আমলের) কারণে তারা পূর্ণ আলো পাবে।" (তিরমিযি, আবু দাউদ)।

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে এবং তার মাধ্যমে লোকদের নিকট থেকে আহার করবে। (অর্থাৎ কুরআনকে দুনিয়া হাসিলের মাধ্যম বানাবে) সে কিয়ামতের দিন এমন সুরতে উত্থিত হবে যে, তার চেহারায় কোন গোশত থাকবে না। শুধুমাত্র হাড় আর হাড়ই থাকবে।"

(বায়হাকী)

"ঈদুল ফিতরের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু না খেয়ে ঈদের নামাযের জন্য যেতেন না এবং ঈদুল আযহার দিন সে সময় পর্যন্ত কিছু খেতেন না যে সময় পর্যন্ত নামায না পড়ে নিতেন।"

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বিতরের নামায হক। যে ব্যক্তি বিতরের নামায পড়লো না সে আমাদের মধ্যেকার নয় (একথা তিনি তিন বার বললেন)।" (আবু দাউদ)

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষের দেহে ৩৬০টি জোড়া আছে। মানুষের উচিত প্রত্যেক জোড়ার জন্য সাদকা দান করা। সাহাবীরা আরজ করলেন, হে আল্লাহর নবী! কে তার শক্তি রাখে? তিনি বললেন, মসজিদে পড়ে থাকা থুথুকে মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়াও সাদকা এবং কষ্টদায়ক বস্তুকে রাস্তা থেকে উঠিয়ে সরিয়ে দেয়াও সাদকা।" (আবু দাউদ)

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নামাযের সময়সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তুমি আমার সঙ্গে নামায পড়। সুতরাং যখন সূর্য ঢলে পড়লো তখন তিনি জোহরের নামায পড়লেন। অতপর তিনি আসরের নামায পড়লেন। এ সময় সূর্য উঁচুতে ও সাদা এবং পরিষ্কার ছিল। তারপর তিনি সূর্য অদৃশ্য হওয়ার পর মাগরিবের নামায আদায় করলেন এবং যখন লালিমা অপসৃত হয়ে গেল তখন তিনি এশার নামায পড়লেন। যখন সুবাহ হলো তখন ফজরের নামায আদায় করলেন। পরের দিন তিনি জোহরের নামায সে সময় পড়লেন যখন ওয়াক্ত খুব ঠান্ডা হয়ে গেল এবং আসর সে সময় যখন সূর্য শেষ উঁচুতে ছিল। অতপর মাগরিবের নামায লালিমা অদৃশ্য হওয়ায় কিছু পূর্বে এবং এশার নামায রাতের তিন ভাগের এক ভাগ অতিক্রমের পর এবং ফজরের নামায খুব আলোকিত হওয়ার পর পড়লেন। তারপর তিনি বললেন, নামাযের ওয়াক্তসমূহ জিজ্ঞেসকারী কোথায়? সেই ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির। তিনি বললেন, তোমার নামাযের সময় হলো এই দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়।" (সহীহ মুসলিম)

হযরত উরওয়া (রা) বিন
মাসউদ ছাকাফী

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাস। প্রিয়নবী (সা) চৌদ্দশ' জাননিছার সমভিব্যাহারে ওমরার জন্য মক্কা রওয়ানা হলেন। কুরবানীর উট ছিল সাথে। হুজুরের (সা) নির্দেশ অনুযায়ী সকল মুসলমান স্ব স্ব তরবারী খাপে ভরে রেখেছিলেন। কেননা, তাদের সফরের উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র পবিত্র কা'বার তাওয়াফ এবং যিয়ারতের মর্যাদা লাভ করা। তাতে যুদ্ধের কোন কথাই ছিল না। হকপন্থীদের এই পবিত্র দল যখন মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌছলো তখন হুজুর (সা) খবর পেলেন যে, কুরাইশরা যে কোন মূল্যে মুসলমানদেরকে মক্কা প্রবেশে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর এবং এই উদ্দেশ্যে তারা একটি বিরাট দল একত্রিত করেছে। এই খবর পেয়ে হুজুর (সা) কুরাইশের নিকট একজন দূত প্রেরণ করলেন। দূতটির নিকট প্রেরিত পয়গামে তিনি বললেন যে, তাঁরা শুধুমাত্র ওমরা আদায়ের জন্য এসেছেন। যুদ্ধ উদ্দেশ্য নয়। এটাই সর্বোত্তম যে, কুরাইশরা একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে সন্ধি করে নেবে এবং তাদের ও কওমের ব্যাপারটি আরবদের হাতে ছেড়ে দেবে। তারা যদি বিজয়ী হয় তাহলে তা তাদের সঠিক মতের ওপর নির্ভরশীল হবে। তাঁদের জামায়াতে শামিল হও বা না হও। যদি তারা সন্ধি অনুমোদন না করে তাহলে আল্লাহর কসম, তিনি তাদের সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করবেন। হুজুরের (সা) দূত কুরাইশের নিকট গিয়ে বললেন যে, আমি মুহাম্মাদের (সা) পয়গাম তোমাদের জন্য বহন করে এনেছি। তোমরা যদি চাও তাহলে তা বর্ণনা করি? কতিপয় আবেগপ্রবণ লোক বললো—আমাদের তা শোনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কুরাইশের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বললো, তুমি যে পয়গাম এনেছ তা বর্ণনা কর। দূত সেই পয়গাম বর্ণনা করলেন। তখন মুশরিকদের মধ্যকার একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও সুদর্শন মানুষ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বললেন :

"হে কুরাইশের দল! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কি আমার পিতৃসমতুল্য নও?" লোকেরা বললো : "কেন নয়, অবশ্যই।" তারপর সেই ব্যক্তি বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কি আমার সন্তানতুল্য নও?" সকলেই জবাব দিল, " হ্যাঁ, অবশ্যই।" সেই ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা আমার সম্পর্কে কোন খারাব ধারণা পোষণ কর?" কুরাইশরা একবাক্যে বললো, "কখনো নয়।" সেই ব্যক্তি বললো, "তোমাদের স্মরণে আছে যে, আমি উকাজবাসীকে তোমাদের সাহায্যের জন্য বলেছিলাম এবং যখন তারা অস্বীকার

করেছিল, তখন আমি নিজের সন্তান ও সমর্থকদেরকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের সাহায্যের জন্য এসেছিলাম।" কুরাইশরা জবাব দিল, "জ্বী, হ্যা। আপনার ইহসানের কথা খুব স্মরণ আছে।" যখন এই সওয়াল জবাব শেষ হলো তখন সেই ব্যক্তি বললো, " মুহাম্মাদের (সা) পয়গাম খুব যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তোমরা যদি আমাকে অনুমতি দাও, তাহলে আমি মুহাম্মাদের (সা) সাথে সাক্ষাত করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিব।" সকলেই রাজী হয়ে গেলো। এ সময় তিনি হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। সেই সাথে তিনি চারপাশের অবস্থাও খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। যখন কুরাইশদের নিকট ফিরে গেলেন তখন তাদেরকে হুজুরের (সা) সাথে তার আলোচনার বিশদ বিবরণ দিলেন এবং অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে তাদেরকে বললেন, "কুরাইশ ভাইসব! দুনিয়ার বড় বড় শাসকদের দরবারে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি কায়সার ও কিসরার দরবার ও নাজ্জাশীর শান-শওকত দেখেছি। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি কোন ক্রয় করা গোলামকেও নিজের বাদশাহাকে এত সম্মান করতে দেখিনি, যা মুহাম্মাদের (সা) সাথী-সঙ্গীরা তাঁকে করে থাকে। মুহাম্মাদ (সা) থু থু নিক্ষেপ করলে তা তারা অগ্রসর হয়ে নিজের হাতে নেয় এবং ভালোবাসার আবেগে নিজের চেহারা ও হাতে ডলে দেয়। মুহাম্মাদ (সা) ওজু করেন তখন তারা ব্যবহৃত পানির এক কাতরার জন্য এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে, মনে হবে তারা পরস্পর লড়াই করে মারা যাবে। মুহাম্মাদ (সা) কোন নির্দেশ দিলে সকলেই তা পালনের জন্য দৌড়ে আসে। মুহাম্মাদ (সা) যখন কোন কথা বলে, তখন সকলের আওয়াজ ছোট হয়ে যায়। মুহাম্মাদের (সা) মহানত্ব ও মর্যাদার অবস্থাটা এমন যে, তাঁর কোন সঙ্গী তাঁর দিকে নজর উঠিয়ে দেখতেও পারে না। আমার কথা যদি মানো, তাহলে মুহাম্মাদের (সা) প্রস্তাব মেনে নাও। এটা অত্যন্ত পসন্দনীয় এবং যুক্তিযুক্ত।"

এ ব্যক্তি যিনি রক্তাক্ত যুদ্ধ ঠেকানোর লক্ষ্যে মুসলমান ও কুরাইশের মধ্যে সন্ধির জন্য অত্যন্ত ইখলাস ও দরদের সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বনু ছাকিফের সরদার আবু মাসউদ উরওয়া (রা) বিন মাসউদ।

সাইয়েদেনা হযরত আবু মাসউদ উরওয়া (রা) বিন মাসউদ যদিও শেষ পর্যায়ের সাহাবীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তবুও তিনি মহান সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তিনি তায়েফের মশহুর কবিলা বনু ছাকিফের আশরাফদের মধ্যেকার মানুষ ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

উরওয়া (রা) বিন মাসউদ বিন মালিক বিন কা'ব বিন আমর বিন সায়াদ বিন আওফ বিন ছাকিফ বিন মুনাব্বা বিন বাকার বিন হাওয়াযিন বিন আকরামা বিন খাসফা বিন কায়েস আইলান।

উরওয়া (রা) ছিলেন অত্যন্ত নেকদিল, সঠিক মত ও বাহাদুর মানুষ। বনু ছাকিফের মধ্যে তাকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। মক্কার কুরাইশের সাথেও তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল এবং তিনি প্রায়ই মক্কা আসা-যাওয়া করতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি মক্কায় উপস্থিত ছিলেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি কুরাইশের আহবানে মক্কা এসেছিলেন এবং অনেকের মতে তিনি নিজেই এই ঝগড়া মিটানোর জন্য মক্কা এসেছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার এবং হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (সা) হযরত বাছার (রা) বিন সুফিয়ান খাজায়ীকে কুরাইশদের মতামত জানার জন্য মক্কা প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাহফিক করে আসফান নামক স্থানে হুজুরের (সা) সঙ্গে মিলিত হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! কুরাইশরা বাধা দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।"

সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়াত অনুযায়ী সর্বপ্রথম হযরত বাদিল (রা) বিন ওয়ারকা খাজায়ী হুজুরকে (সা) কুরাইশের বাধাদানের খবর দিয়েছিলেন এবং তিনিই হুজুরের (সা) পয়গাম কুরাইশকে পৌছিয়েছিলেন।

হযরত উরওয়া (রা) বিন মাসউদ কুরাইশের দূত হয়ে হুজুরের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। এ সময় তিনি তাঁর নিকটও সেই প্রস্তাবই পেশ করলেন যা নিজের দূতের মাধ্যমে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। উরওয়া (রা) মনস্তাত্বিক অস্ত্র প্রয়োগ করে কাজ হাসিল করতে চাইলেন এবং বললেন ঃ

"মুহাম্মাদ (সা) ! ধর, তুমি যদি নিজের কওমের উৎখাতে সফল হও তাহলে তুমি কি আরবের কোন মানুষের সম্পর্কে আজ পর্যন্ত শুনেছ যে, সে নিজে নিজের কওমকে ধ্বংস করেছে এবং যদি লড়াইয়ের ফল অন্য কিছু হয় তাহলে আল্লাহর কসম, তোমার চারপাশে যাদেরকে দেখছো তারা সবাই ভেগে যাবে এবং তোমাকে একাকী রেখে যাবে।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) উরওয়ার (রা) কথা শুনে ক্রোধে অস্থির হয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"আরে যা-যা ! তোর মাবুদ 'লাতের' গুপ্ত অংগ চোষেক গিয়ে। আরে আমরা মুহাম্মাদকে (সা) রেখে ভেগে যাবো এবং তাঁকে একাকী রেখে যাবো ?"

উরওয়া (রা) বললেন, "আবু বকর! তোমার কিছু ইহসান যদি আমার ওপর না থাকতো তাহলে আল্লাহর কসম, আমি তোমার কঠোর কথার অবশ্যই জবাব দিতাম।"

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু বকরের (রা) কথা শুনে উরওয়া (রা) জিজ্ঞেস করলো যে, এ কে ? যখন তাঁকে বলা হলো যে, তিনি আবু বকর বিন আবি কোহাফা, তখন তিনি হযরত আবু বকরের (রা) পুরাতন ইহসানের উদ্ধৃতি দিয়ে কোন কঠোর জবাব দান থেকে বিরত রলেন। কিন্তু এসব রেওয়ায়াত সঠিক হওয়ার প্রশ্নে কথা আছে। কেননা, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) কুরাইশের অত্যন্ত মশহুর ও মারুফ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। চেহারা দেখে বা কণ্ঠস্বর শুনে হযরত উরওয়া (রা) তাঁকে চিনতে পারলেন না এটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

তারপর উরওয়া (রা) পুনরায় হুজুরের (সা) সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মশগুল হয়ে গেলেন। আরবদের অভ্যাস বা রেওয়াজ ছিল যে, আলোচনার সময় তারা পরস্পরের দাড়ি স্পর্শ করতো অথবা তা ধরতো। উরওয়া (রা) কথোপকথনের সময় বার বার হুজুরের (সা) দাড়ি মুবারকের দিকে হাত অগ্রসর করছিলেন। হযরত মুগিরা (রা) বিন শুবা শিরস্ত্রান পড়ে তরবারী হাতে হুজুরের পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। যেই উরওয়া (রা) হুজুরের পবিত্র দাড়ির প্রতি হাত বাড়াতেন, হযরত মুগিরা (রা) তরবারীর হাতলের ওপর তাঁর হাত মারতেন এবং বলতেন, "খবরদার! নিজের হাত হুজুরের (সা) পবিত্র দাড়ি থেকে দূরে রাখ।"

হযরত মুগিরার (রা) চেহারা শিরস্ত্রানে ঢাকা ছিল। উরওয়া (রা) ভীত হয়ে বললেন, এ ব্যক্তি কে ? লোকেরা বললো, সে হলো মুগিরা (রা) বিন শু'বা।"

উরওয়া (রা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "এই গাদ্দার! আমি কি তোমাকে অমুক গাদ্দারীর সময় সাহায্য করিনি ? [জাহেলী যুগে হযরত মুগিরা (রা) কতিপয় লোককে হত্যা করেছিল এবং তাদের মাল নিয়ে নিয়েছিল। তারপর তিনি হুজুরের খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন। হুজুর (সা) মুগিরার (রা) ইসলাম গ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে, তুমি যে মাল লুটে এনেছ তা আমাদের প্রয়োজন নেই। সহীহ বুখারীতে আছে যে, উরওয়া (রা) বিন মাসউদ মুগিরার (রা) পক্ষ থেকে নিহতদের শোণীতপাত আদায় করেছিলেন। এ সময় তিনি সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন।]

হুদায়বিয়ায় নিজের দৌত্য গিরির সময় হযরত উরওয়া (রা) হুজুরের (সা) প্রতি সাহাবায়ে কিরামের (রা) গভীর ভালোবাসার যে বিস্ময়কর দৃশ্য দেখলেন তাতে তিনি খুব প্রভাবিত হলেন। ফিরে গিয়ে কুরাইশের সামনে সেই দৃশ্য অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণভাবে বিস্তারিত বললেন এবং তাদেরকে পরামর্শ দিলেন যে,

মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নাও এবং তাদেরকে মক্কা প্রবেশে বাধা দিও না। কুরাইশরা সে সময় তাঁর পরামর্শ মানলো না। কিন্তু বাইয়াতে রিদওয়ানের পর তারা হুদায়বিয়ার সন্ধিনামায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।

অষ্টম হিজরীতে মহানবী (সা) তায়েফের যুদ্ধ থেকে ফারেগ হয়ে মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে হযরত উরওয়া (রা) বিন মাসউদ তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তারপর তিনি আরজ করলেন।

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার গ্রোত্রকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের অনুমতি আমাকে দিন।"

বনু ছাকিফ অত্যন্ত যোদ্ধা ও অহংকারী ছিল। হুজুর (সা) বললেন, "তোমার পাষাণ হৃদয় কওম তোমার সাথে লড়াই করবে" (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী তোমার কওম তোমাকে কতল করবে) তিনি আরজ করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল। বনু ছাকিফ আমাকে খুব সম্মান করে। এমনকি আমি শুয়ে থাকলে আমাকে জাগায়ও না। কারণ, তাতে আমার কষ্ট হতে পারে এই ভেবে। তাঁর কথা শুনে হুজুর (সা) তাঁকে হকের তাবলীগ করার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য নিয়ে হযরত উরওয়া (রা) বিন মাসউদ প্রায় এশার নামাযের সময় তায়েফ পৌছলেন। বনু ছাকিফ তাঁর আগমনের খবর শুনে মুলাকাতের জন্য এলো এবং জাহেলিয়াতের পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁকে সালাম করলো। তিনি তাতে খুব কঠোরভাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, জান্নাতবাসীর মত তোমাদের সালাম করা উচিত এবং আস্সালামু আলাইকুম বলা দরকার। তারপর তিনি বনু ছাকিফকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাতে তারা জ্বলে উঠলো এবং হযরত উরওয়া (রা) অত্যন্ত ক্লান্ত বলে চলে গেল।

সকালে হযরত উরওয়া (রা) নিজের বাড়ীর বালাখানায় দাঁড়িয়ে ফজরের আজান দিলেন। তা শুনে বনু ছাকিফ উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং হযরত উরওয়ার (রা) মান-সম্মানকে তাকে রেখে তাঁর ওপর তীর বর্ষণ শুরু করলো। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, বনু মালিকের (ছাকিফের একটি শাখা) এক ব্যক্তি আওস বিন আওফ তাক করে এমন তীর মারলেন যে, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরায় বিধে গেল। এই তীরই তার মৃত্যু দূত হিসেবে প্রামাণিত হলো। যখন তাঁর জীবিত থাকার আর কোন আশা রলো না তখন তাঁর বংশধররা হাতিয়ার বেধে তাঁর নিকট এলো। এবং বললো, আমরা আপনার প্রতিশোধ অবশ্যই নিব। তাতে যদি আমাদের প্রতিটি শিশুও মারা

যায়। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত বনু মালিকের দশজন সরদারকে হত্যা না করবো ততক্ষণ আমরা আরামের সাথে বসবো না।

হযরত উরওয়া (রা) নেক নফসের দিক থেকে নজিরবিহীন ছিলেন। তিনি বললেন, "এটাতো আমার ওপর আল্লাহর বিশেষ ইহসান যে, তিনি আমাকে শাহাদাতের মর্যাদায় সমাসীন করেছেন। আমার বদলা কাউকে হত্যা করো না। আমি আমার রক্ত ক্ষমা করে দিয়েছি। আমারতো এখন শুধুমাত্র এই আশা যে, আমাকে রাসূলের (সা) সেইসব সঙ্গীর পাশে দাফন করবে যাঁরা তায়েফ অবরোধকালে শহীদ হয়েছিলেন।

অন্য এক রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে, "আমার জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ করো না। আমি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক মুসলিহাতের জন্য নিজের রক্ত ক্ষমা করে দিয়েছি। আমার হত্যাতো আল্লাহর মেহেরবানী। তাঁর শুকর যে, তিনি আমাকে আমার জীবন হক পথে কুরবানী করার তাওফিক দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। যিনি আমাকে এই খবর দিয়েছিলেন যে, তোমার কওম তোমাকে হত্যা করবে।"

এই ওসিয়তের পর হযরত উরওয়া (রা) নিজের জীবন আল্লাহর হাতে সপে দিলেন। আহলে খান্দান তায়েফের গঞ্জে শহীদানে দাফন করে তাঁর শেষ আশা পূরণ করলেন।[১]

বিশ্বনবী (সা) হযরত উরওয়া (রা) বিন মাসউদের শাহাদাতের খবর পেয়ে বললেন ঃ

"উরওয়ার (রা) উদাহরণ সাহেবে ইয়াসিনের মত। তিনি নিজের কওমকে হকের দিকে আহবান করেছিলেন এবং কওম তাঁকে মেরে ফেলেছিল।"

প্রিয় নবী (সা) একবার ইরশাদ করেছিলেন যে, আমাকে নবীদের মিছালী সুরত দেখানো হয়েছে। ইবরাহীম (আ) আমার মত ছিলেন এবং হযরত ইসা মসিহ (আ) উরওয়া (রা) বিন মাসউদের সুরতের মত ছিলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (রা) "আল ইসতিয়াবে" লিখেছেন যে, সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত উরওয়া (রা) বিন মাসউদের শাহাদাতে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন এবং এই হৃদয়বিদারক ঘটনার জন্য একটি মরছিয়াও বলেছিলেন।

১। হযরত উরওয়ার (রা) হত্যাকারী আওস বিন আওফ পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি হযরত উরওয়ার (রা) পুত্র হযরত আবু মলিহ (রা) এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত কারিব (রা) বিন আসওয়াদের তরফ থেকে প্রতিশোধের খটকা ছিল। সুতরাং তিনি নিজের এই খটকার কথা হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) সামনে প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তিনি দু'জনকে ডেকে প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত করেন এবং তাদেরকে আওস (রা) বিন আওফের গলায় গলায় মিলিয়ে দেন।

হযরত আমের (রা) বিন আকওয়া

হযরত আমের (রা) ছিলেন বনু কাময়ার একটি শাখা বুন আসলামের চোখের মণি। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আমের (রা) বিন সিনান বিন আকওয়া বিন আবদুল্লাহ বিন কুছাইর বিন খুযাইমা বিন মালিক বিন সালামান বিন আসলাম।

দাদার নামের নিসবত অনুসারে আমের (রা) বিন আকওয়া নামে মশহুর হন। নামকরা সাহাবী হযরত সালমা (রা) বিন আকওয়া তাঁর আপন ভাই (অথবা দুধভাই) এবং অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

চরিতকাররা হযরত আমেরের (রা) ইসলাম গ্রহণের কাল সম্পর্কে কিছু বলেননি। অবশ্য এটা প্রতিষ্ঠিত বক্তব্য যে, তিনি খায়বারের যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মহানবীর (সা) প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করতেন। তিনি একজন কবি ছিলেন এবং অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে নিজের কবিতা আবৃত্তি করতেন।

প্রিয়নবী (সা) খায়বার যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হলেন। এ সময় তাঁর সফরসঙ্গী সাহাবীদের মধ্যে হযরত আমেরও শামিল ছিলেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত সালমা (রা) বিন আকওয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা মহানবীর (সা) সাথে খায়বার রওয়ানা হলাম। সারারাত সফর করলাম। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি আমের (রা) বিন আকওয়াকে বললো, আমের আমাদেরকে কিছু শুনাবে না ? আমের (রা) ছিলেন কবি মানুষ এবং তাঁর অন্তর ছিল ঈমানী আবেগে পূর্ণ। তিনি সওয়ারী থেকে নেমে উটের গান শুনাতে লাগলেন। সেই গানের মর্মার্থ হলো ঃ

"আল্লাহর কসম! যদি তিনি (সা) না হতেন, তাহলে আমরা হেদায়াত পেতাম না। সাদকা ও খয়রাত করতাম না এবং নামাযও পড়তাম না এবং আমরা তাঁর ফজিলতে বেনেয়াজ নই। হে আল্লাহ! আমাদের ওপর ইতমিনান নাযিল করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জীবিত আছি ততক্ষণ তোমার ওপর ফিদা রয়েছি। আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমরা যখন দুশমনের মুকাবিলায় দাঁড়াবো তখন আমাদেরকে অটলতা ও দৃঢ়তা দান কর।"

হুজুরের (সা) পবিত্র কানে তাঁর কণ্ঠস্বর পৌছলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এই উটের গানকারী কে ?" লোকেরা বললো, "আমের বিন আকওয়া।" তিনি

বললেন, "আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।" হুজুরের ইরশাদ শুনে লোকদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে, আমেরের শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ ঘটবে। কেননা, হুজুর (সা) যখন কোন মুজাহিদকে রহমতের দোয়া দিতেন তখন তিনি খুব শীঘ্র শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতেন। সুতরাং সে সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে তাঁর বীরত্বের ফায়দা উঠাতে দিলেন না।" (অথবা অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি দোয়ায় আমেরের সঙ্গে আমাদেরকেও শরীক করে নিতেন।)

যুদ্ধকালে একদিন হযরত আমের (রা) একটি যুদ্ধগাথা পড়তে পড়তে ইহুদীদেরকে মুকাবিলার জন্য বের হলেন। ইহুদীদের নামকরা যোদ্ধা মারহাব তাঁকে মুকাবিলার জন্য সামনে অগ্রসর হলো। হযরত আমের (রা) মারহাবের ওপর তরবারী দিয়ে কোপ মারলেন। তরবারীটি ছিল ছোট। মারহাবের গায়ে লাগলো না এবং তা জোরে ঘুরে স্বয়ং তাঁর হাঁটুতে লাগলো। তার ব্যথায় তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। অন্য আরেক রেওয়ায়াত অনুযায়ী মারহাবের তরবারী হযরত আমেরের (রা) ঢালের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তিনি তা ঝেটকি মেরে ছাড়াতে লাগলেন। এ সময় তার নিজের তরবারী তাঁর গায়েই লেগে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করলো এবং তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। বস্তুত তাঁর শাহাদাত নিজের তরবারী দ্বারাই হয়েছিল। এজন্য লোকেরা তাঁর প্রতি আত্মহত্যার কথাটি আরোপ করেছিল এবং তার আমল বরবাদ হয়ে গিয়েছে বলে প্রচারণা চালিয়েছিল।

হযরত মুসলিমা (রা) বলেন যে, আমি এমন ধরনের কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হলাম এবং আরজ করলাম ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। লোকেরা বলাবলি করছে যে, আমেরের আমল বাতিল হয়ে গেছে।"

তিনি বললেন, "কে একথা বলেছে?"

আমি আরজ করলাম ঃ "আপনার কতিপয় সাহাবী।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "তাঁরা ভুল বলেছে বরং আমের দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে।"

হযরত আসলাম হাবশী (রা)

কেউ কেউ তাঁর নাম লিখেছেন আসলাম রায়ী (রা) বলে। প্রকৃতপক্ষে তিনি হাবশীও ছিলেন, আবার রায়ীও ছিলেন। হাবশী এজন্যে যে, তিনি হাবশার বাসিন্দা ছিলেন এবং রায়ী এজন্যে যে, তিনি খায়বারের ইহুদীদের বকরী চরাতেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি খায়বারের আমের নামক এক ইহুদীর গোলাম ছিলেন এবং তার বকরী চরাতেন।

সপ্তম হিজরীর প্রথমে মহানবী (সা) খায়বারের যুদ্ধের জন্য গমন করেন। এ সময় ইহুদীরা নিজেদের দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে বাধা দানের জন্য জোর প্রস্তুতি নিল। হযরত আসলাম (রা) ও আমের ইহুদী নাতাত দুর্গে ছিলেন। হযরত আসলাম (রা) ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জন্য সশস্ত্র হচ্ছো। তারা বললো যে, মুহাম্মাদ (সা) নামে এক ব্যক্তি যে নিজেকে আল্লাহর নবী বলে, সে আমাদের ওপর হামলা করেছে। আমরা তার সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি।

তাদের কথা শুনে আসলামের (রা) অন্তরে এক বিস্ময়কর ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হলো এবং তিনি অদৃশ্যভাবেই হুজুরের (সা) প্রচন্ড ভক্ত হয়ে গেলেন। যথারীতি বকরী নিয়ে দুর্গের বাইরে বেরুলাম এবং সোজা মহানবীর (সা) খিদমতে পৌছে গেলাম। অতপর রাসূলের (সা) নিকট নিবেদন করে বললেন ঃ

"হে মুহাম্মাদ! আপনি কিসের দাওয়াত দিয়ে থাকেন।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আল্লাহ ছাড়া কাউকে মাবুদ বানিও না এবং আমাকে আল্লাহর রাসূল মানো।"

হযরত আসলাম (রা) তৎক্ষণাৎ কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে ঈমানের সম্পদে বিত্তবান হয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এই বকরী আমার নিকট আমানত রয়েছে। আমি তাদেরকে মালিকের নিকট পৌছে দিতে চাই।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ বকরীগুলোকে সৈন্যদের বাইরে নিয়ে গিয়ে তাড়িয়ে দাও এবং কিছু পাথর তাদের পেছনে নিক্ষেপ কর। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সেই আমানত থেকে মুক্ত করে দেবেন।

হযরত আসলাম (রা) তাই করলেন এবং বকরীগুলো ভেগে নিজের মালিকের গৃহে প্রবেশ করলো।

যুদ্ধ শুরু হলে হযরত আসলামও (রা) অস্ত্রসহ মুজাহিদদের দলে শামিল হয়ে গেলেন এবং বীর বিক্রমে লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। হুজুর (সা) তাঁর শাহাদাতের খবর শুনে বললেন ঃ عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيراً অর্থাৎ আমল করেছ সামান্য কিন্তু প্রতিদান পেয়েছে বিরাট।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, মুসলমানরা হযরত আসলামের (রা) লাশ একটি তাবুতে রাখলেন। প্রিয়নবী (সা) লাশ দেখার জন্য তাবুর মধ্যে তাশরীফ নিলেন। কিন্তু তক্ষুণি বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা এই হাবশী বান্দাকে সম্মানিত করেছেন এবং তাকে বেহেশতে পৌছে দিয়েছেন। আমি দেখলাম যে, দু'জন হুর তার মাথার পাশে বসে রয়েছে। (অন্য এক রেওয়ায়াতে এই শব্দ আছে যে, তার পাশে তার হুরের মত স্ত্রী বসেছিলো।)

হে আল্লাহ ! একজন হাবশী রাখালের কি সৌভাগ্য যে, তার এক ওয়াক্ত নামায পড়ারও সুযোগ হয়নি এবং সোজা জান্নাতে ঢুকে পড়েছেন।

হযরত আবু মাহযুরা (রা) জুমাহী

অষ্টম হিজরীতে রহমতে আলম (সা) হুনাইনের যুদ্ধ শেষে ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে একটি স্থানে নামাযের সময় হয়ে গেল। হুজুর (সা) নিজের মুয়াজ্জিনকে আযান দানের নির্দেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে সেখানে মক্কার কয়েকজন উদ্ধত যুবকও উপস্থিত ছিল। তখনো তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। হুজুরের (সা) মুয়াজ্জিনের আযান দেয়া হয়ে গিয়েছিল। এ সময় তারা ঠাট্টাচ্ছলে আযানের নকল করতে লাগলো। তাদের মধ্যেকার এক যুবকের গলার আওয়াজ ছিল খুব বুলন্দ এবং হৃদয়গ্রাহী। হুজুর (সা) সেইসব নওজোয়ানকে ডেকে পাঠালেন। তারা এলে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে খুব উচ্চস্বরে আযানের নকল করছিল। সকলে সেই যুবকের দিকে ইশারা করলো। হুজুর (সা) সেই যুবককে তাঁর সামনে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সে বাধ্য হয়ে নির্দেশ মানার জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। কিন্তু আযান সম্পর্কে পুরোপুরি জানা ছিল না। এজন্য হুজুর (সা) তাকে স্বয়ং আযান বলে দিতে লাগলেন। তিনি রাসূলের (সা) মুখে যে কালেমা শুনলেন তাই উচ্চারণ করলেন। যেই বাক্যগুলো দোহারাচ্ছিলেন সেই অন্তর থেকে কুফর ও শিরকের মরিচা দূর হয়ে যাচ্ছিল। আযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার অন্তর পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ সাচ্চা দিলে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করতে লাগলেন। রহমতে আলম (সা) তাকে একটি থলে দান করলেন। তাতে কিছু রূপা ছিল। তারপর তিনি নিজের পবিত্র হাত যুবকের মাথা, মুখ, সিনা, পেট ও নাভি পর্যন্ত ডলে দিলেন এবং তিনবার এই দোয়া পড়লেন ঃ

بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ وَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ

এই ভাগ্যবান যুবক যাঁকে মহানবী (সা) তিনবার বরকতের দোয়া দিয়েছিলেন—তিনি ছিলেন হযরত আবু মাহযুরা জুমাহী কারাশী।

হযরত আবু মাহযুরার (রা) নাম নিয়ে বড় মতপার্থক্য আছে। কেউ তাঁর নাম লিখেছেন সালমান। আবার কেউ লিখেছেন সালমা। কেউবা লিখেছেন সামরাহ। অবশ্য তার কুনিয়ত যে আবু মাহযুরা ছিল এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন এবং তিনি ইতিহাসে নিজের কুনিয়তেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কুরাইশের বনু জুমাহী খান্দানের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসব নামা হলো ঃ

আবু মাহযুরা (রা) বিন মুঈর বিন লুজান বিন রাবিয়া বিন কোরায়েজ বিন সায়াদ বিন জুমাহ।

আবু মাহযুরা মক্কার সেইসব সচ্ছল যুবকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা তাওহীদের দাওয়াতের প্রতি কোন গুরুত্বই দেয়নি। এমনকি মক্কার ওপর হকপন্থীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাও তাদের সঠিক পথে আনতে পারেনি। তা সত্ত্বেও রাসূলের (সা) রহমতের শান হলো যে, তিনি প্রায় সকল মক্কাবাসীকেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, যাও আজ তোমাদেরকে আর জবাবদিহি করতে হবে না। সে সময় যারা হুজুরের (সা) দয়ায় উপকৃত হয়েছিলেন তাদেরকে তুলাকা বলা হয়। প্রিয় নবী (সা) মক্কা থেকে হুনাইন তাশরীফ নিলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে বিশেষ একটি সংখ্যা তুলাকাও ছিল। তাদের মধ্যে হযরত আবু মাহযুরা (রা) এবং তার ন'জন বন্ধুও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হুজুর (সা) হুনাইনের যুদ্ধ থেকে ফারেগ হয়ে ফিরতি সনের শুরু করলেন। তখন রাস্তায় সেই ঘটনা সংঘটিত হলো যার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। স্বয়ং হযরত আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আযানের নকল অর্থাৎ ভ্যাঙ্গানোর জন্য আমাকে এবং আমার সঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠালেন। তিনি যখন জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমাদের মধ্যে সে কে যার আওয়াজ খুব বুলন্দ ছিল। তখন সকলেই আমার দিকে ইশারা করলো। সুতরাং, হুজুর (সা) অন্য সকলকে তো ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমাকে ঠেকিয়ে রাখলেন। তারপর তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, দাঁড়াও, আবার আযান দাও। সে সময় আমার অবস্থা এমন ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যে আযান দানের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর চেয়ে খারাব ও ক্রোধের বস্তু আমার নিকট আর কোন বস্তু ছিল না। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আমি নির্দেশ পালনের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি স্বয়ং আমাকে আযান বলে দিলেন। আমি যখন আযান শেষ করলাম তখন তিনি আমাকে একটি থলিতে কিছু রূপা দিলেন এবং আমার কপাল থেকে নাভি পর্যন্ত পবিত্র হাত স্পর্শ করে তিন বার বরকতের দোয়া দিলেন। হুজুরের (সা) দোয়া ও পবিত্র হাতের বরকতে আমি ঈমান সম্পদ লাভ করলাম এবং আমি রাসূলের (সা) খিদমতে আরজ করলাম যে, আমাকে মক্কা মুয়াজ্জমায় মসজিদে হারামের মুয়াজ্জিন বানিয়ে দিন। তিনি বললেন, যাও, এখন থেকে তুমি মসজিদে হারামে আযান দেবে।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল-ইসতিয়াবে" লিখেছেন যে, তারপর হযরত আবু মাহযুরা (রা) মক্কা গিয়ে স্থায়ীভাবে আযান দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। মাখদুম মুহাম্মাদ হাশেম সিন্ধী (র) নিজের কিতাব 'বাযলুল কুওয়াত'–এ বর্ণনা করেছেন যে, যে সময় হযরত আবু মাহযুরা (রা)

মক্কাবাসীর মুয়াজ্জিন হয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর। তিনি সারা জীবন এই খিদমত আঞ্জাম দেন এবং তাঁর ওফাতের পর এই খিদমতের সৌভাগ্য তাঁর সন্তানদের মধ্যে বংশ পরম্পরা অব্যাহত থাকে।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আযানের উচ্চারণ স্বয়ং নবী করিম (সা) আমাকে শিখিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন বল ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ- اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ

اَشْهَدُوْا اَن لاَّ اِلَه اِلاَّ اللّٰهُ - اَشْهَدُوا اَن لاَّ اِلَه اِلاَّ اللّٰهُ

اَشْهَدُوْا اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه - اَشْهَدُوا اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

حَىَّ عَلٰى الصَّلٰوةِ - حَىَّ عَلٰى الصَّلٰوةِ -

حَىَّ عَلٰى الْفَلاَحِ - حَىَّ عَلٰى الْفَلاَحِ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لاَ اِلَه اِلاَّ اللّٰهُ -

এই রেওয়ায়াতের পরিপ্রেক্ষিতে হুজুর (সা) আবু মাহযুরা (রা) শাহাদাতের কালেমাকে দু'বারের পরিবর্তে চারবার বলিয়েছিলেন। হাদীসের ব্যাখ্যাতারা এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, সে সময় হযরত আবু মাহযুরার (রা) অন্তরে কুফর ও শিরকের মরিচা ধরে ছিল এবং তিনি ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আযান দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। এ জন্য হুজুর (সা) তাঁর সেই বিশেষ অবস্থার কারণে শাহাদাতের এই কালেমা তাঁকে দিয়ে চার চার বার বলিয়েছিলেন। যাতে আল্লাহ তায়ালা ঐ কালেমাগুলো নিজের এই বান্দার অন্তরে খুব ভালোভাবে বসিয়ে দেন। নচেৎ অন্য কোন সনদওয়ালা রেওয়ায়াত থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত নেই যে, হুজুর (সা) আযানে শাহাদাতের কালেমা চার চার বার বলার নির্দেশ দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও হযরত আবু মাহযুরার (রা) ব্যাপারে অধিকাংশ চরিতকারই লিখেছেন যে, তিনি সব সময় মক্কা মুয়াজ্জামাতে তেমনি আযান দিতেন, হুজুর (সা) যেমন তাঁকে শিখিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি শাহাদাতের কালেমাকে উল্লেখিত নিয়মের সাথে প্রত্যেক আযানে সবসময় চার চার বারই বলতেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ মনজুর নুমানী মায়ারিফুল হাদীসে লিখেছেন যে, সম্ভবত তার কারণ এই ছিল যে, হুজুর (সা) যেভাবে তাঁকে আযান বলিয়েছিলেন এবং যাঁর বরকতে তিনি দ্বীনের দৌলত পেয়েছিলেন, তাঁর প্রেমিকের মত হুবহু সেই আযান সবসময়ের জন্য দিতে চাইতেন। নচেৎ তিনি এটা অবশ্যই জানতেন যে, হুজুরের (সা) মুয়াজ্জিন বিলাল (রা) কিভাবে আযান দিয়ে থাকেন।"

হযরত আবু মাহযুরার (রা) আযানও সুমিষ্ট কণ্ঠ এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, কবিরা তার কসম পর্যন্ত খেত।

হযরত আবু মাহযুরা (রা) আজীবন মক্কায় থেকে আযান দিতে থাকেন এবং এখানেই ৫৮ হিজরীতে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে যাত্রা করেন। মৃত্যুকালে তিনি আবদুল মালিক নামক এক পুত্র রেখে গিয়েছিলেন। হযরত আবু মাহযুরা (রা) থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে।

হযরত আবু মাহযুরা (রা) যদিও শেষে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রিয়নবীর (সা) দোয়ার বরকতে তাঁর অন্তর আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল। হুজুরের (সা) প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অবস্থাটা এমন ছিল যে, তিনি নিজের মাথার সামনের অংশের (নাসিয়া) চুল কখনো কাটাতেন না। হুজুর (সা) তার ওপর নিজের পবিত্র হাত রেখেছিলেন শুধু এই কারণেই এটা করতেন। তেমনিভাবে প্রিয় নবী (সা) তাঁকে যে দায়িত্ব আঞ্জামের জন্য নিয়োগ করেছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তা ধৈর্যের সঙ্গে পালন করে গেছেন। যে ব্যক্তিকে স্বয়ং আকায়ে দোজাহান, ফখরে মওজুদাত রহমতে আলম (সা) স্বয়ং মসজিদুল হারামের স্থায়ী মুয়াজ্জিন নিয়োগ করেছিলেন তার বুলন্দ মর্যাদা সম্পর্কে কে আন্দাজ করতে পারে।

হযরত হারিছ (রা) বিন হিশাম মাখযুমী

আবু আবদুর রহমান হারিছ বিন হিশাম [বিন মুগিরাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন মাখযুম] মাখযুমী ইসলামের মশহুর দুশমন আবু জেহেলের সহোদর ছিলেন। কিন্তু বহুরূপী যামানাকে দেখুন যে, এক ভাই (আবু জেহেল) দুনিয়া থেকে চরম অমর্যাদাকর অবস্থায় বিদায় নিয়েছিল। আবার দ্বিতীয় ভাইকে (হারিছ) আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র ইসলামের নিয়ামত দিয়েই পূর্ণ করেননি বরং শাহাদাতের মর্যাদায় সমাসীন করে সন্তুষ্টির বাগানের অর্থাৎ জান্নাতের হকদার বানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত হারিছ (রা) বিন হিশামকে ব্যাপক প্রতিভা ও প্রচন্ড সাহস দান করেছিলেন। তিনি উদারতা ও দানশীলতার দিক থেকে স্বগোত্রের হাতেম ছিলেন এবং শত শত গরীব ও মিসকিন তাঁর দস্তরখানে লালিত পালিত হতো। নিজের নজিরবিহীন উদারতা ও নরম অন্তর সত্ত্বেও তিনি মক্কা বিজয় পর্যন্ত কুফর ও শিরকের ভুল পথে ঘুরছিলেন। তাঁর দানশীলতা ও গরীব প্রিয়তা দেখে রহমতে আলম (সা) চাইতেন যে, এমন মানুষ যেন ঈমানের বৈভব থেকে মাহরুম না থাকেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল-ইসতিয়াব' গ্রন্থে লিখেছেন, একদিন রাসূলের (সা) দরবারে হযরত হারিছের (রা) প্রসঙ্গ এলো। তখন হুজুর (সা) বললেন, "হারিছ হলো সরদার। কেন হবে না। তার পিতাও সরদার ছিল। হায়! আল্লাহ যদি তার হেদায়াতের রাস্তা দেখাতেন।" আল্লাহর শান দেখুন যে, আল্লাহর মাহবুবের পবিত্র যবান দিয়ে বের হওয়া এই শব্দাবলী একদিন এমনভাবে পূর্ণ হলো যে, হযরত হারিছ (রা) বিন হিশাম চিরকালের জন্য ইসলামী মিল্লাতের গর্বের বস্তু হয়ে গেলেন।

বদরের যুদ্ধে হযরত হারিছও (রা) সহোদর আবু জেহেলের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন আবু জেহেল ও আরো অন্যান্য অনেক কুরাইশ সরদার জিল্লতীর সাথে মারা গেল তখন হারিছ (রা) পলায়নের পথ বেছে নেয়াটাই কল্যাণকর মনে করলেন। ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি ওহোদের যুদ্ধেও মুশরিকদের সাথে ছিলেন।

অষ্টম হিজরীতে মক্কা মুয়াজ্জামায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন হলো এবং রহমতে আলম (সা) নিজের জাননিছারদেরকে সঙ্গে নিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন। এ সময় হযরত হারিছ (রা) বিন হিশাম ও যোহায়ের বিন উমাইয়া

মাখযুমী (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী আবদুল্লাহ বিন আবি রবিয়া মাখযুমী) হুজুরের (সা) চাচাতো বোন হযরত উম্মে হানি (রা) বিনতে আবি তালিবের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু একথা জানতে পেরে তরবারী হাতে নিজের সহোদরার বাড়ী পৌছলেন এবং তাদের কতল করা ফরজ বলে দু'মাখযুমীকে কতল করতে চাইলেন। হযরত উম্মে হানি (রা) বললেন যে, তাঁরা তাঁর নিকট আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে কখনই হত্যা করতে দেবেন না। তারপর নিজের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর উম্মে হানি (রা) দুই মাখযুমীকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলের (সা) নিকট হাজির হলেন।

বিশ্বনবী (সা) হযরত উম্মে হানিকে (রা) দেখে বললেন, "মারহাবা ওয়া আহলান, হে উম্মেহানি! কি জন্য এলে?"

হযরত উম্মে হানি (রা) আরজ করলেন ঃ " হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই দু'জনকে আশ্রয় দিয়েছি। আর আলী (রা) তাঁদেরকে হত্যা করতে চায়।"

হুজুর (সা) বললেন, "যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ। তাকে আমিও আশ্রয় দিয়েছি।"

হযরত হারিছ (রা) এবং যোহায়ের (রা) (অথবা আবদুল্লাহ) হুজুরের (সা) রহমতের শান দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং তক্ষুণি সাচ্চা অন্তরে মুসলমান হয়ে গেলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত হারিছের (রা) জীবনে সেই অধ্যায় শুরু হয় যাতে তিনি ইসলামের একজন জানবাজ সিপাহী এবং মহানবীর (সা) অত্যন্ত মুখলিস জাননিছার হিসেবে পরিদৃষ্ট হয়েছিলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বলেন যে, হযরত হারিছ (রা) বিন হিশাম সেই মুয়াল্লিফাতুল কুলুব সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা সাচ্চা মুসলমান ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর তাঁদের মধ্যে এমন কোন বস্তু দেখা যায়নি যা ইসলামের সাত্যিকার চেতনার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন হযরত হারিছ (রা) তাতে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন এবং খুব দৃঢ়তার সাথে লড়াই করেন। প্রিয় নবী (সা) তাঁকে গনিমতের মাল থেকে একশ' উট দান করেন।

হুনাইনের যুদ্ধের পর তিনি মক্কা চলে যান। কিন্তু কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রায়ই রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হতেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার "ইসতিয়াবে' তাঁর কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে,

হারিছ (রা) নীরব প্রকৃতির এবং অল্প কথা বলার মানুষ ছিলেন। একবার তিনি রাসূলের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এমন কোন আমলের কথা বলুন, যা সবসময় করতে পারি।"

হুজুর (সা) যবানের দিকে ইশারা করে বলেছিলেন ঃ "তাকে কাবুতে রাখ।"

হযরত হারিছ (রা) প্রথম থেকেই স্বল্পভাষী ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, এটাতো খুব সহজ কাজ। কিন্তু তিনি বর্ণনা করেছেন যে, আমি যখন তার ওপর আমল করতে গেলাম তখন তা খুব কঠিন বলে মনে হলো।

একাদশ হিজরীতে প্রিয়নবী (সা) ওফাত পেলেন। তখন হযরত হারিছ (রা) মদীনাতেই উপস্থিত ছিলেন। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে খিলাফত প্রশ্নে মতবিরোধ হলে তিনি লোকদেরকে হুজুরের (সা) পবিত্র কথা "আল-আয়িম্মাতু মিনাল কুরাইশ" স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, হুজুর (সা) যদি একথা না বলতেন তাহলে আমরা আনসারকে কখনো খিলাফত থেকে সম্পর্কহীন করতামনা। (নিজেদের কুরবানী ও জীবন উৎসর্গের ভিত্তিতে) তারা তার যোগ্য। কিন্তু রাসূলের (সা) ফরমানে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরাইশের মধ্যে যদি এক ব্যক্তিও অবশিষ্ট থাকতেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত করাতেন।

হযরত সিদ্দিকে আকবারের (রা) খিলাফতকালে সিরিয়া যুদ্ধসমূহের শুরুতে খলিফাতুর রাসূল (সা) আরবের সকল নেতৃস্থানীয় সরদারকে জিহাদে শরীক হওয়ার দাওয়াত দিলেন। এই প্রসঙ্গে হযরত হারিছ (রা) বিন হিশামকেও একটি পত্র লিখলেন। তিনি এই পত্র পেয়ে সিদ্দিকে আকবারের (রা) আহবানে বীরত্বপূর্ণ সাড়া দিলেন এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর দৃঢ় সংকল্পে মক্কা থেকে রওয়ানা দিলেন। লোকেরা জানতে পেলো যে, হারিছ (রা) মক্কা থেকে চলে যাচ্ছেন। তখন তাদের মধ্যে হাহুতাশ শুরু হয়ে গেল। তিনি ছিলেন একজন কল্যাণকামী মানুষ এবং শত শত গরীব ও অভাবীকে সাহায্য করতেন। তারা কান্নাকাটি করে তাঁকে বিদায় করতে লাগলো। হযরত হারিছ (রা) যখন বাতহার উঁচু অংশে পৌছলেন তখন কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। সে সময় অসংখ্য মানুষ তাঁর চার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো। হযরত হারিছ (রা) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মানুষেরা! আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাচ্ছি না এবং কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যেও তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি না। এক শহর ছেড়ে অন্য শহরে চলে যাচ্ছি তাও নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা দ্বীনের

ব্যাপার। আল্লাহর পথে জিহাদ এক মর্যাদার বস্তু যা এর পূর্বে এমন বহু লোক হাসিল করেছেন যাঁরা হসব-নসবের দিক থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। তাদের বিত্ত বৈভবও তেমন ছিল না। এখন যদি আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে সেই মর্যাদালাভের সুযোগ দান করেন তাহলে কোন অবস্থাতেই তা হারানো উচিত হয়। আল্লাহর কসম, যদি মক্কার সকল পাহাড় সোনার হয়ে যায় এবং আমি সেই সকল সোনা আল্লাহর পথে লুটিয়ে দিই তাহলে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর এক দিনের সমানও সওয়াব পাবো না। দুনিয়ায় যদি আমরা সেই সবলোকের সমান ফজিলত নাও পাই তাহলে কমপক্ষে আখিরাতে তো তাঁদের সঙ্গে শরীক হবো। আল্লাহর খাতিরে আমি মক্কা ত্যাগ এবং হক পথে যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়া গমন করছি।"

সিরিয়ায় মুসলমানদের সঙ্গে রোমকদের অনেক রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তার মধ্যে কতিপয় যুদ্ধে হযরত হারিছ (রা) বীর বিক্রমে অংশ নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকরা এসব যুদ্ধের মধ্যে ফাহাল ও আজনাদাইনের যুদ্ধের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তারপর ইয়ারমুকের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হিরাক্লিয়াস তাওহীদের কয়েক হাজার সেনানীর মুকাবিলায় লাখ লাখ রোমক যোদ্ধাকে এনে দাঁড় করিয়েছিলো। কিন্তু মুসলমানরাতো জীবন আল্লাহর রাস্তায় বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তারা কোন ক্রমেই ভীত হলেন না। আল্লাহর ওপর ভরসা করে কুফরের ভীতিকর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ন হলেন। মুসলমান জীবন উৎসর্গকারীদের মধ্যে হযরত হারিছ (রা) বিন হিশামও শামিল ছিলেন। যুদ্ধের আগুন যখন লেলিহান শিখায় চারদিকে পরিব্যাপ্ত তখন হযরত হারিছ (রা) গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। অন্য মুজাহিদরা রোমকদেরকে পেছনে হটিয়ে দিল। এদিকে হযরত হারিছ (রা) জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে উপস্থিত হলেন। সে সময় তাঁর প্রচন্ড পিপাসা অনুভূত হলো এবং মুখ দিয়ে "পানি" শব্দ বের হলো। একজন মুজাহিদ দৌড়ে পানি আনলেন। পানির পাত্র কেবল মুখে লাগিয়েছিলেন এমন সময় আরেকজন আহত মুজাহিদের মুখ দিয়ে "পানি" শব্দ উচ্চারিত হলো। হযরত হারিছ (রা) পেয়ালা মুখ থেকে সরিয়ে নিলেন এবং সেই ভাইয়ের নিকট পানি নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। যখন পানি তাঁর নিকট পৌছলো তখন তাঁর নিকট অন্য আরেকজন আহত মুজাহিদ মূমুর্ষ অবস্থায় পানি চাইছিলেন। দ্বিতীয় মুজাহিদও পানি পান না করে নিজের পাশের আহত মুজাহিদের প্রতি ইশারা করলেন। তাঁর নিকট পানি পৌছলো। ইতিমধ্যে তাঁর প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেছে। দ্বিতীয় আহত ও হযরত হারিছের (রা) নিকট পুনরায় পানি আনা হলো। তাঁরাও ইতিমধ্যে পরপারের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং নিজের ত্যাগ ও

ভ্রাতৃত্বের আবেগে নিজেদেরকে হাওজে কাওছারের পানির মুসতাহিক বানিয়ে নিয়েছিলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) হযরত হারিছ (রা) বিন হিশামকে উত্তম ও জ্ঞানী সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত করেছেন। তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতিমা (রা) বিনতে ওয়ালিদ [হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ সাইফুল্লাহর সহোদরা] এবং কন্যা উম্মে হাকিম (রা) জালিলুল কদর সাহাবীয়াদের মধ্যে গণ্য হতেন। আবদুর রহমান নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনিও ইলম ও ফজলের দিক থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হযরত হারিছের (রা) বংশধারা তাঁর মাধ্যমেই অব্যাহত ছিল এবং আল্লাহ তাতে অত্যন্ত বরকত দেন।

হযরত হারিছ (রা) বিন হিশাম যদিও শেষ পর্যায়ের সাহাবী। কিন্তু তিনি নিজের সুন্দর আমল দিয়ে অতীত জীবনের ক্ষতি পূরণ করেছিলেন।

হযরত নাওফাল (রা) বিন হারিছ হাশেমী

বদরের যুদ্ধে কাফেররা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হকপন্থীদের ওপর হামলা করে বসলো, কিন্তু আল্লাহ পাক তাদেরকে পরাজিত ও হকপন্থীদেরকে বিজয়ী করলেন। মুশরিকদের ৭০ জন যুদ্ধের ময়দানে লাশ হয়ে পড়ে রলো এবং প্রায় সমান সংখ্যককে মুসলমানরা আটক করলো। এসব কয়েদীকে যখন প্রিয়নবীর (সা) সামনে পেশ করা হলো তখন হুজুর (সা) দেখলেন যে, একজন কয়েদীর চেহারায় শরাফতের চিহ্ন বিদ্যমান। তবে, সে মাথা অবনত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন খুব লজ্জিত এবং তাঁর দৃষ্টি থেকে বাঁচতে চায়। হুজুর (সা) তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"ভাই, তুমি ফিদিয়া দিয়ে মুক্ত হয়ে যাও না কেন ?"

কায়েদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো ঃ "আমার কাছে কি আছে যে তা দিয়ে আমি ফিদিয়া আদায় করতে পারি ?"

হুজুর (সা) বললেন, "জিদ্দা ওয়ালা বর্শা ফিদিয়া হিসেবে দিতে পারো না ?"

নবীর (সা) মুখে এই বাক্য শুনে কয়েদী মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম হলো। তার স্বপ্ন ও চিন্তায় এটা কখনো আসেনি যে সেই বশার্র কথা সে ছাড়া আর কেউ জানতে পারে। তার অন্তর নির্দ্বিধায় স্বাক্ষ দিল যে, মুহাম্মাদ (সা) সাচ্চা রাসূল। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁকে গায়েবী খবর দিয়ে থাকেন। কয়েদী তৎক্ষণাৎ আল্লাহর একত্ববাদ এবং হুজুরের (সা) রিসালাতের ইকরার করলেন। বর্শা চেয়ে এনে ফিদিয়া হিসেবে দিয়ে দিলেন এবং দ্বীনের প্রতি তার ইখলাসের কথা কবিতার আকারে পেশ করলেন।

এই ব্যক্তি যাঁর জীবনে রাসূলের (সা) মুখ নিসৃত কয়েকটি বাক্য বিপ্লব এনে দিয়েছিল এবং যাঁর ঈমানী আবেগ মহানবীর (সা) প্রিয় বানিয়ে দিয়েছিল—তিনি ছিলেন হযরত নাওফাল (রা) বিন হারিছ হাশেমী। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

নাওফাল (রা) বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই।

মাতার নাম ছিল গুযাইয়া বিনতে কায়েস এবং তিনি বনু ফাহরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

হযরত নাওফাল (রা) যদিও রাসূলের (সা) মক্কী যুগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। তবে তাঁর অন্তর সবসময় মহানবীর (সা) ভালোবাসায় পূর্ণ ছিলো। তিনি কখনো হুজুরের (সা) বিরোধিতা করেননি এবং কখনো তাঁকে নির্যাতনও করেননি। ইত্যবসরে প্রিয় নবী (সা) হিজরত করে মদীনা তাঁশরীফ নিয়ে যান। বদরের যুদ্ধে কাফির বাহিনীতে শামিল হওয়ার ব্যাপারটি তার নিকট খুবই অপসন্দনীয় ছিল। কিন্তু মুশরিকরা এমনভাবে বাধ্য করেছিলে যে, তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের সাথে গিয়েছিলেন, সেসময়ও তার মুখে একটি কবিতা উচ্চারিত হয়েছিল। সেই কবিতার অর্থ হলো ঃ

"আমার জন্য মুহাম্মাদের (সা) সাথে যুদ্ধকরা হারাম
কেননা, মুহাম্মাদ আমার নিকটবর্তী প্রিয়জন।"

বদরের যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের হাতে আটক হয়ে গেলেন [তাঁকে হযরত উবায়েদ (রা) বিন আওসুজ জাফরী আটক করেন] এবং এই কয়েদীত্ব তাঁর ঈমান আনয়নের একমাত্র কারণ হয়ে গেল। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত নাওফাল (রা) হামেশীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশী বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। ঈমানের নিয়ামতে পূর্ণ হওয়ার পর হযরত নাওফাল (রা) মক্কা মুয়াজ্জামা প্রত্যাবর্তন করলেন। মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে নিজের ছোট ভাই রবিয়া (রা) বিন হারিছার সাথে হিজরতের ইরাদায় মদীনা রওয়ানা হন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবওয়া পৌছে হযরত রবিয়া (রা) মক্কা ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হযরত নাওফালের (রা) ঈমানী মর্যাদাবোধ এটা কোনক্রমেই মেনে নিল না এবং তিনি ভাইকে বললেন, তুমি কুফর ও শিরকের সেই কেন্দ্রে ফিরে যেতে চাও যেখানকার বাসিন্দারা আল্লাহর সাচ্চা রাসূলকে (সা) মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে এবং তাঁর ওপর তরবারী উঠিয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা নিজের রাসূলের (সা) ওপর নিয়ামত বর্ষণ করেছেন এবং তাঁর ওপর ঈমান আনয়নকারীর সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার সাথে চলো। সেটাই ভালো হবে। মোটকথা, দুই ভাই হিজরত করে মদীনা পৌছে গেলেন। প্রিয়নবী (সা) এই দুই সহোদরের মদীনা গমনে খুব খুশী হলেন এবং তিনি তাদেরকে নিজের অভিভাবকত্বে নিয়ে নিলেন।

ইবনে আছির (রা) "উসুদুল গাব্বাহ"তে লিখেছেন, রাসূলের (সা) চাচা হযরত আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিব হযরত নাওফালেরও চাচা ছিলেন। তিনি বয়সে ভাতিজার [হযরত নাওফাল (রা)] চেয়ে কয়েক বছর ছোট ছিলেন। তবুও চাচা ও ভাতিজার মাধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। প্রিয়নবী (সা) তাঁদের দু'জনের সম্পর্কের কথা জানতেন। বস্তুত হযরত আব্বাস (রা) যখন হিজরত করে মদীনা এলেন তখন হুজুর (সা) হযরত নাওফাল (রা) ও হযরত

আব্বাসের (রা) মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কায়েম এবং থাকার জন্য দু'টি বাড়ী প্রদান করলেন। দু' বাড়ীর একটি ছিল ছানিয়াতুল বিদার সড়কের বাজারে। অপরটি মসজিদে নববী সংলগ্ন রাহবাতুল কাজাতে।

ইমাম হাকিম "মুসতাদরাকে" বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নাওফালের (রা) আর্থিক অবস্থা দুর্বল ছিল। এজন্য মহানবী (সা) সবসময় তাঁর খোঁজ খবর নিতেন। তাঁর নিকাহ করার ইচ্ছা হলে হুজুর (সা) এক মহিলার সঙ্গে শাদী করিয়ে দিলেন। একবার অর্থনৈতিক অবস্থা এতো খারাব হয়ে গেল যে, ঘরে খানা-পিনার কোন বস্তু ছিল না। হুজুর (সা) খবর পেয়ে হযরত আবু রা'ফে (রা) ও হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) মাধ্যমে নিজের যিরাহ এক ইহুদীর নিকট রেহেন রাখলেন এবং তার বিনিময়ে ৩০ সা' যব নিয়ে হযরত নাওফালকে (রা) প্রদান করলেন।

হিজরতের পর হযরত নাওফাল (রা) মক্কা বিজয়ের সময় প্রিয়নবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তারপর হুনাইনের যুদ্ধে বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সেইসব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা বনু হাওয়াযিনের প্রচন্ড তীর নিক্ষেপের সময়ও যুদ্ধের ময়দানে অটল ছিলেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত নাওফালের (রা) নিকট তিন হাজার বর্শা মওজুদ ছিল। তিনি হুনাইনের যুদ্ধের সময় এই সকল বর্শা মহানবীর (সা) খিদমতে পেশ করেছিলেন। হুজুর (সা) তাঁর এই কুরবানী ও ত্যাগে খুব খুশী হলেন এবং এই বর্শা মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। তারপর হযরত নাওফালকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "আমি দেখছি যে, তোমার বর্শা মুশরিকদের কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছে।"

মহানবীর (সা) ইন্তেকালের সময় হযরত নাওফাল (রা) খুব বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য হযরত আবু বকরের (সা) শাসনামলে কোন অভিযানে অংশ নিতে পারেননি। তিনি হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতের দ্বিতীয় বছরে পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন। আমীরুল মু'মিনীন (রা) স্বয়ং জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন এবং জান্নাতুলবাকীতে দাফন করেন।

মৃত্যুকালে হযরত নাওফাল (রা) পাঁচ পুত্র রেখে যান। তাঁরা হলেন ঃ আবদুল্লাহ, রবিয়া, মুগিরাহ, আবদুর রহমান ও সাঈদ। আল্লাহ তাঁর বংশের অত্যন্ত বরকত দিয়েছিলেন এবং তা মদীনা মুনাওয়ারা, বসরা ও বাগদাদে বিস্তার লাভ ঘটে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আরকাম যুহরী

মক্কা বিজয়ের পরের কথা। একবার রহমতে আলম (সা) একটি পত্র পেলেন। পত্রটির বিষয়বস্তু এমন ছিল যে, তার জবাব লিখার জন্য তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন ছিল। রাসূলের (সা) নিকট কয়েকজন সাহাবী (রা) উপস্থিত ছিলেন। হুজুর (সা) তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "এই পত্রের জবাব কে লিখবে?" সাহাবায়ে কিরাম (রা) পরস্পরের প্রতি তাকালেন এবং তারপর তাঁদের মধ্যে থেকে একজন দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! এই দায়িত্ব আমাকে সোপর্দ করুন। আমি তার যথার্থ জবাব লিখার চেষ্টা করবো।"

ইরশাদ হলো ঃ ঠিক আছে, তুমিই তার জবাব লিখ।

সেই ব্যক্তি জবাব লিখে হুজুরের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। হুজুরের (সা) তা খুব পসন্দ হলো। হযরত ওমর ফারুকও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও সেই জবাবের লিখন পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর প্রশংসা করলেন। লিখন পঠন এবং পত্রাদি লিখার আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী এই সাহাবী ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আরকাম।

নবীর (সা) দরবারে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আরকামের বিশেষ মর্যাদা ছিল এবং প্রিয়নবী (সা) তাঁর ওপর খুব আস্থাশীল ছিলেন। কুরাইশের যুহরাহ খান্দানের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

আবদুল্লাহ (রা) বিন আরকাম বিন আবদি ইয়াগুছ বিন আবদি মান্নাফ বিন যুহরাহ বিন কিলাব বিন মুররাহ।

হযরত আবদুল্লাহর (রা) পিতা আরকাম হুজুরের (সা) মামাতো ভাই ছিলেন। এ আত্মীয়তা সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ (রা) মহানবীর (সা) ভাতিজা হতেন। তিনি খুব মেধাবী ছিলেন। কিন্তু কিছু কারণে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি। তারপর তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নবীর (সা) খিদমতের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। এবং মদীনাতেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। লিখন পঠনে যোগ্যতা ও অন্যান্য সুন্দর গুণের বদৌলতে তিনি খুব শীঘ্র নবীর (সা) নৈকট্য লাভ করেন। মহানবীর (সা) যখন কোন সুলতান বা আমীরকে পত্র লিখার প্রয়োজন হতো তখন তিনি তা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আরকামকে দিয়েই লিখাতেন।

একাদশ হিজরীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। এ সময় তিনিও হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আরকামকে পত্র লিখনের দায়িত্বে বহাল রাখলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকাল এলো। তখন তিনি হযরত আবদুল্লাহকে (রা) পত্র লিখনের দায়িত্ব ছাড়াও বাইতুলমালের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। উপরন্তু তাঁকে নিজের মজলিশে শুরাতেও অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আল্লামা ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ"তে লিখেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে খুব সম্মান করতেন। একবার তাঁকে সম্বোধন করে নিজের সন্তুষ্টির প্রকাশ এই ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন যে, আবদুল্লাহ তুমি যদি ইসলামে অগ্রগমনের মর্যাদা লাভ করতে তাহলে আমি কাউকে তোমার ওপর অগ্রাধিকার দিতাম না।

হযরত ওসমান জুন্নারাইন (রা) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) পূর্বেকার মত পত্র লিখন ও বাইতুলমালের খাজাঞ্চীর দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকলেন। কিন্তু কিছু দিন পর সেসব পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা তাঁর ইস্তফাদানের কারণ বর্ণনা করেননি। কিন্তু কার্যকারণে মনে হয় যে, বার্দ্ধক্যের কারণে অথবা দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ার জন্যই তিনি ইস্তফা দিয়েছিলেন। হযরত ওসমান (রা) তাঁর ইস্তফা মঞ্জুর করে নেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন মত অনুযায়ী ত্রিশ হাজার অথবা তিন লাখ দিরহাম তাঁর খিদমতের বিনিময়ে পেশ করেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহর (রা) মুখাপেক্ষীহীনতার অবস্থাটা দেখার মত। তিনি এই বিরাট অংক গ্রহণে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, আমি এই খিদমত শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে আঞ্জাম দিয়েছি এবং আল্লাহর নিকটই তার প্রতিদান চাই।

শেষ বয়সে হযরত আবদুল্লাহ (রা) দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থাতেই পরপারের ডাক এসে উপস্থিত হয় এবং ৩৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত উরওয়া (র) ও আসলাম আদবী (র) তাঁর থেকে কয়েকটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু মিহজান ছাকাফী (রা)

শস্য শ্যামলিমা, পানির প্রাচুর্য এবং সুন্দর আবহাওয়ার জন্য তায়েফকে হিজাজের জান্নাত বলা হয়। রহমতে আলমের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় এই শহর আরবের নামকরা গোত্র বনু ছাকিফের আবাসস্থল ছিল। তারা সবুজ পাহাড়ের পাদদেশে দৃষ্টি গোচরভুক্ত বিস্তৃত আঙ্গুরের বাগানসমূহের মালিক ছিল। তারা ছিল খুব সচ্ছল ও রঙ্গীন মেযাজের মানুষ। সেই সাথে তারা ছিল বাহাদুর এবং যোদ্ধা।

নবুওয়াতের দশম বছরের পর প্রিয়নবী (সা) তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত প্রদানের জন্য তায়েফ তাশরীফ নিলেন। এ সময় তারা ঔদ্ধত্যের নেশায় শুধুমাত্র হকের দাওয়াতকে প্রত্যাখানই করলো না বরং মানবতার কল্যাণকামী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সঙ্গে অত্যন্ত অশোভন আচরণ করলো। এই ঘটনার ১২ বছর পর নবম হিজরীতে বিশ্ববাসী এক বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলো। তারা দেখলো যে, অবাধ্য ও বিদ্রোহী বনু ছাকিফই স্বয়ং নবীর (সা) দরবারে হাজির হচ্ছেন এবং ইসলামের জানবাজ সিপাহী হয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বনবীর (সা) ইন্তেকালের পর ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা যখন প্রায় সমগ্র আরবকে গ্রাস করে ফেলেছে তখন মক্কার কুরাইশ ও মদীনার আনসাররা ছাড়া তায়েফের এই বনু ছাকিফই সম্পূর্ণরূপে পাথরের মত ইসলামের ওপর অটল ছিল। তারপর ইরান ও সিরিয়ার সাথে যখন সংঘর্ষ শুরু হলো তখন বনু ছাকিফের জওয়ানরাই জিহাদের ময়দানে নিজেদের ত্যাগের এমন কাহিনী সৃষ্টি করলেন যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের রক্ত উত্তপ্ত করবে।

বনু ছাকিফের যেসব যুবক ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছেন তাদের মধ্যে এক মুজাহিদ হলেন আবু মিহজান ছাকাফী (রা) তাঁর প্রকৃত নাম বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পাওয়া গেছে। কেউ বলেছেন তাঁর নাম হলো আমর। আবার কেউ বলেছেন আবদুল্লাহ। অনেকে বলেছেন তাঁর নাম ছিল মালিক। কিন্তু আবু মাহজান কুনিয়তের ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন। এই কুনিয়ত এত মশহুর হয় যে, লোকজন তাঁর আসল নাম ভুলেই যায়। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আবু মিহজান (রা) বিন হাবিব বিন আমর বিন উমায়ের বিন আওফ বিন উকদা বিন গাইরাই বিন আওফ ছাকাফী।

ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় হযরত আবু মিহজান (রা) বনু ছাকিফের নামকরা বীরদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি শুধুমাত্র একজন বাহাদুর,

যোদ্ধা এবং দানশীল ব্যক্তিই ছিলেন না বরং একজন উচ্চাঙ্গের কবিও ছিলেন এবং তার বীরত্ব ও কবিত্বের খ্যাতি আরবের দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি তরবারী চালনা, বর্শা ও তীর নিক্ষেপ এবং অশ্ব চালনায় নজির বিহীন ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি শত্রুর ওপর যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তার তুলনা হয় না। তাঁর অশ্ব চালনা ও হামলার ধরন দেখে লোকেরা হাজার হাজার মানুষের ভীড়ের মধ্যেও চিনে নিতেন যে, তিনি আবু মিহজান (রা)। বনু ছাকিফের এই বীর পুরুষ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নিজের গোত্রের সাথে মিলে ইসলামের বিরোধিতায় অগ্রগামী ছিলেন। হুনাইনের যুদ্ধের পর প্রিয়নবী (সা) তায়েফ অবরোধ করলেন। এ সময় আবু মিহজান (রা) অন্যান্য তায়েফবাসীর মত শহর রক্ষার কাজে জোরেশোরে অংশ নিলেন এবং অবরোধকালে যখন মুসলমান জানবাজরা শহরে হামলা করে বসলেন তখন তিনি তাঁদের ওপর তীর ও পাথরের মেঘ বর্ষণ করলেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা) অবরোধের সময় একদিন আবু মিহজানের তীরেই আহত হলেন এবং তীরের এই আঘাত পরে তাঁর জীবন হরণকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল।

নবম হিজরীতে নিজের কবিলার সঙ্গে হযরত আবু মিহজানও (রা) ইসলাম গ্রহণের সম্মানে ভূষিত হন। বস্তুত তিনি অনেক শেষে ঈমান এনেছিলেন। এ জন্য রাসূলের (সা) যুগে কোন যুদ্ধে অংশ নেয়ার সুযোগ তাঁর হয়নি। আল্লাহর পথে জিহাদের প্রসঙ্গে তাঁর নাম সর্বপ্রথম জনসমক্ষে আসে হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে। আবু হানিফা দিনাওয়ারী "আখবারুত তাওয়ালে" লিখেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের খিলাফতের শুরুতে হযরত আবু ওবায়েদ ছাকাফীর (র) নেতৃত্বে যে বাহিনী ইরাকে প্রেরণ করেছিলেন তাতে হযরত আবু মিহজানও (রা) শামিল ছিলেন এবং জাসারের যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর একটি কলামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধে তাঁর ভাই কায়েস (রা) বিন হাবিবও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কায়েস (রা) সেই যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। অবশ্য আবু মিহজান বেঁচে গিয়েছিলেন। কিয়াস করা হয় যে, পরে তিনি বুয়েবের যুদ্ধে অংশ নেন এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। এটা ছিল জাসারের যুদ্ধের জবাব।

তারপর তাঁর নাম পুনরায় নেপথ্যে চলে যায়। এই অবস্থায় শুরু হয় সেই রক্তাক্ত যুদ্ধ যা ইরানের বেশীর ভাগ ভাগ্যের ফায়সালা করে দেয়। সেই যুদ্ধের নাম হলো কাদেসিয়ার যুদ্ধ। হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ইরানের বিরুদ্ধে এই লড়াই সংঘটিত হয়েছিল।

চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন যে, যে যুগে হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস কাদেসিয়ার দিকে অগ্রাভিযান করছিলেন তখন হযরত আবু মিহজার ছাকাফী (রা) আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুকের (রা) নির্দেশে হাজুজা দ্বীপে নজরবন্দী ছিলেন। তাঁকে কোন অপরাধে দেশ থেকে বহিষ্কার ও বন্দীত্বের শাস্তি দেয়া হয়েছিল? এ ব্যাপারে সাধারণ বর্ণনা এটাই যে, তিনি বার বার মদ পানের অপরাধ করেছিলেন। ঐতিহাসিকরা ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণনা করেছেন যে, তায়েফবাসী আঙ্গুরের আধিক্যের কারণে মদের প্রতি খুব আসক্ত ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সেই খারাব অভ্যাস ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তবুও, কখনো কখনো কোন ছাকাফী পুরাতন অভ্যাসে জড়িত হয়ে পড়তো। তার এই তৎপরতা প্রকাশ পেলে তার ওপর হদ জারী হয়ে যেত। অর্থাৎ তাকে বেত্র দন্ড দেয়া হতো। হাফেজ ইবনে হাজার (র) হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) ইমাম বাইহাকী (র) এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় চরিতকারের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবু মিহজানও (রা) তেমনি ধরনের মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মদ পানের অভিযোগে তাঁর ওপর কয়েকবার হদ জারী হয়ে ছিল। অবশেষে হযরত ওমর (রা) নিরুপায় হয়ে তাঁকে হাজুজা দ্বীপে অন্তরীন করে রাখেন। হযরত আবু মিহজান (রা) হাজুজাতে থাকা অবস্থায় হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের সামরিক অভিযানের অবস্থা শুনে হক পথে লড়াই করার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন এবং কোনভাবে পাহারাদারদের দৃষ্টি এড়িয়ে সোজা ইসলামী বাহিনীতে গিয়ে শামিল হলেন। দেশের অভ্যন্তরে যত ঘটনা ঘটতো তা হযরত ওমর ফারুক (রা) তাড়াতাড়ি পেয়ে যেতেন। তিনি হযরত আবু মিহজানের (রা) পলায়ন ও ইসলামী বাহিনীতে শামিল হওয়ার খবর জানতে পেরে হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসকে আবু মিহজানকে (রা) গ্রেফতার করে কয়েদখানায় নিক্ষেপের কথা লিখে পাঠালেন। সেসময় হযরত সায়াদ (রা) কাদেসিয়া পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি আমীরুল মু'মিনীনের (রা) হুকুম তামিলের জন্য হযরত আবু মিহজানকে (রা) গ্রেফতার করেন এবং তাঁর পায়ে বেড়ি দিয়ে নিজের আবাসস্থলের সংলগ্ন একটি পুরাতন মহলের কামরায় আটকে রাখলেন।

কাদেসিয়ার রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু হলো। ইসলামের মুজাহিদদের নারায়ে তাকবির, তরবারীর ঝংকার, ঘোড়ার হ্রেষারব এবং জীবন উৎসর্গকারীদের বীরত্ব গাথা হযরত আবু মিহজানের (রা) কানে এসে বাজতে লাগলো। তখন বীরত্বের আবেগ তাঁকে উত্তেজিত করে তুললো। তিনি উড়ে গিয়ে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছতে চাইলেন। কিন্তু অসহায় ছিলেন। পায়ের বেড়ি এবং কয়েদখানার মজবুত প্রাচীর তার রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল। এক রেওয়ায়াতে

আছে যে, তিনি হেছড়িয়ে হেছড়িয়ে কয়েদখানার খিড়কির নিকট গেলেন এবং হযরত সায়াদের (রা) নিকট তাঁকে যুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুমতি দানের দরখাস্ত করলেন। কিন্তু তিনি হযরত আবু মিহজানের (রা) আবেদন মঞ্জুর করলেন না। তিনি নিরাশায় হাহুতাশ করে ফিরে এসে নিজের স্থানে বসে পড়লেন যুদ্ধের প্রথম দিনতো কোনভাবে অতিক্রান্ত হলো। দ্বিতীয় দিন লড়াই শুরু হলো এবং শত্রু পক্ষ মুসলমানদের ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করলো। তখন কয়েদখানার বাতায়ন পথে এই দৃশ্য দেখে হযরত আবু মিহজানের (রা) ধৈর্য-শক্তি সম্পূর্ণরূপে জবাব দিয়ে বসলো। কোনভাবে আওয়াজ দিয়ে হযরত সায়াদের (রা) স্ত্রী সালমা বিনতে হেফসকে খিড়কীর নিকট ডেকে আনলেন এবং অত্যন্ত সুমিষ্ট স্বরে তার নিকট আবেদন করলেন যে, আমার বেড়ি খুলে দাও এবং হাতিয়ার সমেত একটি ঘোড়া আমাকে দিয়ে দাও। তারপর দেখো, আমি আল্লাহর দুশমনদের মুকাবিলায় কি করি। যদি জীবিত থাকি তাহলে আল্লাহর কসম, ফিরে এসে নিজেই বেড়ি পরে নিব। সালমা হযরত সায়াদের (রা) ভয়ে হযরত আবু মিহজানের (রা) কথা শুনতে অস্বীকৃতি জনালেন। তাতে তিনি নিরাশ হয়ে নিজের কুঠরীর দিকে চললেন এবং অত্যান্ত দুঃখের সাথে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। সাথে সাথে বীরত্বের আবেগে নিজের ঠোঁট দাঁতে চাপছিলেন এবং রানের ওপর হাত মারছিলেন।

হযরত মিহজানের (রা) কবিতা শুনে সালমার (রা) অন্তর খুব কোমল হয়ে গেল। তিনি এটা সহ্য করতে পারছিলেন না যে, বনু ছাকিফের এই বীর কয়েদখানায় বেদনার্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে। তিনি তৎক্ষণাৎ বাঁদীকে সঙ্গে নিয়ে জেলখানায় গেলেন এবং হযরত আবু মিহজানের (রা) বেড়ি খুলে দিলেন। তারপর তিনি তাঁকে জেলখানা থেকে আস্তাবলে আনলেন এবং একটি উচ্চ বংশের আরবী ঘোড়া ও হাতিয়ার তাঁর নিকট সোপর্দ করে বললেন ঃ

"আল্লাহর হাওয়ালা, যাও। আমার বিশ্বাস আছে যে, তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি যে কোন অবস্থায় পূরণ করবে।"

হযরত আবু মিহজান (রা) যেন সমগ্র বিশ্বের সম্পদ হাতে পেয়ে গেলেন। মুখ ও মাথার ওপর কাপড় জড়িয়ে নিলেন। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে জুতার কাঁটা মেরে তাকে উত্তেজিত করলেন এবং বর্শা হাতে নিয়ে এমন শানে ইরানীদের ওপর হামলা করলেন যেন আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যেদিকে যাচ্ছিলেন সেদিকেই ইরানীদের ব্যূহ তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। মুসলমানদের সেই দল যারা ইরানীদের প্রচণ্ড চাপের সামনে পিছিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের জন্য যুদ্ধের ময়দানে এই বীরের আগমন অদৃশ্য সাহায্য থেকে কম ছিল না। আবু মিহজান

(রা) কখনো ইরানীদের বামে ঢুকে পড়ছিলেন। আবার কখনো ডাইনে ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করছিলেন। এভাবে তিনি মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের গতিই পরিবর্তন করে ফেললেন এবং মুসলমানরা নিজেদের মুকাবিলায় ইরানী সৈন্যদেরকে গাজর কাটার মত কেটে যাচ্ছিলেন। হযরত সায়াদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস সাইটিকা বা অন্য কোন রোগের কারণে নিজে যুদ্ধের ময়দানে যেতে অক্ষম ছিলেন এবং নিকটের একটি পুরাতন ভবনে বসে যুদ্ধের পূর্ণ চিত্র দেখছিলেন। এমন সময় তিনি আবু মিহজানকে (রা) দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ছিলেন এবং মনে মনে বলছিলেন যে, আবু মিহজান (রা) আটক না থাকতো তাহলে আমি এইটাই মনে করতাম যে, এই মুজাহিদ আবু মিহজানই হবেন। কারণ, এভাবে যুদ্ধ সেই করতে পারে। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য কোন ফেরেশতাকে আসমান থেকে নাযিল করেছেন।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, সালমা হযরত আবু মিহজানকে (রা) হযরত সায়াদের (রা) ব্যক্তিগত বিশেষ ঘোড়া "বালকা"কে প্রদান করেছিলেন এবং তাতে চড়েই তিনি যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু সেই সাথে যখন আমরা অধিকাংশ অন্য রেওয়ায়াতে এটা পড়ি যে, হযরত সায়াদ (রা) শেষ পর্যন্ত না আবু মিহজানকে (রা) চিনতে পেরেছিলেন এবং না ঘোড়াকে চিনতে পেরেছিলেন। তখন ধারণা হয় যে, বালকা ছাড়া ঘোড়াটি অন্য ঘোড়া ছিল। যদি এটা বালকাও হয় তাহলে যুদ্ধের ময়দানের ধূলা-বালির কারণে হযরত সায়াদ (রা) তাকে চিনতে পারেননি।

হাফেজ ইবনে হাজার (রা) ইসাবাতে লিখেছেন যে, আবু মিহজান (রা) সেদিন প্রচন্ড যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি তাকবির দিচ্ছিলেন আর কাফেরদেরকে পটকে পটকে ফেলছিলেন। লোকজন তাকে দেখে বিস্মিত হচ্ছিলেন এবং কেউ তাঁকে চিনতে পারছিলো না। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) এই রেওয়ায়াতে এটুকু বাড়িয়েছেন যে, লোকেরা তাঁকে একজন ফেরেশতা বলে ধারণা করেছিলো।

সন্ধ্যায় যুদ্ধ শেষ হলো। এ সময় হযরত আবু মিহজান (রা) নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফিরে এলেন। ঘোড়া আস্তাবলে বাঁধলেন এবং কয়েদখানায় গিয়ে নিজের পায়ে নিজেই বেড়ি লাগালেন। এদিকে হযরত সায়াদ (রা) বালাখানা থেকে নীচে নামলেন। তখন সালমা তাঁকে যুদ্ধের ময়দানের খবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত সায়াদ (রা) বললেন ঃ

"আমরা দুশমনের সাথে লড়াই করছিলোম। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা একটি আবলাক ঘোড়ার ওপর সওয়ার কোন মানুষকে প্রেরণ করেন। (সেই

ব্যক্তি দুশমনের সমুচিত শিক্ষা দিল) আমি যদি আবু মিহজানকে কয়েদ করে না রাখতাম তাহলে আমার ধারণা যে, সেই ব্যক্তি আবু মিহজানের অনুরূপ।"

সালমা (রা) বললেন ঃ "হে আমীর! ইনিতো আবু মিহজানই (রা) ছিলেন।"

হযরত সায়াদ (রা) বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তা কি করে হতে পারে?"

সালমা (রা) তাঁকে সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। হযরত সায়াদ (রা) খুব প্রভাবিত হলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন ঃ "আল্লাহর কসম মুসলমানদের জন্য যে ব্যক্তি এত নিবেদিত তাঁকে আমি কয়েদখানায় রাখতে পারি না।"

একথা বলেই তিনি তৎক্ষণাৎ আবু মিহজানকে (রা) মুক্ত করে দিলেন। আবু মিহজানও (রা) মরদে মু'মিন ছিলেন। মুক্ত হয়ে তিনি হযরত সায়াদকে (রা) বললেন ঃ

"হে আমীর! হদের (দন্ড) ভীতি আমাকে মদ পান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। কিন্তু আমি আজ আল্লাহর ভয়ে শপথ করছি যে, ভবিষ্যতে কখনো মদ স্পর্শ করবো না।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত সায়াদের (রা) গোলামের মা যাবরা হযরত আবু মিহজানকে (রা) কয়েদ থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং ঘোড়াও তিনিই দিয়েছিলেন। আল্লামা বালাজুরী (র) এই বর্ণনাকে সমর্থন করেছেন। হাফেজ ইবনে কাছিরও (রা) সালমার কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু ইবনে জারির তাবারী এবং অন্য অনেক নেতৃস্থানীয় চরিতকার সালমার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেতো আরো বাড়িয়ে বলেছেন, সালমা (রা) হযরত আবু মিহজানকে (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আমীর (সায়াদ) তোমাকে কেন কয়েদ করে রেখেছেন?

তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন ঃ

"আমাকে কোন হারাম বস্তু ব্যবহার করার কারণে কয়েদ করা হয়নি। আমি জাহেলী যুগে মদ পান করতাম এবং যেহেতু কবিও। এ জন্য অবিশ্বাসী সূরের কবিতা কোন কোন সময় মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"

সালমা (রা) ইয়াওমুল আগওয়াছে [কাদেসিয়ার যুদ্ধের সেই দিন যেদিন হযরত আবু মিহজান (রা) জেলখানা থেকে মুক্ত হয়ে অংশ নিয়েছিলেন]-এর পর হযরত সায়াদের (রা) নিকট তাঁর ব্যাপারে সুপারিশ করলেন। তখন

হযরত সায়াদ (রা) সেই সুপারিশ মেনে নিলেন এবং আবু মিহজানকে (রা) মুক্ত করার সময় বললেন ঃ "তোমার কবিতায় যাকিছু বলেছ তার ওপর যতক্ষণ আমল করবে না ততক্ষণ আমি তোমাকে কিছু বলবো না।"

হযরত আবু মিহজান (রা) জবাব দিলেন "আল্লাহর কসম, এমন বেহুদা কথা আমার মুখে আর কখনো আসবে না।"

কাদেসিয়ার যুদ্ধের পর হযরত আবু মিহজান (রা) ইতিহাসের পাতা থেকে বিস্মৃত হয়ে যান এবং তাঁর তৎপরতা ও পেশা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। এমনকি তাঁর মৃত্যুর সাল পর্যন্ত কেউ নির্ধারণ করেননি। অবশ্য অনেক চরিতকারই লিখেছেন যে, তিনি আজারবাইজানে ইন্তেকাল করেন।

দায়েরায়ে মায়ারিফে ইসলামিয়ার "প্রথম খন্ডে" কাদেসিয়ার যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আবু মিহজান (রা) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এটাও সম্ভব যে আবু মিহজান (রা) উলাইয়াসের (Vologasias) যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৬ হিজরীতে হযরত ওমর (রা) তাকে পুনরায় দেশ থেকে বহিষ্কার করেন এবং নাসে' পাঠিয়ে দেন। কিছু দিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন। বর্ণিত আছে যে, তার মাজার আজারবাইজান অথবা জারজানের সীমান্তে অবস্থিত।

এই বর্ণনার আলোকে ধারণা করা যায় যে, হযরত আবু মিহজান (রা) কাদেসিয়ার যুদ্ধের পরপরই ১৬ হিজরীতে ওফাত পান।

হযরত আবু মিহজানের (রা) নির্বাসনের কি কি কারণ ছিল ? এ ব্যাপারে "দায়েরায়ে মায়ারিফে ইসলামে"র লিখক ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর কিছু কবিতায় মদের প্রশংসা করা হয়েছিল। হযরত ওমর ফারুক (রা) সেই সব কবিতাকে কুরআনে হাকিমের মদ হারামের নির্দেশের বিরোধী আখ্যায়িত করে কবি [হযরত আবু মিহজানকে (রা)] নির্বাসনের শাস্তি দিয়েছিলেন। (ওয়াল্লাহু আলামু বিসসওয়াব)

হযরত আবু মিহজান (রা) স্বভাবকবি ছিলেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধের সময় যে কবিতা তিনি কয়েদখানায় পড়েছিলেন তা ছিল তাঁর স্বভাবজাত সৃষ্টি। হযরত আবু মিহজানের (রা) দিওয়ানও প্রায় একশ' বছর পূর্বে ইউরোপ এবং কায়রোতে প্রকাশিত হয়। তিনি জাহেলিয়াত ও ইসলামী উভয় যুগেই কবিতা রচনা করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে আছির (র) হযরত আবু মিহজানের (রা) ব্যাপারে লিখেছেন যে, তিনি অত্যন্ত বাহাদুর, উদার ও দানশীল ছিলেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা) অত্যন্ত কঠোর ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। কিন্তু হযরত আবু মিহজান (রা) তাঁর সামনেও নির্ভীকভাবে কথাবার্তা বলতেন। হাফেজ ইবনে হাজার ইসাবাতে লিখেছেন যে, একবার তিনি হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিদমতে এলেন। তখন তাঁর সন্দেহ হলো যে, তিনি মদ পান করেছেন। আমীরুল মু'মিনীন (রা) লোকদেরকে তাঁর মুখ শুঁকতে বললেন। হযরত আবু মিহজান (রা) বললেন, "এটা গোয়েন্দাগিরী এবং আপনাকে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে।" একথায় হযরত ওমর ফারুক (রা) তাকে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিলেন। হযরত আবু মিহজান (রা) হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফফাল মুযনি

নবম হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ের কথা। এ সময় সিরীয় ব্যবসায়ীদের একটি কাফেলা মদীনা মুনাওয়ারা এলো। এই ব্যবসায়ীরা মদীনাবাসীদেরকে অবহিত করলো যে, রোমের কায়সার মদীনার ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং এই লক্ষ্যে সে একটি বিরাট বাহিনী একত্রিত করেছে। সেই বাহিনীতে কতিপয় অমুসলিম আরবী গোত্র যেমন লাখাম, জাযাম, গাস্‌সান প্রভৃতিও শামিল রয়েছে। প্রিয়নবী (সা) এই খবর পেলেন। তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ আমরা রোমকদেরকে আরবের মাটিতে পা রাখতে দিব না এবং সামনে অগ্রসর হয়ে আরব সীমান্তে তাদের মুকাবিলা করা হবে। একথা বলার সাথে সাথে তিনি মুসলমানদেরকে দীর্ঘ মরুভূমির সফর এবং জিহাদের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। সে সময় খরা, দুর্ভিক্ষ এবং প্রচন্ড গরম কিয়ামতের মত অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল। উপরন্তু খেজুর পাকার সময়ও নিকটবর্তী হয়ে এসেছিল এবং লোকজন অস্থিরভাবে ফল পাকার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই অবস্থায় দূরদরাজের সফর (যাতে মনযিলের পর মনযিল পর্যন্ত পানিও পাওয়া যেত না) ছিল বড় কঠিন কাজ। তবুও মু'মিনরা যেই মহানবীর (সা) নির্দেশ শুনলেন তাঁরা সবকিছু ভুলে গেলেন এবং নবীজীর (সা) আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাগলের মত জিহাদের প্রস্তুতিতে মশগুল হয়ে গেলেন। সে সময় হুজুর (সা) যখন মুসলমানদেরকে ধন-সম্পদ কুরবানীর উৎসাহ দিলেন তখন তাঁরা ত্যাগ ও কুরবানীর এমন উদাহরণ পেশ করলেন যা বিশ্ব এর আগে আর কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। সাইয়েদেনা সিদ্দিকে আকবার (রা) ঘরে ঝাড়ু থেকে শুরু করে সুই সূতা পর্যন্ত এনে হক পথে পেশ করলেন। সাইয়েদেনা ওমর ফারুক (রা) গৃহের অর্ধেক মাল-মাত্তা এনে রাসূলের (সা) নিকট পেশ করে দিলেন। হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রা) এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা, নশ' উট এবং একশ ঘোড়া সাজসরঞ্জাম সহ দান করে দিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ ৪০ হাজার রৌপ্য মুদ্রা পেশ করলেন। এমনিভাবে অন্যান্য সাহাবা ও সাহাবীয়াতও (রা) আল্লাহর পথে খরচে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিলেন। এমনকি মহিলারা নিজের গহনা পর্যন্ত খুলে দিয়ে দিলেন। কিন্তু আল্লাহর সেই পবিত্র বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষও ছিলেন যারা নিজেদের অক্ষমতা ও বিত্ত বৈভব না থাকার কারণে যেমন সওয়ারীর ব্যবস্থা করতে পারছিলেন না তেমনি পাথেয়ও সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। অন্যদিকে তাঁদের ঈমানী

আবেগ ও জিহাদের আগ্রহের অবস্থাটা এমন ছিল যে, ঘরে বসে থাকাটা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। অন্যান্য মুসলমান ভাইদের যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে তাদের অন্তর বেদনার্ত হয়ে উঠছিল। এমনি ধরনের কিছু অসহায় সাহাবী (রা) রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমাদের অবস্থা আপনার অজানা নয়। আমাদের না আছে সওয়ারী । না আমরা পাথেয় সংগ্রহের ক্ষমতাও রাখি। হুজুর (সা) যদি তার বন্দোবস্ত করে দেন তাহলে আমরাও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সৌভাগ্য লাভ করতে পারবো।"

যেহেতু সৈন্য সংখ্যা ছিল খুব বেশী এবং সওয়ারী ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম ছিল খুব কম, সেহেতু হুজুর (সা) তাঁদের দরখাস্ত অনুমোদনে ক্ষমা চাইলেন। সওয়ারী ও পাথেয় ছাড়া মরুভূমিতে দীর্ঘ সফর করাটা ছিল মানবীয় শক্তি বহির্ভূত ব্যাপার। এ জন্য প্রিয় নবীর (সা) নিকট থেকে পরিষ্কার জবাব পেয়ে তারা ভগ্ন হৃদয় হয়ে পড়লেন এবং নিজেদের বঞ্চনার জন্য নিরাশ হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁদের ইখলাসপূর্ণ জযবা আল্লাহর এতো পছন্দ হলো যে, তাঁদের পক্ষে সূরায়ে তাওবাতে আয়াত নাযিল হলো ঃ

وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ص تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا الاَّ يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ -

"অনুরূপভাবে তাদের সম্পর্কেও আপত্তি করার কিছু নেই—যারা নিজেরা এসে তোমার নিকট যানবাহনের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য আবেদন করেছিল, আর তুমি বলেছ যে, আমি তোমাদের যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারছি না, তার ফলে তারা বাধ্য হয়ে ফিরে গেল। আর অবস্থা এই ছিল যে, তাদের চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল, তাদের বড় মনোকষ্ট ছিল এই কারণে যে, নিজেদের ব্যয় বহনে জিহাদে শরীক হওয়ার সামর্থ তাদের নেই।"(আত-তাওবা ঃ ৯২)

সেই মুখলিস মু'মিনদের মধ্যে মুযনিয়া গোত্রের এক ব্যক্তিও ছিলেন। ধূলি ধূসরিত মলিন পোশাক তাঁর অসহায়ত্বের কথাই প্রকাশ করছিল। কিন্তু তাঁর চেহারায় সৌভাগ্যের দীপ্তি এমনভাবে চমকাচ্ছিলো যে কেউ তা অবলোকন করে প্রভাবিত না হয়ে পারে না। তাঁর এই অসহায়ত্ব এবং চোখে

অশ্রু দেখে মদীনার নেক ও বুজুর্গ ব্যক্তি ইবনে আইমান (রা) জিজ্ঞেস করলেন যে, এই কান্নাকাটি কেন? তিনি বললেন, জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য হুজুরের (সা) নিকট সওয়ারী চেয়েছিলাম, কিন্তু তা পাইনি। আমি সফরের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করতেও সক্ষম নই। অতএব, আমার দুর্ভাগ্যের জন্য কাঁদছি।

একথা শুনে ইবনে আইমান (রা) তাঁকে একটি উট এবং কিছু খেজুর উপঢৌকন হিসেবে পেশ করলেন। আশাতীতভাবে সওয়ারী ও পাথেয় পেয়ে সেই সাহাবী (রা) এত খুশী হলেন যে, পা আর মাটিতে ধরে না। অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ইসলামী বাহিনীতে গিয়ে শামিল হলেন এবং মদীনা থেকে তাবুক পর্যন্ত রহমতে দোআলমের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করলেন। রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা) যাঁর ঈমানী জোশ এবং ইখলাসের আবেগকে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত শক্তিশালী ভাষায় প্রশংসা করেছিলেন এবং যাঁর আন্তরিক আকাংখা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নিজের অন্য আরেকজন নেক বান্দাকে ওসিলা বানিয়েছিলেন—তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফাল।

সাইয়েদেনা আবু সাঈদ আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফাল মুযনিয়া গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। মুযনিয়া গোত্র ছিল মুদিরের মশহুর শাখা। হযরত কা'ব (রা) বিন যুহায়েরও এই কবিলার মানুষ ছিলেন। তিনি একটি কবিতাতে নিজের মুযনি হওয়ার জন্য এমনিভাবে গৌরব প্রকাশ করেন ঃ

هُمُ الاصل مِنّي حَيْثُ كُنْتُ وَاِنَّنِي

مِنَ الْمُزَنِيِّيْنَ الْمُصْفِيْنَ بِالْكَرَامِ

"যেখানেই আমি থাকবো সেখানেই তারা বুজুর্গ হবে। নিসন্দেহে আমি শরীক ও সম্ভ্রান্ত মুযনীদের একজন।"

এই কবিলা নজদে বসবাস করতো এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফালও সেখানকার বাসিন্দা ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফফাল বিন আবদি নাহাম বিন আফিফ বিন সাহাম বিন রবিয়া বিন আদি বিন ছালাবা বিন যাদিব বিন সায়াদ বিন আদি বিন ওসমান বিন মুযনিয়া।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফাল ৬ষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা লাভ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কিছু দিন পরই (৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে) প্রিয়নবী (সা) ওমরার জন্য মক্কা রওয়ানা হন। এ সফরে

চৌদ্দশ' সাহাবী (রা) রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফালও শামিল ছিলেন। হুজুর (সা) যখন জানতে পেলেন যে, মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদেরকে বাধা দানের ইচ্ছা পোষণ করছে তখন তিনি হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাবু ফেললেন। সেখানেই "বাইয়াতে রিদওয়ানের" মহান ঘটনা সংঘটিত হয়। সে সময় উপস্থিত সকল সাহাবা (রা) হুজুরের (সা) পবিত্র হাতে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জীবন উৎসর্গ করার বাইয়াত করেন। হযরত আবদুল্লাহও (রা) এই সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং এমনিভাবে তিনি সেই ভাগ্যবান সাহাবীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন যাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ (রা) এই যুদ্ধেও বীরের মত অংশ নেন। সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে এই ঘটনা উল্লেখ আছে যে, আমরা খায়বার অবরোধ করে রেখেছিলাম। আমিও অবরোধকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অবরোধকালে জনৈক ব্যক্তি চর্বি ভর্তি থলি ওপর থেকে নিক্ষেপ করলো। আমি তা ওঠানোর জন্য সামনে অগ্রসর হলাম। কিন্তু যখন দেখলাম যে, প্রিয়নবী (সা) তা দেখছেন তখন আমি খুব লজ্জিত হলাম।

মক্কা বিজয়ের (অষ্টম হিজরী) সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্‌ফাল সেই দশ হাজার "পবিত্র আত্মার" অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সে সময় মহানবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

সহীহ বুখারীতে তার থেকে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখলাম যে, তিনি উটনীর ওপর সওয়ার ছিলেন এবং সূরায়ে ফাতাহ পাঠ করছিলেন এবং তা পুনরায় পাঠ করছিলেন। বুখারীরই আরেক রেওয়ায়াতে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, মক্কা বিজেয়র দিন প্রিয় নবী (সা) মক্কা প্রবেশ করলেন। সে সময় কা'বা গৃহে ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। তিনি তাদেরকে হাতের ছড়ি দিয়ে মেরে মেরে বলছিলেন ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يَبْدأُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ط

নবম হিজরীতে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) যে ইখলাস ও ঈমানী আবেগ প্রদর্শন করেছিলেন তার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। তিনি নিজের জীবন উৎসর্গের আবেগ এবং দ্বীনের প্রশ্নে ইসলামের জন্য নবীর (সা) দরবারে নৈকট্য হাসিল করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর

কয়েক বছর পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারা অবস্থান করে নবীর ফয়েজ লাভ করতে থাকেন। এমনকি বিজ্ঞ সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যান। একাদশ হিজরীতে মহানবী (সা) ওফাত হলে হযরত আবদুল্লাহর (রা) ওপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। আল্লামা ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, হুজুরের (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফাল মদীনা ত্যাগ করেন এবং স্বদেশে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। হযরত ওমর ফারুকের খিলাফতকালে বসরা আবাদ হলো। সে সময় আমীরুল মু'মিনীন কতিপয় এমন মানুষ অনুসন্ধান করছিলেন যারা সেখানকার বাসিন্দাদেরকে কুরআন-হাদীস এবং ফিকাহর মাসয়ালা-মাসায়েল তালিম দিতে পারেন। তখন তাঁর দৃষ্টি পড়ে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফালের ওপর। তিনি তাঁকে অন্য আরো পাঁচজন সাহাবার (রা) সাথে বসরাবাসীকে তালিম ও প্রশিক্ষণের কাজে নিয়োগ করেছিলেন।

আমীরুল মু'মিনিনের (রা) নির্দেশ পালনার্থে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বসরাতে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর অন্তর সবসময় জিহাদের উৎসাহে উদ্বেলিত থাকতো। জিহাদের এই আকাংখা তাকে সুস্থির হয়ে বসে থাকতে দিত না। কিছুদিন পর ইরাক গমনকারী মুজাহিদের দলে শামিল হয়ে গেলেন এবং ইরানী বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে নিজের জীবন উৎসর্গের নিপুণতা প্রদর্শন করলেন। সতের হিজরীতে বসরার শাসক হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) খুজিস্তানে সেনা অভিযান চালালেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফালও সেই বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল-ইসতিয়াবে" লিখেছেন যে, খুঁজিস্তানের সদর শোস্তারে মুসলমানরা যখন প্রবেশ করলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফফাল শহরে প্রবেশকারী মুজাহিদদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন। এমনিভাবে ইরাকের কয়েকটি যুদ্ধে সৌর্যবীর্য প্রদর্শনের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বসরা ফিরে এলেন এবং পূর্বেকার নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান ও ফতওয়া দানের কাজে মশগুল হয়ে গেলেন। ৫৯ অথবা ৬০ হিজরীতে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। যখন বেঁচে থাকার আর কোন আশা রইলো না তখন পরিবার-পরিজনকে গোসলের শেষ পানিতে কর্পূর মেশাতে, গোসলের সময় শুধু মাত্র বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত থাকতে এবং রাসূলের (সা) সাহাবী যেন গোসল দেয় এই ওসিয়ত করলেন। কাফনে দুই চাদর এবং একটি কামিসের কথা বললেন। কেননা, রাসূলের (সা) কাফন এমনি ছিল। জানাযার পেছনে যেন আগুন জ্বালানো না হয়, একথাও তিনি বলেছিলেন। ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন যে, সে সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) এই ওসিয়তও করেছিলেন যে, বসরার শাসক ওবায়দুল্লাহ যেন তাঁর নামাযে জানাযায় শরীক না হয়।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) পরপারের ডাকে সাড়া দিলে তাঁর উত্তরাধিকাররা তাঁর ওসিয়তের ওপর পুরাপুরি আমল করলো। যখন জানাযা ওঠানো হলো তখন ইবনে যিয়াদ অপেক্ষা করছিলো। তাকে হযরত আবদুল্লাহর (রা) ওসয়িত সম্পর্কে অবহিত করা হলে কিছুদূর জানাযার সঙ্গে গিয়ে ফিরে গেল। জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আবু বুরযাহ আসলামী (রা) জানাযার নামায পড়ালেন এবং সেই মহান সাহাবীকে বসরার মাটিতে দাফন করে দেয়া হলো। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী মৃত্যুর সময় তিনি সাত পুত্র রেখে গিয়েছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মুগাফ্ফাল জ্ঞান ও বদান্যতার দিক থেকে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের আন্দাজ এ থেকেই করা যায় যে, হযরত ওমর ফারুকের (রা) মত ব্যক্তিত্বও তাঁকে বসরাবাসীর শিক্ষা প্রদান ও প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে ৪৩ টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর শাগরিদ বা শিষ্যদের মধ্যে হযরত খাজা হাসান বসরী (র), হযরত সাঈদ (র) বিন জোবায়ের, হযরত হামিদ (র) বিন হিলাল এবং হযরত মাতরাব (র) বিন আবদুল্লাহর নাম উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবদুল্লাহর (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রাসূল প্রেম, জিহাদের প্রতি উৎসাহ, দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা, রাসূলের (সা) আদর্শের প্রতি আনুগত্য এবং বিদায়াত থেকে দূরে থাকাটা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লোকদেরকে অত্যন্ত সুন্দর ও আনন্দ চিত্তে হুজুরের (সা) ইরশাদসমূহ শোনাতেন এবং সেই সব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতেন যা হুজুর (সা) পসন্দ করেননি। সহীহ বুখারীতে তার থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি এক ব্যক্তিকে পাথর নিক্ষেপরত অবস্থায় দেখলাম। তখন আমি তাকে বললাম যে, পাথর নিক্ষেপ করো না। রাসূলুল্লাহ (সা) এটা করতে নিষেধ করেছেন। আমি তাঁকে একথা বলতে শুনেছি যে, পাথর থেকে না শিকার মারা যায়, না কোন দুশমন আহত হয়। অবশ্য কারোর দাঁত ভেঙ্গে যাবে অথবা চোখ কানা হয়ে যাবে। কিছু দিন পর আমি তাকে পুনরায় ইট মারতে দেখলাম। এ সময় বললাম যে, আমি কি তোমাকে রাসূলের (সা) হাদীস বর্ণনা করিনি। তবুও ইট মারছো। যাও, আমি তোমার সঙ্গে এতদিন কথা বলবো না।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে (র) হযরত আবদুল্লাহর (রা) পুত্র থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি নিজের পিতা থেকে বিদয়াতকে বেশী খারাপ মনে করতে আর কাউকে দেখিনি। একবার আমি নামাযে উচ্চৈসরে বিসমিল্লাহ পড়লাম। যখন সালাম ফিরালাম তখন পিতা বললেন, বেটা, ইসলামে কথা

বাড়িও না। আমি রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বকর (রা), ওমর (রা) এবং ওসমানের (রা) পেছনে নামায পড়েছি। তাঁদের মধ্যে কেউই নামাযে 'বিসমিল্লাহ' উচ্চৈ স্বরে পড়তেন না।

সুনানে আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হেদায়াত করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে থেকে কেউই যেন অবশ্যই নিজের গোসলখানায় প্রথমে পেশাব না করে। এবং পেশাব করার পর গোসল ও ওজু না করে। কারণ বেশীর ভাগ সন্দেহ পেশাব থেকেই হয়ে থাকে। মোটকথা, হযরত আবদুল্লাহ (রা) এমনিভাবে লোকদেরকে হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনিয়ে শুনিয়ে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সচ্চরিত্র ও সুন্দর সমাজের তালিম দিয়ে গেছেন।

হযরত হানজালা (রা) বিন রুবাই তামিমী

বিশ্বনবীর (সা) নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আরবের তমসাচ্ছন্ন. সমাজে কয়েকজন এমন সুন্দর প্রকৃতির মানুষও ছিলেন যারা তাওহীদের প্রবক্তা ছিলেন এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের কথাসমূহ শুনে শেষ নবীর (সা) আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। এই ধরনের লোকদের মধ্যে বনু তামিমের এক বুজুর্গ আকছাম বিন সাইফীও ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ১৯০ বছর এবং নিজের হিকমত ও বিদ্যার ভিত্তিতে সমগ্র আরবে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি প্রায়ই লোকদেরকে আরবে আল্লাহর শেষ রাসূলের (সা) শুভাগমনের খবর দিতেন।

মহানবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর দাওয়াতে হক প্রদান শুরু করলেন। এ সময় আকছামের কানেও তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির খবর পৌছলো। তাঁর অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, এই সেই নবী যাঁর আরব ভূমিতে আবির্ভাব হওয়ার কথা ছিল। তিনি মক্কার ইয়াতিম নবীর (সা) নিকট একটি পত্র প্রেরণ করলেন। এই পত্রে তিনি তাঁর দাওয়াতের বিস্তারিত জানতে চাইলেন। হুজুর (সা) সেই পত্রের জবাব আকছামকে প্রেরণ করলেন। তিনি এই জবাব পাঠ করে যারপর নাই আনন্দিত হলেন। তাঁর অন্তর প্রদেশের গভীরে ঈমানের আলো প্রোজ্জলিত হয়ে গেল এবং তিনি সমগ্র গোত্রবাসীকে ডেকে পাঠালেন। যখন সকলে একত্রিত হলো তখন তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে আমার পুত্ররা! আমার কথা গভীরভাবে শোনো। মক্কায় কুরাইশের যে ব্যক্তি লোকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে থাকেন এবং দাবী করেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। বাস্তবিকই তিনি আল্লাহর সাচ্চা রাসূল। তোমরা কাল বিলম্ব না করে তাঁর দিকে অগ্রসর হও এবং তাঁকে আকড়ে ধরো। তাতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। দেখো, আরবের অন্যান্যরা যেন তোমাদের ওপর বাজী নিয়ে না যায়।"

উপস্থিতদের মধ্যে বনু তামিমের অন্যতম নেতা মালিক বিন নুয়াইরাও ছিলো। আকছামের একথা তার নিকট অসহনীয় মনে হলো। সে লোকদেরকে বললো, বুড়োর কথা শুনো না। তার খাতিরে আমরা নিজেদের পিতা ও পিতামহের ধর্ম কেন পরিত্যাগ করবো?

মালিকের কথা শুনে লোকজন বিশৃংখল হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও আকছামের একপুত্র, এক ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অন্য কতিপয় সুন্দর স্বভাবের তামিমী আকছামের

কথায় খুব প্রভাবিত হলো এবং তারা আকছামকে বললো যে, আপনি আমাদেরকে যে পরামর্শ দিয়েছেন তার ওপর আমরা অবশ্যই আমল করবো।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, তারা স্বদেশ থেকে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তারা সে সময় মহানবীর (সা) নিকট পৌছতে পারেননি। অবশ্য কিছু দিন পর আকছাম বিন সাইফীর ভ্রাতুষ্পুত্র কোন না কোন উপায়ে রহমতে আলমের (সা) খিদমতে পৌছে গেলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ঈমান আনয়ন করলেন। বনু তামিম গোত্রের আকছাম বিন সাইফীর এই সৌভাগ্যবান ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন হযরত হানজালা (রা) বিন রুবাই।

সাইয়েদেনা হযরত হানজালা (রা) বিন রুবাই জালিলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তাঁর কুনিয়ত ছিল আবু রাবয়ী। তিনি হাকিমে আরব আকছাম বিন সাইফী তামিমীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ হানজালা (রা) বিন রুবাই বিন সাইফী বিন রিয়াহ বিন হারিছ বিন মাখাশিন বিন মাবিয়া বিন শরীফ বিন জারওয়া বিন উসাইদ বিন আমর বিন তামিম।

হযরত হানজালার (রা) ইসলাম গ্রহণের কাল সম্পর্কে নির্ভরতার সাথে কিছু বলা যায় না। তবুও চরিতকাররা ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, তিনি নবীর (সা) নবুয়াতের প্রাথমিক যুগে ঈমান আনয়ন করেছিলেন। কেননা, আকছাম বিন সাইফী দীর্ঘদিন থেকে তাদের পরিবারের লোকজনের নিকট প্রিয় নবীর (সা) আবির্ভাবের খবর দিয়ে আসছিলেন।

হযরত হানজালা (রা) নিজের স্বদেশভূমি পরিত্যাগ করে কোন্ সময় হতে মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন ? চরিত গ্রন্থসমূহেও এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায় না। অবশ্য সকল ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সাথে একথা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হানজালা (রা) লিখাপড়ায় খুবই যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন এবং মহানবী (সা) তাঁর ওপর গভীর আস্থা পোষণ করতেন। ইবনে আছির (র) "উসুদুল গাব্বাহ"-তে লিখেছেন যে, প্রিয় নবী (সা) হযরত হানজালাকে (রা) লিখনীর দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন এবং তিনি রাসূলের (সা) পক্ষ থেকে শাসক, সরদার এবং অন্যান্য লোকের নিকট প্রেরিত পত্রাবলী লিখতেন। এ জন্য তিনি কাতিবে রাসূল বা রাসূলের লিখক উপাধিতে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। অন্যান্য চরিতকাররাও রাসূলের দরবারের লিখকদের মধ্যে হযরত হানজালার (রা) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

হযরত হানজালা (রা) শুধুমাত্র কলমই পিষতেন না। বরং হক পথের একজন জানবাজ মুজাহিদও ছিলেন। চরিতকাররা যদিও তাঁর তরবারী দিয়ে

যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দেননি। তবুও কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কয়েকটি যুদ্ধে রহমতে আলমের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে স্বয়ং হযরত হানজালা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূলের (সা) সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করতাম। এক যুদ্ধে আমরা দেখলাম যে, একজন মহিলা নিহত হয়ে পড়ে রয়েছে। লোকজন মহিলাটির লাশের চারপাশে ভিড় জমিয়েছে। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে তাশরীফ নিলেন। এ সময় লোকজন একদিকে সরে গেলো। হুজুর (সা) লাশ দেখে বললেন, "এই মহিলাতো যুদ্ধে শরীক ছিল না।" অতপর তিনি এক ব্যক্তিকে দিয়ে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের নিকট এই নির্দেশ প্রেরণ করলেন যে, যুদ্ধে মহিলা ও শিশুদেরকে কখনো হত্যা করো না।

ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন যে, তায়েফের যুদ্ধের পূর্বে রাসূলে আকরাম (সা) হযরত হানজালাকে (রা) এই দায়িত্ব অর্পণ করেন যে, তিনি তায়েফ-বাসীর নিকট গমন করবেন এবং মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করতে প্রস্তুত কিনা সে ব্যাপারে তাদের মনোভাব যাচাই করবেন। হযরত হানজালা (রা) তায়েফ গিয়ে সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে মিলিত হলেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে ঘোড়ার ওপর সওয়ার অবস্থায় পেলেন। হযরত হানজালা (রা) ফিরে এসে হুজুরের (সা) নিকট তাদের বিদ্রোহমূলক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন। তখন তিনি (সা) তায়েফ অবরোধের নির্দেশ দিলেন। এই রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত হানজালা (রা) একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। এ জন্য সাইয়েদুল আনাম (সা) দূতগিরীর মত নাযুক কাজের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে অর্পণ করে ছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত হানজালাকে (রা) অত্যন্ত অনুভূতিশীল স্বভাব দান করেছিলেন। সহীহ মুসলিম ও মিশকাতে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, (একবার) হযরত আবু বকরের (রা) সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হানজালা কি অবস্থা ? আমি বললাম, হে আবু বকর (রা), (কি বলবো) আমার তো মনে হয় যে, আমি মুনাফেকীর রোগে গ্রেফতার হয়ে গেছি। হযরত আবু বকর (রা) বিস্মিত হয়ে বললেন যে, সুবহান আল্লাহ, এটা তুমি কি বলছো। আমি বললাম, (ঠিকই বলছি কেননা) আমরা যখন রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হই তখন মনে হয় যে, জান্নাত ও দোজখ যেন আমাদের সামনে রয়েছে এবং আমরা তার দৃশ্যাবলী নিজের চোখ দিয়ে অবলোকন করছি। কিন্তু আমরা যখন তাঁর মজলিস থেকে উঠে বাইরে গমন করি তখন পুনরায় বিবি, বাচ্চা এবং ধন-সম্পদের কিস্‌সায় মেতে উঠি এবং তাঁর (সা) ইরশাদ ভুলে যাই।

একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম, এ ব্যাপার তো আমার বেলায়ও প্রযোজ্য। তারপর আমি ও আবু বকর (রা) দু'জনেই রাসূলের (সা) নিকট রওয়ানা দিলাম এবং তাঁর পবিত্র খিদমতে উপস্থিত হলাম। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার ? আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন আপনার খিদমতে হাজির হই এবং আপনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন তখন অনুভব করি যেন আমরা তা নিজের চোখে দেখছি। কিন্তু যেই আপনার নিকট থেকে উঠে যাই তখন পুনরায় সেই বিবি-বাচ্চা এবং জমির আকর্ষণে ডুবে যাই এবং আপনার ইরশাদ ও হেদায়াতের বেশীর ভাগই ভুলে যাই। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, সবসময় যদি তোমাদের এই অবস্থা থাকে যা আমার মজলিশে হয় তাহলে ফেরেশতা তোমাদের বিছানা ও রাস্তায় প্রকাশ্যে মুসাফা করবে। কিন্তু হে হানজালা, সময় সময়েরই কথা (সাআতান ওয়া সাআতান) এই বাক্য তিনবার ইরশাদ করলেন।"

হাদীসের ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন, হযরত হানজালা (রা) মজলিশে নববীতে অবস্থানকালে নিজের অন্তরের অবস্থার যে চিত্র পেশ করেছেন শরীয়াতের পরিভাষায় তাকে ইহসান বলা হয়। যা বাস্তবত ইয়াকিনেরই একটি মনযিল। তারপর আর কোন মনযিল নেই। তারপর যত সোপান পাওয়া যায় তা ইহসানের মর্যাদাতেই পাওয়া যায়। সাইয়েদুল মুরসালিনের (সা) পবিত্র সুহবত বা সাহচর্যে ইহসানের মর্যাদা প্রথম কদমেই হাসিল হয়ে যেত। হুজুর (সা) এটা পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে, আমার সাহচর্যে তোমাদের অন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা যদি স্থায়ী হয় তাহলে তোমরা তা বরদাশত করতে পারবে না। এভাবে তোমরা মানুষের দুনিয়া থেকে বের হয়ে ফেরেশতার দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অথচ শরীয়াতের লক্ষ্য হলো মনুষত্বের পূর্ণতা দান। মূল কলব বা অন্তর নয়। তোমাদের ওপর বিবি-বাচ্চারও অধিকার রয়েছে।

বিশ্বনবীর (সা) ওফাতের পর হযরত হানজালা (রা) কলম পরিত্যাগ করে তরবারী হাতে তুলে নেন এবং জিহাদের ময়দানে পৌছে যান। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে কাদেসিয়ার রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত হানজালা (রা) জীবন বাজী রেখে অংশ নেন। কুফা আবাদ হলে তিনি সেখানে বসবাস শুরু করেন। উষ্ট্রের যুদ্ধের পর কুফা থেকে কারফেসা চলে যান এবং সেখানেই হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকালে পরপারে যাত্রা করেন। হযরত হানজালা (রা) থেকে আটটি হাদীস বর্ণিত আছে।

হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ জুহানী

নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগের কথা। একদিন এক বেদুইন বিশ্বনবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে এই আরজ করলেন ঃ

"হে ইবনে আবদুল মুত্তালিব! আমি গত হজ্জের সময় মক্কা এলে এক বিস্ময়কর ধরনের স্বপ্ন দেখেছিলাম। শুয়ে আমি এই দৃশ্য দেখলাম যে, একটি নূর বা আলো কা'বা থেকে বের হয়ে ইয়াছরাবের পাহাড় পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে এবং জুহাইনা কবিলাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অতপর আমি সেই নূর থেকে একটি আওয়াজ শুনলাম যে অন্ধকারের মেঘ সরে গেল। আলো ছড়িয়ে পড়লো। শেষ নবী তাশরীফ নিলেন। তারপর এক দ্রুত গতিসম্পন্ন আলোর আবির্ভাব ঘটলো। সেই আলোতে হিরার মহল এবং মাদায়েনের সাদা মহল দেখা যেতে লাগলো। সে সময় আমার কানে এই আওয়াজ এলো যে ইসলা-মের আগমন ঘটেছে। মূর্তি ভেঙ্গে পড়েছে এবং আত্মীয়তার বন্ধনের যুগ এসে গেছে।"

এই স্বপ্ন দেখে আমার ওপর ভীতি ছেয়ে গেল এবং আমি নিজের কওমের লোকদের (যারা আমার সাথে হজ্জের জন্য মক্কা এসেছিল) নিকট স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা করলাম। তারাও খুব বিস্মিত হলো। হজ্জ শেষে আমরা যখন নিজেদের গোত্রে ফিরে গেলাম তখন শুনতে পেলাম যে, আপনি লোকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে থাকেন এবং মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এখন আমি আপনার নিকট এটা জানতে এসেছি যে, আপনি কিসের দাওয়াত দিয়ে থাকেন।

হুজুর (সা) বেদুঈনের কথা খুব মনোযোগের সাথে শুনলেন এবং বললেন ঃ

"ভাই! আমি প্রেরিত নবী এবং আল্লাহর সকল বান্দাকে ইসলামের দিকে ডাকার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া মূর্তিপূজা পরিত্যাগ ও একক আল্লাহর ইবাদাত করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন মজবুত করার নির্দেশ দানের জন্যও আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এই দাওয়াত কবুল করবে সে জান্নাতের হকদার হবে এবং যে তা প্রত্যাখ্যান করবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তোমরা আমার দাওয়াত কবুল করলে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যাবে।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে বেদুঈন নির্ভাবনায় আরজ করলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার ওপর ঈমান এনেছি এবং যে দাওয়াত আপনি দিয়ে থাকেন তা আমি সত্য অন্তরে গ্রহণ করছি। যদিও আরবের সকল স্থানে তার বিরোধিতা চলছে।"

এই বেদুঈন যিনি সেই সময় তাওহীদের ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরেছিলেন—তিনি ছিলেন হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ জুহানী।

হযরত আবু মরিয়ম আমর (রা) বিন মুররাহর সম্পর্ক ছিল বনু জাহনিয়ার সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ

আমর (রা) বিন মুররাহ বিন আবাস বিন মালিক বিন হারিছ বিন মাযিন বিন সায়াদ বিন মালিক বিন রিফায়াহ নাসার বিন মালিক বিন গাতফান বিন কায়েস বিন জুহনিয়াহ।

হযরত আমর (রা) স্বগোত্রের নেতৃস্থানীয় মানুষ হিসেবে পরিগণিত হতেন এবং লোকজন তাঁকে খুব মান্য করতো। কবিতা রচনার ক্ষমতাও রাখতেন। ইসলামের মহান নিয়ামতে পূর্ণ হওয়ার পর হুজুরের (সা) সামনে একটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি হলো ঃ

شهدت بان الله حق واننى لا لهة الاحجار اوّل تارك

فشمّرتُ عَن ساق الازارمُهاجر اليك اَدُبُّ الغور بعد الدكادك

لاصحب خير النّاس نَفسًا ووالدًا رسولُ مليك الباس فوق الحبائك

"আমি একথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক এবং আমি পাথরের মাবুদদেরকে সর্বপ্রথম পেছনে নিক্ষেপ করছি। আমি অত্যন্ত তৎপরতার সাথে আপনার দিকে হিজরত করেছি। (অথবা আমি হিজরতের জন্য লুঙ্গি পায়ের গোছার ওপরে তুলে নিয়েছি।) আমি কঠিন রাস্তা দিয়ে আপনার দিকে অগ্রসর হচ্ছি যাতে সেই সত্তার নৈকট্যের মর্যাদা লাভ ঘটে। যে সত্তা স্বয়ং এবং বংশের দিক থেকেও সকল লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম। যমীন ও আসমানের মালিকের রাসূল (সা)। যিনি সকল নেকী থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ।"

এ কবিতা শুনে মহানবীর (সা) পবিত্র চেহারায় খুশীর হিল্লোল বয়ে গেল এবং তিনি বললেন ঃ "হে আমর ! তোমার শুভ হোক (অথবা শাবাস হে

আমর)।" হযরত আমর (রা) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি আমাকে নিজের কওমে গিয়ে তাবলীগ করার অনুমতি প্রদান করুন। সম্ভবত আল্লাহ্ তায়ালা আমার মাধ্যমে তাদের ওপর ইহসান করতে পারেন। যেমন তিনি আপনার মাধ্যমে আমার ওপর ইহসান করেছেন।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "হাঁ, তুমি নিজের কওমকে হেদায়াতের দাওয়াত দিতে পার।"

হযরত আমর (রা) হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে খুব খুশী হলেন। যখন হুজুর (সা) থেকে বিদায় হচ্ছিলেন তখন তিনি বললেন ঃ "আমর (রা) আমার কয়েকটি কথা স্মরণ রাখবে এবং সকল অবস্থাতেই তার ওপর আমল করবে। কথাগুলো হলো ঃ সবসময় নরম ব্যবহার করবে। কঠোরতা করবে না। কারোর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে না। স্বার্থপরতা ও তাকাব্বরী থেকে দূরে থাকবে। নিজের আলোচনায় তিক্ত মেজাজ ও অভদ্র আচরণ করবে না।"

হযরত আমর (রা) হুজরের (সা) ইরশাদসমূহের ওপর আমলের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং নিজের কওমের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত আমর (রা) স্বগোত্রে পৌঁছে সর্বপ্রথম তিনি সেই মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন যে মূর্তি পূজা করতেন। তারপর তিনি সকল মানুষকে একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে বনু রুফায়া, হে বনু জুহানিয়া, আমি তোমাদের নিকটে আল্লাহর রাসূলের (সা) পক্ষ থেকে দূত হয়ে এসেছি এবং তোমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। হত্যা, লুট এবং রক্তাক্ত ঘটনা পরিত্যাগের পরামর্শ দিচ্ছি। পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধন মজবুত কর। একক আল্লাহর ইবাদাত কর এবং মূর্তিদেরকে পরিত্যাগ কর। যে আমার দাওয়াতে সাড়া দেবে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে। আর যে তা প্রত্যাখ্যান করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। হে আমার জুহানি ভাইয়েরা! আরব গোত্রসমূহে এখনো তোমাদের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। অন্যরা দু'সহোদরাকে এক সাথে স্ত্রী করে রাখে এবং পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সতালো মা'কে শাদী করে থাকে। কিন্তু তোমরা সবসময় এসব বস্তুকে খারাপ মনে করে আসছো। এখন তোমরা আল্লাহর সাচ্চা রাসূলের (সা) আনুগত্য করলে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তোমাদের অংশে আসবে।"

হযরত আমরের (রা) কথায় এমন কিছু তাছির ছিল যে, এক ব্যক্তি ছাড়া সমগ্র কবিলা কিছু দিনের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে ফেললো। এই ব্যক্তি খুব কঠোর হৃদয়ের মানুষ ছিল। হযরত আমরকে (রা) বলতো ঃ

"হে আমর বিন মুররাহ, তোর জীবন দুঃখপূর্ণ হয়ে যাবে। তুই কি আমাদের মাবুদদেরকে পরিত্যাগ করতে বলিস। তুই কি চাস যে, আমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাই। তুই কি চাস যে, আমরা নিজেদের পিতা ও পিতামহের দ্বীনের বিরোধিতা করি। তিহামার এই বাসিন্দা কুরাশী [মুহাম্মাদ (সা)] আমাদেরকে কিসের দিকে আহ্বান করে থাকে। যাতে না আছে কোন কারামত এবং না আছে কোন শরাফত।"

"আমর বিন মুররাহর কথা শান্তিকামী মানুষেরা পসন্দ করবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমর বিন মুররার কথা ও কাজ একদিন ভুল বলে প্রমাণিত হবে। যদিও তা প্রমাণিত হতে কিছু সময় লাগবে।

—সে আমাদের অতীত বুজর্গদেরকে বেওকুফ ঠাওরাতে চায় এবং যে অতীত বুজর্গদের সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করে সে কখনো কল্যাণের মুখ দেখতে পারে না।"

হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ সেই অকর্মা লোকের কথার জবাবে বলেছিলেন ঃ

"আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী হবে, আল্লাহ তার আরাম আয়েশকে দুঃখে পূর্ণ, তার চোখকে অন্ধ এবং তাকে বোবা করে দেবেন।"

হাফেজ ইবনে কাছির নিজের "ইতিহাসে" স্বয়ং হযরত আমর (রা) বিন মুররাহর এই বর্ণনা নকল করেছেন যে, আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তি সেই সময় পর্যন্ত মরেনি যতক্ষণ পর্যন্ত সে বোবা, কালা এবং অন্ধ হয়নি এবং তার মুখ গলে গলে খসে পড়েনি। এটা তার জন্য এমন মুসিবতের ছিল, যা তাকে খাবার খাওয়া থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছিল।

কিছুদিন পর হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ নিজের গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হলেন। হুজুর (সা) তাদের জীবনের বরকত ও রিযিকে প্রশস্ততা দানের দোয়া করলেন এবং তাঁদের জন্য একটি ফরমান লিখে দিলেন। সেই ফরমানের সার সংক্ষেপ হলো ঃ

"হে জুহাইনার মুসলমানেরা! তোমাদের জন্য জুহাইনার সমগ্র যমীন নরম এবং প্রস্তরময়, ঝরণা ও প্রান্তরে পূর্ণ হবে। তোমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিজেদের পশু চরাও এবং যেখানে পানি পাও তা ব্যবহারে আনো। শর্ত হলো গনিমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দেবে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে থাকবে এবং ভেড়া-বকরীর দুই পাল একত্রিত হলে (অর্থাৎ একশ বিশ বকরী হলে) দুই বকরী বের করে নেয়া হবে। আর যদি এক পাল হয়, তাহলে ৪০

থেকে এক বকরী বের করে নেয়া হবে। জমিতে কর্ষণকারী গরুর ওপর কোন সাদকা নেই এবং কোন কূপ থেকে জমিতে পানি দানকারী উটের ওপরও কোন সাদকা নেই।"

এই ফরমান থেকে স্পষ্ট হয় যে, তা সেই সময় লিখা হয়েছিল যখন হুজুর (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিয়েছিলেন এবং ইসলাম একটি বিজয়ী শক্তির রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এখানে প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, হযরত আমর (রা) বিন মুররাহর ইসলাম গ্রহণের সঠিক সময় কোনটা ছিল? আল্লামা ইবনে আছির (রা) উসুদুল গাব্বাহতে লিখেছেন যে, তিনি নবীর হিজরতের পূর্বে মক্কা এসে সেই সময় ঈমান আনায়নের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন যখন মুশরিকরা ইসলাম বিরোধিতার তুফান সৃষ্টি করে রেখেছিল। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" এই বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ সাইয়েদেনা হযরত মুয়াজ (রা) বিন জাবালের নিকট থেকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং তারপর নিজের কবিলাতে ফিরে গিয়ে লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাঁর তাবলিগী প্রচেষ্টার ফলে সমগ্র কবিলা কিছু দিনের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। যদি হাফেজ ইবনে হাজারের (র) রেওয়ায়াত সঠিক বলে মনে করে নেয়া হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় যে, হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ নবীর হিজরতের পর মদীনা এসে ইসলাম কবুল করেছিলেন। এই দুই রেওয়ায়াতের সামঞ্জস্য এভাবে হতে পারে যে, হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ নবীর হিজরতের পূর্বে মক্কা গিয়ে ইসলাম কবুল করেন এবং স্বদেশে ফিরে যান। নবীর হিজরতের পর তিনি পুনরায় হুজুরের (সা) খিদমতে মদীনা আসেন। হযরত মুয়াজ (রা) বিন জাবাল থেকে কুরআন তালিম হাসিল করেন এবং পুনরায় নিজের কবিলায় ফিরে গিয়ে তাকেও মুসলমান বানান। তারপর নিজের গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হন এবং ওপরে উদ্ধৃত ফরমান লাভ করেন।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা হযরত আমর (রা) বিন মুররাহর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা রাসূলের (সা) যুগে হযরত আমর (রা) বিন মুররাহর অন্যান্য তৎপরতার উল্লেখ করেননি। অবশ্য "তাবকাতুল কাবিরে" আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) কাতিবুল ওয়াকেদী এতটুকুন লিখেছেন যে, আমর (রা) বিন মুররাহর আল্লাহর পথে জিহাদের সৌভাগ্যেও হয়েছিল। তা থেকে এই উপসংহারই টানা যায় যে, হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ নবীর কতিপয় যুদ্ধে অবশ্যই অংশ নিয়ে থাকবেন। মাখদুম মুহাম্মাদ হাশেম সিন্ধী (র) নিজের পুস্তক "বাজলুল কুওয়াত"-এ লিখেছেন, হুজুর (সা)

সপ্তম হিজরীতে এক অভিযানে হযরত আমর (রা) বিন মুররাহর নেতৃত্বে নিজের চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিবের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তিনি জুহাইনাহ ও মুযনিয়ার কিছু বন্ধুর সাথে সেই অভিযানে গিয়েছিলেন এবং বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করে ফিরে এলেন। (আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।) হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে সিরিয়া বিজয় হয়। তখন অনেক সাহাবায়ে কিরাম (রা) সিরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আমর (রা) বিন মুররাহও শামিল ছিলেন। সিরিয়ায় তাঁর জীবনের দিন-রাতগুলো লোকদেরকে কুরআন-সুন্নাত এবং ন্যায় ও অন্যান্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতে দিতেই কাটতো। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অত্যন্ত কোমল হৃদয় দান করেছিলেন। আল্লাহর সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণ কামনাকে নিজের ঈমানের অংশ হিসেবে মনে করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" লিখেছেন, একবার তিনি আমীরে মুয়াবিয়ার (রা) নিকটে গিয়ে এই হাদীস বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি যে, যে ইমাম (শাসক) অভাবগ্রস্ত, বন্ধু এবং দরিদ্রদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে দেবে তাহলে আল্লাহ তায়ালাও তার অভাব ও দোয়ার জন্য আসমানের দরজা বন্ধ করে দেবেন।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) এই হাদীস অত্যন্ত গভীরভাবে শুনলেন এবং তৎক্ষণাৎ এক বিশেষ অফিসার নিয়োগ করলেন। সেই অফিসার লোকদের প্রয়োজন বা অভাব সম্পর্কে জানতেন এবং তা পূরণ করতেন।

হযরত আমর (রা) বিন মুররাহ দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন এবং উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলের কোন এক সময় পরপারের ডাকে সাড়া দেন।

হযরত আমর (রা) বিন মুররাহর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। নিজের কবিতায় অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ইসলামের গৌরব প্রকাশ করতেন। একটি কবিতায় তিনি বলেছেন ঃ

"আমি তাকওয়ার হাওজে সাতার কেটেছি এবং জীবনের সমস্যাসমূহ থেকে সহীহ সালামতে বের হয়ে এসেছি। আমি ধৈর্যের পোশাক পরিধান করেছি এবং পথভ্রষ্টতার মা আমার ইচ্ছার নিকট নিরাশ হয়ে গেছে।"

হযরত সায়াদুল আসওয়াদ সাহামী (রা)

দয়ার সাগর বিশ্বনবী (সা) নিজের কয়েকজন জাননিছারের মজলিসে তাশরীফ রেখেছিলেন। এমন সময় কুৎসিত ও বিশ্রী চেহারার একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তার খিদমতে হাজির হলো এবং আরজ করলো ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! যেমন আপনি দেখছেন। আমি একজন বিশ্রী ও কৃষ্ণকায় মানুষ। লোকজন আমাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমার মত দেখতে কুৎসিত মানুষও কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে ?"

মহানবী (সা) তাঁর ওপর স্নেহ ও দয়ার দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বললেন ঃ "সেই সত্তার কসম, যার কুদরতী কব্জায় আমার জীবন রয়েছে। তোমাকে তোমার বিশ্রী চেহারা এবং কৃষ্ণবর্ণ জান্নাতে প্রবেশে অবশ্যই বাধা দেবে না। কিন্তু শর্ত হলো যে, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার রিসালাতের ওপর ঈমান আনো।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দের আতিশয্যে ঝলমল করে উঠলো এবং তাঁর মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে কালেমায় শাহাদাত উচ্চারিত হয়ে গেল। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলের (সা) নিকট আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার কি কি অধিকার রয়েছে ?"

তিনি বললেন ঃ "অন্য মুসলমানের যে যে অধিকার আছে সেই সেই অধিকার তোমারও রয়েছে এবং তোমার ওপর সেই সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে যা অন্যান্য মুসলমানের আছে এবং তুমি তাদের ভাই হও।"

এই কৃষ্ণকায় বিশ্রী চেহারার মানুষ ইসলাম গ্রহণের কারণে যাকে স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালিন (সা) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন—তিনি হলেন হযরত সায়াদুল আসওয়াদ (রা)।

হযরত সায়াদুল আসওয়াদের আসল নাম তো ছিল সায়াদ। কিন্তু অসাধারণ কালো হওয়ার কারণে লোকেরা তাকে "সায়াদুল আসওয়াদ" অথবা "আসওয়াদ" বলতেন (যেমন আমাদের দেশে কৃষ্ণকায় মানুষকে লোকেরা কালো অথবা কালা বলে সম্বোধন করে থাকে)। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা হযরত সায়াদুল আসওয়াদের (রা) নসবনামা বর্ণনা করেননি। অবশ্য

ধারাবাহিকতার সাথে একথা লিখেছেন যে, তিনি কুরাইশের বনু সাহাম গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন [প্রখ্যাত সাহাবী মিসর বিজেতা হযরত আমর (রা) ইবনুল আছও এই কবিলাভুক্ত ছিলেন]। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাল সম্পর্কেও কোন পুস্তকে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। তবে, বিভিন্ন কার্যকারণ সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যখন হুজুর (সা) হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিয়েছিলেন এবং গাযওয়া ও সারিয়্যা শুরু হয়েছিল।

আল্লামা ইবনে আছির (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর (সেই মজলিসেই অথবা অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী কিছু দিন পর) হযরত সায়াদুল আসওয়াদ (রা) রাসূলের (সা) নিকট আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি বিয়ে করতে চাই। কিন্তু কোন ব্যক্তি আমার বিশ্রী চেহারার কারণে মেয়ে দিতে সম্মত হয় না। আমি অনেক লোকের নিকট শাদীর পয়গাম প্রেরণ করেছি। কিন্তু সকলেই তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের মধ্যে কিছু এখানে উপস্থিত আছে এবং কিছু অনুপস্থিত রয়েছে।"

প্রিয় নবী (সা) জানতেন যে, এই কৃষ্ণকায় ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা নূরানী স্বভাব দান করেছেন এবং ঈমানী আবেগ ও দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতার দিক থেকেও তার মর্যাদা অনেক উচ্চে।

হুজুর (সা) ছিলেন আপাদমস্তক রহমতের আধার। অসহায় ও অভাবগ্রস্তদের তিনি ছিলেন আশ্রয়স্থল। নিজের একজন জাননিছারের অসহায়মূলক নিবেদন শুনে তার দয়ার প্রকৃতি স্থির থাকতে পারলো না। তিনি এটা মেনে নিতে পারলেন না, বাহ্যিক রূপ ও সৌন্দর্য না থাকার কারণে লোকজন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করছে। তিনি বললেন ঃ "সায়াদ, ঘাবড়ে যেয়ো না। আমি নিজে তোমার বিয়ের বন্দোবস্ত করছি। তুমি এক্ষুণি আমর (রা) বিন ওয়াহাব ছাকাফীর গৃহে যাও এবং সালামের পর তাকে বলো যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আপনার কন্যার বিয়ে আমার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন।"

হুজুরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত সায়াদুল আসওয়াদ (রা) আনন্দ চিত্তে হযরত আমর (রা) বিন ওয়াহাবের বাড়ীর দিকে চললেন।

হযরত আমর (রা) বিন ওয়াহাব ছাকাফী নতুন মুসলমান হয়েছিলেন। তখনো তার মেযাজে জাহেলী যুগের রুক্ষতা বিদ্যমান ছিল। হযরত সায়াদ (রা) তার বাড়ী পৌঁছে তাকে মহানবীর ফরমান সম্পর্কে অবহিত করলেন। তাতে তিনি খুব বিস্মিত হলেন। তিনি চিন্তা করলেন যে, তার মেধাবিনী ও সুন্দরী কন্যার বিয়ে এ ধরনের বিশ্রী চেহারার মানুষের সঙ্গে কি করে হতে

পারে ? তিনি কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই হযরত সায়াদের (রা) পয়গাম প্রত্যাখ্যান করলেন এবং অত্যন্ত কঠোতার সাথে তাকে ফিরে যেতে বললেন। ভাগ্যবতী কন্যা হযরত সায়াদ (রা) ও নিজের পিতার আলাপ-আলোচনা শুনে ফেলেছিল। যেই হযরত সায়াদ (রা) ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন, তক্ষুণি তিনি দরজার কাছে এলেন এবং বললেন ঃ "আল্লাহর বান্দাহ, ফিরে এসো। যদি বাস্তবিকই রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে প্রেরণ করে থাকেন, তাহলে আমি আনন্দের সাথে তোমার সঙ্গে বিয়ের জন্য প্রস্তুত আছি। যার ওপর আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা) সন্তুষ্ট, আমিও তার ওপর সন্তুষ্ট আছি।"

ইত্যবসরে হযরত সায়াদ (রা) সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি কন্যার কথা শুনেছিলেন কি শুনেছিলেন না তা জানা যায়নি। যাহোক, রাসূলের (সা) দরবারে হাজির হয়ে সমগ্র ঘটনা বর্ণনা করে দিলেন। ওদিকে তাঁর চলে যাওয়ার পর নেক বখত কন্যা নিজের পিতাকে বললেন ঃ "আব্বা, প্রথম কথা হলো আল্লাহ আপনাকে অপমানিত করুন। আপনি আপনার নাজাতের চেষ্টা করুন। আপনি অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছেন যে, আপনি রাসূলের (সা) ফরমানের পরওয়া করেননি এবং হুজুরের (সা) প্রেরিত ব্যক্তির সাথে কঠোর আচরণ করেছেন।"

আমর (রা) বিন ওয়াহাব কন্যার কথা শুনে নিজের অস্বীকৃতির জন্য খুব লজ্জিত হলেন এবং ভীত কম্পিত হৃদয়ে নবীর দরবারে হাজির হলেন। হুজুর (সা) তাকে দেখে বললেন ঃ

"তুমিই আমার প্রেরিত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে।" আমর (রা) বিন ওয়াহাব আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল, অবশ্যই আমি সেই ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এই ভুল অজ্ঞতার কারণে হয়ে গেছে। আমি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জানতাম না। এ জন্য তার কথার ওপর আস্থা আনতে পারিনি এবং তার প্রস্তাব মঞ্জুর করিনি। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আমার কন্যার বিয়ে সেই ব্যক্তির সঙ্গে আনন্দের সাথে মঞ্জুর করছি।"

হুজুর (সা) হযরত আমর (রা) বিন ওয়াহাবে ওজর কবুল করে নিলেন এবং হযরত সায়াদুল আসওয়াদকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"সায়াদ আমি তোমার আকদ বিনতে আমর বিন ওয়াহাবের সঙ্গে করে দিয়েছি। এখন তুমি নিজের স্ত্রীর নিকট গমন কর।"

বিশ্বনবীর ইরশাদ শুনে হযরত সায়াদ (রা) যারপর নাই খুশী হলেন। নবীর (সা) নিকট থেকে উঠে সোজা বাজারে গেলেন এবং নববধূর জন্য কিছু উপঢৌকন কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তখনো কিছু কিনেননি। এমন

সময় তার কানে একজন আওয়াজ দানকারী আওয়াজ দিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "হে আল্লাহর অশ্বারোহী, জিহাদের জন্য সওয়ার হয়ে যাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।"

সায়াদ (রা) ছিলেন যুবক। নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে। অন্তরে হাজার ধরনের কামনা-বাসনা ও আশা-আকাংখা ছিল। বারবার নিরাশার পর শাদীর আনন্দের খবর কানে শুনেছিলেন। কিন্তু আওয়াজ দানকারীর আওয়াজ শুনে সকল আবেগের ওপর ঈমানী আবেগ বিজয়ী হলো এবং বধূর জন্য উপঢৌকন কেনার ধারণা সম্পূর্ণরূপে উবে গেল। যে অংকের অর্থ এ জন্য সঙ্গে এনেছিলেন তা দিয়ে ঘোড়া, তরবারী ও বর্শা ক্রয় করলেন এবং মাথায় পাগড়ী বেধে মহানবী (সা) নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধে গমনকারী মুজাহিদদের দলে শামিল হয়ে গেলেন। এর পূর্বে তাঁর কাছে না ছিল ঘোড়া, বর্শা ও তরবারী। তিনি কখনো এমনভাবে পাগড়ীও বাঁধেননি। এ জন্য কেউ জানতেও পারেননি যে তিনি সায়াদুল আসওয়াদ (রা)। জিহাদের ময়দানে পৌছে সায়াদ (রা) এমন আবেগ ও বীরত্বের সাথে লড়াই করলেন যে, বড় বড় বাহাদুরও তার পেছনে পড়ে গেলেন। একবার ঘোড়া দাঁড়িয়ে গেল। এ সময় তিনি তার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং আস্তিন গুটিয়ে পায়ে হেঁটেই যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। সে সময় হুজুর (সা) তার হাতের কালো রং দেখে চিনে ফেললেন এবং "সায়াদ" বলে ডাক দিলেন। কিন্তু সায়াদ (রা) সে সময় দুনিয়ায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে ছিলেন বেখবর। তিনি এমন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে লড়াই করছিলেন যে, মহানবীর (সা) আওয়াজ বা ডাকও তিনি শুনতে পেলেন না। এমনিভাবে লড়াই করতে করতে তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন এবং নববধূর পরিবর্তে জান্নাতের হুরদের কোলে পৌছে গেলেন।

প্রিয় নবী (সা) হযরত সায়াদের (রা) শাহাদাতের খবর পেয়ে তাঁর লাশের পাশে তশরীফ নিলেন। তার মাথা নিজের কোলে রেখে মাগফিরাত কামনা করলেন এবং বললেন ঃ "আমি সায়াদের (রা) আকদ বা বিয়ে আমর বিন ওয়াহাবের কন্যার সাথে দিয়েছিলাম। এ জন্য তার পরিত্যক্ত সামানের মালিক সেই কন্যাই হবে। সায়াদের (রা) হাতিয়ার ও ঘোড়া তার নিকটই পৌছে দাও এবং তার পিতা-মাতার নিকট গিয়ে বলো যে, এখন আল্লাহ তোমাদের কন্যার চেয়ে উত্তম কন্যা সায়াদকে দিয়েছেন এবং জান্নাতে তার বিয়ে হয়ে গেছে।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সায়াদুল আসওয়াদ (রা) এই নশ্বর জগতে অল্পদিনই ছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি নিজের ঈমানী জোশ ও আমলের আন্তরিকতার যে চিত্র ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন তা উম্মতে মুসলিমার জন্য চিরকাল মশাল হয়ে থাকবে।

হযরত সুরাকা (রা) বিন জু'শামু মুদলিজী

রহমতে আলম (সা) হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধ (অষ্টম হিজরী) থেকে ফারেগ হওয়ার পর জি'রালা নামক স্থানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন এবং তারপর মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন। সেই সময় বিরাট বপু বিশিষ্ট এক বেদুঈনের মদীনা আগমন ঘটলো। এই ব্যক্তি সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের অতীত জীবনের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রিয় নবীর (সা) ফয়েজ ও বরকত থেকে যতদূর সম্ভব উপকৃত হতে চেয়েছিলেন। সুতরাং তার বেশীরভাগ সময় রাসূলের (সা) নিকট কাটতো এবং তিনি প্রায়ই হুজুরের (সা) নিকট দ্বীনি মাসয়ালা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করতেন। মহানবীও (সা) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁর তালিম ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। একবার তিনি (সা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"জাহান্নামী এবং জান্নাতীর আলামত কি তা জানো ?"

তিনি আরজ করলেন, "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনিই বলুন।"

মহানবী (সা) বললেন, "সেই ব্যক্তি হলো জাহান্নামী যে তাকাব্বরী করে। যার মেজাজ রুক্ষ এবং যে অহংকারের সাথে চলাফেরা করে। আর জান্নাতী সেই (ঈমানদার ব্যক্তি) যে দুর্বল ও অভাবগ্রস্ত।"

আরো একবার সেই ব্যক্তি হুজুরের (সা) নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার উটের জন্য একটি হাওজে পানি ভরেছি। এমন সময় যদি কোন পথভ্রষ্ট উট আমার হাওজের ওপর এসে পড়ে তাহলে সেই পথভ্রষ্ট উটকে পানি পান করানোতে আমার কি কোন সওয়াব হবে ?"

হুজুর (সা) বললেন ঃ " কেন নয়। যে কোন জীবিত প্রাণীকে পানি পান করানো সওয়াবের কারণ হয়ে থাকে।"

মোটকথা সেই ব্যক্তি অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নবীর (সা) ফয়েজ লাভের ধারা অব্যাহত রাখলেন। এমনকি আল্লাহ তায়ালার রিসালাত সূর্যের স্নেহ ছায়ায় বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন—এই রাসূলের (সা) সাহাবী যার অন্তরে দ্বীনের শিক্ষা লাভের এমন বাসনা ছিল এবং যাকে মহানবী (সা) অসাধারণ স্নেহ প্রদর্শন করেছিলেন তিনি হলেন হযরত সুরাকা (রা) বিন জু'শামু মুদলিজী।

হযরত সুরাকা (রা) জু'শামু ইসলামের ইতিহাসে এক নামকরা ব্যক্তিত্ব। তার পিতার নাম ছিল মালিক এবং দাদার নাম জু'শামু। যেহেতু আরবে পিতার পরিবর্তে দাদার দিকে পুত্রত্বের সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট করার প্রথাও রয়েছে সে জন্য চরিতকারগণ তার নাম সুরাকা (রা) বিন মালিক এবং সুরাকা (রা) বিন জু'শামু দু'ভাবেই লিখেছেন। স্বয়ং হযরত সুরাকা (রা) থেকে যে রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে তাতে তিনি নিজেকে সুরাকা (রা) বিন জু'শামুই বলেছেন। হযরত সুরাকার (রা) কুনিয়ত বা ডাক নাম আবু সুফিয়ান ছিল এবং তার সম্পর্ক কিনানার শাখা বনু মুদলিজের সাথে ছিল। নসব নামা নিম্নরূপ ঃ

সুরাকা (রা) বিন মালিক বিন জু'শামু বিন মালিক বিন আমর বিন তাইম বিন মুদলিজ বিন মুররাহ বিন আবদি মানাত বিন আলী বিন কিনানা।

মক্কা-মদীনার সড়কে কাদিদের নিকটে বনু মুদলিজ এলাকা অবস্থিত ছিল। সুরাকা (রা) স্বগোত্রের সরদার এবং বিরাট বপুর মানুষ ছিলেন। কাব্য ও কবিত্বের জ্ঞানও রাখতেন এবং তার বীরত্ব ও অশ্বারোহণের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত ছিল। বনু মুদলিজ ছিল মূর্তিপূজার সরদার। তারা "লাত"-কে নিজেদের মহান মা'বুদ বানিয়ে রেখেছিল। রহমতে আলম (সা) তের বছর পর্যন্ত মক্কাবাসী ও আরবের অন্যান্য গোত্রকে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করেন। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে খুব কম মানুষেরই হক কবুলের সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল। এই সময় হুজুর (সা) আরবে "সাহিবে কুরাইশ" লকবে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। বনু মুদলিজও হুজুরের (সা) নবুয়তপ্রাপ্তি সম্পর্কে জানতে পেরেছিল এবং তাদের কানেও তাঁর দাওয়াত গিয়ে পৌছেছিল। কিন্তু তারা নিজেদের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করাটা মেনে নিতে পারলো না এবং কুফর ও শিরকের ভ্রান্ত পথে পথভ্রষ্ট অবস্থায় চলতে লাগলো।

নবুয়াতের চতুর্দশ বছরে প্রিয়নবী (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং হযরত আমের (রা) বিন ফাহিরা সহ হিজরতের সফর শুরু করলেন। আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের চোখের ওপর পট্টি লাগিয়ে দিলেন এবং হুজুর (সা) তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। মক্কার কাফেররা যখন তাঁর হিজরতের খবর জানতে পেল তখন ছটফট করতে লাগলো এবং তারা তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য রাত-দিন একাকার করে ফেললো। যখন নিজেদের অনুসন্ধান ও চেষ্টায় ব্যর্থ হলো তখন তারা মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত যত পরিচিত ও অপরিচিত রাস্তা এবং তাতে আবাদ বস্তিসমূহে ঘোষণা করে দিল যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা) ও আবু বকরকে (রা) জীবিত গ্রেফতার করে আমাদের হাওয়ালা করে দেবে অথবা তাঁদেরকে হত্যা

করে আমাদেরকে ইতমিনান করে দেবে তাহলে তাদের প্রত্যেককে পূর্ণ দিয়্যত দেয়া হবে।"(অর্থাৎ শত শত উট পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে।)—সহীহ বুখারী

মক্কার কুরাইশদের কাসিদরা বনু মুদলিজ পর্যন্তও এই ঘোষণা পৌছে দিল। এ সময় সুরাকা (রা) নিজের গোত্র বনু মুদলিজের মজলিশে বসে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বললো, এক্ষুণি আমি সমুদ্রোপকূলে কিছু ছায়া দেখেছি। আমার ধারণা, সে মুহাম্মাদের (সা) সাথী হবে। সুরাকা (রা) ছিলেন খুব ধীসম্পন্ন ও দূরদর্শী মানুষ। তিনি বুঝে ফেললেন যে, ঐ লোকটির ধারণা সঠিক। তা সত্ত্বেও তিনি মুসলিহাতান সেই ব্যক্তির বক্তব্যের স্বীকৃতি দিলেন না। বরং তিনি একথা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, তারা অমুক অমুক ব্যক্তি হবে। কিছুক্ষণ পূর্বে তারা আমাদের সামনে দিয়েই চলে গেছে। এই প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্য ছিল যে. তিনি নিজের কবিলার অন্য কোন মানুষকে শরীক করা ছাড়া একাই পুরস্কার লাভ করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং মজলিসে কিছুক্ষণ বসার পর বাড়ী গেলেন। অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চুপিসারে বাড়ীর খিড়কী দরজা দিয়ে সমুদ্রোপকূলের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। অন্য আরেক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি নিজের বিশ্বস্ত দাসীকে বললেন. আমার ঘোড়া তৈরী করে এবং তুনীর বেঁধে অমুক স্থানে নিয়ে চলো। অতপর বর্শা হাতে নিয়ে চুপি চুপি বাড়ীর খিড়কী দরজা দিয়ে রেব হয়ে দাসীর নিকট থেকে ঘোড়া নিয়ে হুজুরের (সা) পেছনে পেছনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। কথিত আছে যে, হুজুর (সা) সে সময় রাবিগের দুর্গ ও সমুদ্রোপকূলের মধ্যবর্তী ময়দান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সুরাকা (রা) ঘোড়া বাঁকিয়ে হুজুরের (সা) দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁকে দেখে ফেললেন। অস্থির হয়ে হুজুরের (সা) খিদমতে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! শত্রু আমাদের মাথার ওপর এসে পৌছেছে।" হুজুর (সা) বললেন, 'দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।" ইত্যবসরে সুরাকা (রা) হুজুরের (সা) নিকটে পৌছে গেলেন। সে সময় তাঁর ঘোড়া হোঁচট খেলো এবং তিনি নীচে পড়ে গেলেন। তিনি নিজের তুনীর থেকে তীর বের করলেন ও শুভাশুভ দেখলেন। তা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেল। তা সত্ত্বেও তিনি তার কোন পরওয়া করলেন না। দ্বিতীয়বার ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে হুজুরের (সা) পেছনে ধাওয়া করলেন এবং এত নিকটে পৌছে গেলেন যে, হুজুরের (সা) তিলাওয়াতের আওয়াজ তাঁর কানে পৌছতে লাগলো। আল্লাহর মহিমা ! এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর ঘোড়ার পা মাটিতে রান পর্যন্ত দেবে গেলো এবং তিনি মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। হযরত বারা' (রা) বিন আজেব স্বয়ং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন

যে, সে সময় আমরা খুব শক্ত জমিনের ওপর দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। আমি হুজুরের (সা) খিদমতে অনুরোধ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের পিছনে ধাওয়াকারী আমাদের খুব নিকটে এসে গেছে। তাতে হুজুর (সা) আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন এবং সুরাকার ঘোড়া মাটিতে পেট পর্যন্ত দেবে গেল। হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, সে সময় হুজুর (সা) তাকে মাটিতে ফেলে দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন। দ্বিতীয়বার পড়ে যাওয়ার পর সুরাকা পুনরায় শুভশুভ নির্ধারণ করলেন। কিন্তু এবারও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেল। তিনি ঘোড়ার পা যমিন থেকে বাইরে বের করে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু ব্যর্থই হলেন। শেষে নিরাশ হয়ে চীৎকার দিয়ে উঠলেন ঃ "হে মুহাম্মাদ আমার ওপর যা কিছু ঘটেছে তাতে আমার চোখ খুলে গেছে। আপনি দোয়া করুন যাতে আমার ঘোড়া যমিন থেকে বের হয়ে আসে। আল্লাহর কসম, আমার পক্ষ থেকে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।" মহানবীর (সা) তাঁর প্রতি খুব দয়া হলো এবং তিনি দোয়ার হাত তুললেন। ঠিক তক্ষুণি ঘোড়ার পা যমিন থেকে বের হয়ে এলো। তারপর সুরাকা চেচিয়ে বললেন যে, আমি হলাম সুরাকা বিন জু'শাম এবং আপনাকে কিছু বলতে চাই। আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে কোন ক্ষতি করবো না এবং এমন কথাও বলবো না যা আপনি অপসন্দ করেন। অতপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে হুজুরকে (সা) বললেন যে, মক্কার কুরাইশরা আপনার জন্য দিয়্যাতের কথা ঘোষণা করেছে এবং পুরস্কারের লোভে লোকজন আপনার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে। আপনি আমার এই তীর চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করুন। অমুক স্থানে আপনি কিছু গোলাম পাবেন। তারা আমার উট চড়াচ্ছে। তাদের মধ্য থেকে যত গোলাম এবং উটের প্রয়োজন হবে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবেন। অন্য আরেক রেওয়ায়াতে আছে যে, সুরাকা (রা) হুজুরকে (সা) পথের পাথেয় এবং সরঞ্জাম দানের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু তিনি বললেন, আমাদের কোন বস্তুর প্রয়োজন নেই। অবশ্য তুমি আমাদের খবর কাউকে দিও না। হযরত সুরাকা (রা) কসম খেয়ে বললেন, আমি দুশমনদের অনুসন্ধানকে আপনার পক্ষ থেকে ব্যর্থ করে দেবো। তারপর তিনি হুজুরের (সা) নিকট দরখাস্ত করলেন যে, আমাকে একটি আমাননামা প্রদান করুন। চিহ্ন হিসেবে এই আমা নামা আমার নিকট থাকবে।

হুজুর (সা) হযরত আমের (রা) বিন ফাহিরা এবং অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দিককে (রা) তাঁকে আমাননামা প্রদানের নির্দেশ দিলেন। তিনি চামড়ার এক টুকরায় লিখে তাঁর দিকে ফেলে দিলেন। সুরাকা (রা) সেই আমাননামা নিজের তোশাদানে রেখে দিলেন এবং ফিরতি পথে

রওয়ানা দিলেন। পথে তিনি যাকেই হুজুরের (সা) সন্ধানে আসতে দেখতেন তাকেই ফিরে যেতে বলতেন। তিনি আরো বলতেন, "আমি সবদিক দেখে শুনে এসেছি। তিনি সেদিকে নেই। তোমরা সবাই জানো যে, দ্রুত দৃষ্টি এবং অনুসন্ধানের কাজে আমার চেয়ে পারদর্শী এই এলাকাতে আর কেউ নেই।"

এসব রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত সুরাকা (রা) নিজের আল্লাহ প্রদত্ত দূরদর্শিতা থেকে অবহিত হতে পেরেছিলেন যে, হুজুর (সা) আল্লাহর রাসূল এবং একদিন অবশ্যই বিজয়ী হবেন। এ কারণেই তিনি ভবিষ্যত চিন্তা করে হুজুরের (সা) নিকট থেকে আমাননামা লাভ করেছিলেন। এই ঘটনার ব্যাপারে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে যে রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে তাতে হযরত সুরাকা (রা) থেকে এই বাক্য সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। "হে আল্লাহর নবী আপনি যা চান তা আমাকে নির্দেশ দিন।" তাতে হুজুর (সা) বলেছিলেন, "তুমি নিজের স্থানে অবস্থান কর এবং কাউকে আমাদের পর্যন্ত পৌছতে দিও না। বস্তুত তিনি তাঁর ইরশাদের ওপর আমল করেছিলেন।"

হযরত সুরাকার (রা) ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমান বিন হারিছ (বিন মালেক বিন জুশামু) এই ঘটনা একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"সুরাকা শরীরের ওপর অস্ত্র সজ্জিত করে, মাথায় শিরস্ত্রাণ বেঁধে বর্শা টানিয়ে নিজের ঘোড়ীর (উজ) ওপর সওয়ার হয়ে রাসূলের (সা) পিছু ধাওয়া করার জন্য রওয়ানা হলো। যখন হুজুরের (সা) ওপর দৃষ্টি পড়লো তখন মনে করলো যে সফল হয়ে গেছে। মাদি ঘোড়া একাকি হাঁটু গেরে পড়ে গেল। তখন সুরাকাও পড়ে গেল। পুনরায় উঠলো। ঘোড়ী উঠিয়ে সওয়ার হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআনে হাকিম তিলাওয়াত করতে করতে ইতমিনানের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তাকে শত্রু নিকটে পৌছার খবর দেয়া হলো। তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচাও। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ীর পা যমীনে দেবে গেল। সুরাকা মাটিতে পড়ে গেল এবং বুঝে ফেললো যে, আল্লাহ যাকে হিফাজত করছে তার ওপর বিজয়ী হওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার। সে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিরাপত্তা চাইলো। সে তা পেয়ে গেল। তারপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন, এখন আমি প্রত্যেক পিছু ধাওয়াকারীকে পেছনেই থামিয়ে রাখবো। তারপর তাঁর দরখাস্ত অনুযায়ী হুজুর (সা) হযরত আমের (রা) বিন ফাহিরাকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি আমাননামা বা নিরাপত্তা পত্র লিখে সুরাকার (রা) হাওয়ালা করে দিলেন।"

(সহীহ বুখারী)

এই ঘটনার কিছুদিন পর সুরাকা (রা) মক্কা গেলেন। তখন আবু জেহেলের সাথে সাক্ষাত হয়ে গেল। সে জেনে ফেলেছিল যে, সুরাকা (রা) ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলে আকরামকে (সা) ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং সে অভিযোগের দফতর খুলে বসলো। হযরত সুরাকা (রা) আবু জেহেলের অভিযোগ সমূহের জবাব এই কবিতার মাধ্যমে প্রদান করেছিলেন। কবিতাটির অর্থ হলো ঃ

"হে আবুল হাকাম! (আবু জেহেল) হায়, তুমি যদি আমার ঘোড়ার অবস্থা দেখতে! কিভাবে তার হাঁটু যমীনের মধ্যে দেবে গিয়েছিল। তাহলে তুমি বিস্মিত হতে এবং এ ব্যাপারে তোমার কোন সন্দেহ থাকতো না যে, মুহাম্মাদ (সা) নবী এবং হিদায়াতের চিহ্ন। অতপর কে আছে যে, তাঁর অবস্থা গোপন রাখতে পারে। তোমার কওমের উচিত তাঁর সঙ্গে বিবাদ না করা। আমি প্রত্যক্ষ করছি যে, তাঁর বিজয় ও উত্থানের আলামত শীঘ্র দুনিয়াব্যাপী প্রকাশ পেতে থাকবে।"

নবীর হিজরতকালে হযরত সুরাকার (রা) ওপর যা কিছু ঘটেছিল সেই ভিত্তিতে প্রিয় নবীর (সা) সত্যতা সম্পর্কে তার আস্থা জন্মেছিল। কিন্তু এমন কি বস্তু ছিল যে, তিনি পুরো ৮ বছর নবীর (সা) দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে সক্ষম হননি, তা জানা যায়নি। অষ্টম হিজরীতে মক্কার ওপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন হলো। তখন তার খবর আরবের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে গেল এবং হকের দুশমনদের ওপর ভীতি ছেয়ে গেল। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী মক্কা বিজয়ের পর যখন হুজুর (সা) বাইতুল্লাহতে তাশরীফ রাখলেন এবং অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী যখন তিনি (সা) হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধসমূহ থেকে ফারেগ হয়ে কিছুদিনের জন্য জি'রানায় অবস্থান করলেন তখন সুরাকা (রা) রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হলেন। সে সময় হুজুর (সা) নিজের উটনীর ওপর সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর চারপাশে কতিপয় আনসারী জাননিছার দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা সুরাকাকে (রা) হুজুরের (সা) দিকে অগ্রসর হতে দেখে বাধা দিয়ে বললেন, কোনদিকে যাচ্ছো ? সুরাকা (রা) সেই আমাননামা যা তিনি হিজরতের সময় লাভ করেছিলেন তা হাতে নিয়ে উঁচু করে ধরলেন এবং নিবেদন করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি সুরাকা (রা) বিন জু'শুম এবং এই হলো আপনার প্রদত্ত আমাননামা।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "আজ প্রতিশ্রুতি পূরণের এবং সাধারণ ক্ষমার দিন। কাছে এসো।"

সুরাকা (রা) হুজুরের (সা) নিকটে গেলেন এবং কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "আল ইসাবাতে" লিখেছেন যে, হযরত সুরাকার (রা) হাতের কব্জীর ওপর ঘন চুল ছিল।। হুজুর (সা) তা দেখে বললেন ঃ "সুরাকা সে সময় তোমার কি অবস্থা হবে যখন তুমি নিজের এই গোছাদার চুলে লেপ্টে থাকা কব্জীতে কিসরার কংকন পরিধান করবে।"

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সুরাকা (রা) বেশীর ভাগ সময় মদীনাতে কাটিয়েছিলেন এবং নবীর (সা) ফয়েজে পূর্ণ হতে থাকেন। এই সময় তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ধারণা করা হয় যে, তিনি এই যুদ্ধে হুজুরের (সা) অবশ্যই সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তারপর তিনি বিদায় হজ্জে শরীক হন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, বিদায় হজ্জের সফরে হুজুর (সা) আসফান নামক স্থানে পৌছলে হযরত সুরাকা (রা) নবীর (সা) দরবারে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে সেই নবজাতক কওমের মত তালিম দিন যার আবির্ভাব যেন কেবল ঘটেছে। আমাদের এই উমরা কি এই বছরের জন্য না চিরকালের জন্য।"

হুজুর (সা) বললেন ঃ "না, চিরকালের জন্য।"

মহানবীর (সা) ইন্তেকালের পর হযরত সুরাকা (রা) কোথায় এবং কি অবস্থায় ছিলেন চরিত গ্রন্থসমূহ এ ব্যাপারে নীরব। অবশ্য অনেক নেতৃস্থানীয় চরিতকার এই ঘটনা ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণনা করেছেন যে, কয়েক বছর পর হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফত কালে ইরানের রাজধানী মাদায়েন জয় করা হলো এবং কিসরার কোষাগার মুসলামানদের হাতে এলো। তাতে কিসরার তাজ বা টুপি, অলংকার, পোষাক এবং অন্যান্য শাহী মালপত্রও ছিল। এসব বস্তু গনীমতের মালের সেই অংশের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছিল যা খিলাফতের দরবারে প্রেরণ করা হয়েছিল। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাতে" বর্ণনা করেছেন যে, গনীমতের মাল বণ্টন হতে লাগলো। এ সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত সুরাকাকে (রা) ডেকে কিসরার টুপি তাঁর মাথায় রাখলেন এবং শাহী কংকন তাঁর হাতে পরিয়ে শাহী কোমরবন্ধনী তাঁর কোমরে বাঁধলেন। ইমাম সুহায়লী "রাওজুল উনূফ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, সে সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত সুরাকাকে (রা) সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

"হে সুরাকা! হাত তোলো এবং বলো যে, প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি এসব বস্তু সেই কিসরা বিন হুরমুয থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন যার দাবী ছিল যে, আমি মানুষের রব এবং তা বনু মুদলিজের এক বেদুঈন সুরাকা বিন মালিক বিন জু'শামুকে পরিয়ে দিয়েছেন।"

হাফেজ ইবনে কাইয়েম (র) "যাদুল মি'আয়াদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত সুরাকাকে (রা) কিসরার কংকন পরিয়ে বললেন ঃ "হে সুরাকা! এই গনিমতেরমালে এই কংকন তোমার অংশে এসেছে।"

মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকাল মিসরী নিজের পুস্তক "ওমর ফারুক আজম (রা)"-এ এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ সুরাকা (রা) বিন জু'শামুকে ডাকা হলো। হযরত ওমর (রা) কিসরার পোষাক তাঁকে পরানোর নির্দেশ দিলেন। যখন তিনি পোষাক পরে, অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং টুপি মাথায় দিয়ে দাঁড়ালেন তখন ফারুকে আজম (রা) বললেন ঃ পেছনে হটো। তিনি পেছনে হটে গেলেন। তারপর বললেন ঃ সামনে অগ্রসর হও এবং তিনি সামনে অগ্রসর হলেন। অতপর ইরশাদ হলো, আল্লাহর কি শান, বনু মুদলিজের এক বেদুঈন এবং তার দেহে কিসরার এই পোশাক! হে সুরাকা (রা) বিন মালিক! এমন দিন কখন কখন আসে যা তোমার শরীরে কিসরা ও কিসরা পরিবারের এই লৌকিকতা পূর্ণ শাহী লেবাস। যা তোমার ও তোমার কওমের জন্য মর্যাদার কারণ হয়ে যায়।"

হাফেজ ইবনে হাজারের (র) বর্ননা অনুযায়ী হযরত সুরাকা (রা) বিন জু'শুম ২৪ হিজরীতে ওফাত পান। এটা ছিল হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতকাল।

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জী

১। সহীহ বুখারী

২। সহীহ মুসলিম

৩। মুয়াত্তা ইমাম মালিক

৪। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল

৫। ফতুহুশ শাম—ওয়াকেদী

৬। ফতুহুল আজম—ওয়াকেদী

৭। তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক—তাবারী

৮। উসুদুল গাব্বাহ—ইবনে আছির (র)

৯। তারিখুল কামিল—ইবনে আছির (র)

১০। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া—ইবনে কাছির (র)

১১। আস সিরাতুন নববিয়া—ইবনে হিশাম (র)

১২। তাবাকাত—ইবনে সায়াদ কাতিবুল ওয়াকেদী

১৩। কিতাবুল ইসাবাহ—হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র)

১৪। আল ইস্তিয়াব—হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র)

১৫। রিয়াদুস সালেহীন—ইমাম নববী (র)

১৬। আল আখবারুত তাওয়াল—আবু হানিফা দিনাওয়ারী

১৭। সিরাতুন নবী (সা)—শিবলী নো'মানী (র)

১৮। আসহাবে বদর—কাজী মুহাম্মাদ সুলায়মান মনসুরপুরী

১৯। তরজুমানুস সুন্নাহ—মাওলানা বদরে আলম মিরাঠি

২০। সিরতে কুবরা—আবুল কাসেম রফিক দিলাওয়ারী

২১। আল মাশাহিদ—হাকিম রহমান আলী খান

২২। তাজকিরায়ে হুফফাজে শিয়া—সাইয়েদ আলীনকী

২৩। মুহাজিরিন (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—শাহ্ মঈনুদ্দীন আহমদ নদবী (র)

২৪। সিয়ারে আনসার (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—মাওলানা সাঈদ আনসারী

২৫। সিয়ারুস সাহাবা (সপ্তম খণ্ড)—শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ (র)

২৬। আল ফারুক—শিবলী নো'মানী (র)

২৭। গোলামানে ইসলাম—মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবারাবাদী

২৮। তারিখে ইসলাম—আকবার শাহ খান নজিব আবাদী

২৯। উসওয়ায়ে সাহাবা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—মাওলানা আবদুস সালাম নদবী (র)

৩০। তারিখে ইসলাম—শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী (র)

৩১। হায়াতুস সাহাবা (রা)—মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্দুলভী (র)

৩২। তারিখে ইসলাম—মুন্সী গোলাম কাদের ফসিহ।

প্রধান কার্যালয়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ২৫ ১৭ ৩১

বিক্রয় কেন্দ্র
- ১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
- ৫৫, খানজাহান আলী রোড, তারের পুকুর, খুলনা
- ৪৩, দেওয়ানজী পুকুর লেন, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম